
বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা
এক শয়তানি ধর্মের ইতিকথা
ব্যাদম
ধর্ম
কাজী ম্যাক



"তোমরা ভয় কর সে দিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কার ও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।"

(২:১২৩)

প্রচ্ছদ: আদনান আহমেদ রিজন

কুহকী

"কল্পনার শুরু এখানেই!"



কুহক

"কল্পনার শুরু এখানেই!"

প্রকাশক

ইসমাত জেরিন

কুহক কমিক্স ও পাবলিকেশন

৩৭ কেবি সাহা রোড, আমলাপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

বর্ণবিন্যাস : মোফাজ্জেল হোসেইন নির্জন

প্রকাশকাল : মার্চ ২০২১

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

মূল্য : ৪৫০টাকা (চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

মুদ্রন : পেসিফিক প্রিন্টার্স, ১ নং রেলগেট, নারায়ণগঞ্জ

বাংলাবাজার পরিবেশকঃ মন্তাজ পাবলিকেশন (পুথি-পুরাণ) ৩৮, এন আলী টাওয়ার, (মান্নান মার্কেটের পিছনে), বাংলা বাজার, ঢাকা

Adom Dhormo by kazi mack

Published by Kuhok Comics & Publications

37/3 KB Saha Road, Amlapara, Narayanganj

Price: 450 Taka. U.S.: 12$ Only

ISBN : 978-984-94918-4-2

উৎসর্গ

তাওসীফ আহমেদ

টুকরো কথা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভাল আছেন সবাই। এই বইটি মূলত সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে ফিকশন আকাড়ে সাজানো। আমি মেইনস্ট্রিম থ্রিলার লেখি না। আমার পছন্দের যায়গা থ্রিলারের সাব জনরা গুলো। তার-ই ধারাবাহিকতায় আদম ধর্ম বইটি একটি স্পিরিচুয়াল থ্রিলার। আমার বইগুলোতে গতানুগতিক থ্রিল আপনি পাবেন না। মূলত থ্রিল তখনই অনুভব করবেন যখন প্রতিটা লাইন বুঝতে পারবেন। মূল চরিত্র গুলো নাম বইতে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। যেমনঃ আনোয়ার দরবেশ, গল্পে আব্দুল দরবেশ। বইটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে একজন ব্যক্তি তার ভুল অতিরঞ্জিত চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে বিপথে চলে যায় এবং সর্বোপরি ইসলাম বিদ্বেষীতে রুপান্তরিত হয়। বইটির এই অংশে দেখানো হয়েছে আব্দুল দরবেশের শেষ পরিণতি এবং তার ধর্মের আবির্ভার। পরবর্তী অংশে তুলে ধরা হবে তার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের এবং তার পরিবারের বাকি সদস্যদের শেষ পরিণতি।

সর্বোপরি, যদি কোন উপদেশ বা পরামর্শ থাকে পাঠকদের তাহলে আমাকে সরাসরি মেইল করে দেয়ার অনুরোধ থাকলোঃ quazimac5@gmail.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]

মাঘ ১৯৯০

"বাবা, মনের ভেতর হাজারো প্রশ্ন উঁকি দেয়। কিছুতেই দমাতে পারছি না। এসব প্রশ্ন অন্তরে পুষে রাখলে ঈমান নষ্ট হবে নাকি প্রকাশ করলে হবে? আমার কাছে তো মনে হয় প্রকাশ করাটাই উত্তম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর বান্দার অন্তর বা কলবের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। বাবা, খুবই অস্থির লাগছে; পথ দেখান আমাকে ", জলিলুদ্দীন অস্থির স্বরে বলে উঠলেন।

ধ্যান মগ্ন অবস্থায় আব্দুল দরবেশ তখনও চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বিড়বিড় করে যাচ্ছেন। বাবা কী পাঠ করছেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না জলিলুদ্দীন। তিনি ভাবলেন বাবা নিশ্চিত গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাকে আর এখন বিরক্ত করাটা ঠিক

হবে না। জলিলুদ্দীন তার আসন থেকে উঠে যাবার প্রস্তুতি নিতেই আব্দুল দরবেশ চোখ খুললেন।

"বোকা জলিল এতো অস্থির হলে চলবে? জ্ঞান সাধনার প্রধান উৎস হচ্ছে ধৈর্য্য। ধৈর্য ব্যতীত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। চলো তোমাকে আগে একটি গল্প শোনাই। আবার ভেবো না গল্পটি আমার বানানো, এটি বর্ণিত আছে পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফে।"

"জি বাবা। আপনি বলুন, আমি শুনছি। "

"হ্যা, বলবো। তবে গল্প শুরুর আগে একটু পানি পান করা প্রয়োজন। বড্ড তৃষ্ণার্ত আমি। এমন এক জগৎ থেকে ফিরলাম যেখানে পানি বা জলের বড্ড অভাব।"

তিনি তার স্ত্রী কে ডাকলেন।

"বিবি হাজেরা! বিবি হাজেরা! আমার জন্য এক গ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে এসো।"

বিবি হাজেরা হুজুরাখানার বাইরের পর্দার আড়াল থেকে জবাব দিলেন,

"জি, জনাব আমি আদিলের কাছে পানির গ্লাস পাঠিয়ে দিচ্ছি। "

জলিলুদ্দীন তখন উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন আব্দুল দরবেশের সামনে। নিজের অজান্তেই কিছুক্ষণ পর পর পা নাড়াচ্ছেন তিনি।

আব্দুল দরবেশ মৃদু হেসে বললেন, "হে জলিল! তোমার অন্তরের অস্থিরতা কমাও। এভাবে চলতে থাকলে তুমি জ্ঞান সাধনায় বেশি দূর আগাতে পারবে না। "

"আমি চেষ্টা করছি বাবা। তবে আমার বিশ্বাস এই অন্তর আপনি ছাড়া কেউ শান্ত করতে পারবে না।"

আব্দুল দরবেশ কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-

"জলিল, এসব কথা বলে তুমি আমাকে পাপের ভাগীদার করছ। সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতারও নড়বার হুকুম নেই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুজরাখানার ভেতরে উপস্থিত হল আব্দুল দরবেশের পুত্র আদিল। তার হাতে পানির পাত্র।

"আব্বা, আপনার পানি। "

"ধন্যবাদ পুত্র, তুমি এখন আসতে পারো। আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি।"

"বাবা, আমিও সেই আলোচনা শুনতে চাই। "

আব্দুল দরবেশ শান্ত সূরে বললেন,

"আদিল, সবকিছুর একটি উপযুক্ত সময় রয়েছে। সময় হলেই আমি তোমাকে দীক্ষা দিবো। এখন তুমি আসতে পারো। "

আদিল বাবার আদেশ মোতাবেক কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল। আব্দুল দরবেশ এবং জলিলুদ্দীন আবার পুরনো আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলেন। আব্দুল দরবেশ নবী (সাঃ)-র সুন্নত মোতাবেক গ্লাসের পানি তিন চুমকে শেষ করলেন। এরপর বলতে শুরু করলেন ,

হযরত মূসা (আঃ) একদা বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানী?' তিনি বললেন, 'আমিই সর্বাধিক জ্ঞানী।' জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ না করার কারণে আল্লাহ্ তাকে তিরষ্কার করে বললেন, 'বরং দু-সাগরের সঙ্গম স্থলে আমার এক বান্দা আছে, যিনি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।' অতঃপর আল্লাহর আদেশ মতো তিনি সফর শুরু করলেন।

কোন প্রামানিক পন্থায় এ বিষয় জানা যায়নি যে, হযরত মুসা (আ.) এর এই সফর কোন সময়ে ঘটেছিল এবং সঙ্গম স্থলটি কোথায় ছিল। কিন্তু কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয়, মুসা (আ.) যখন মিশরে অবস্থান করছিলেন ঘটনাটি সেই সময়ে, যখন ফিরাউনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব চলছিল আর সঙ্গম স্থলটি ছিল - শ্বেতনীল (White Nile) ও কটানীল (Blue Nile), যার সঙ্গমস্থ লে বর্তমানে খার্তুম শহর বিদ্যমান।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁর নিকট পৌঁছাতে কে আমাকে সাহায্য করবে?' কখনো সুফইয়ান এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমি কিভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি?' তখন বলা হলো, 'তুমি একটি থলিতে করে একটি মাছ নাও। যেখানে তুমি মাছটি হারাবে, সেখানেই আমার সে বান্দা আছে।' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) একটি মাছ ধরলেন এবং থলিতে রাখলেন। অতঃপর মাছ নিয়ে তাঁর সঙ্গী ইউশা বিন নূনকে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটি পাথরের কাছে পৌঁছলেন এবং তার উপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিলেন। হযরত মূসা (আঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলি থেকে বের হয়ে লাফিয়ে সমুদ্রে চলে গেল। অতঃপর সে সমুদ্রে সুড়ঙ্গের মতো পথ করে নিল। আর আল্লাহ্ মাছটির চলার পথে পানির প্রবাহ থামিয়ে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। অতঃপর তারা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পুরো দিন পথ চললেন।

পরদিন সকালে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সাথীকে বললেন, 'আমরা তো সফরে

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন আমাদের খাবার আন।' হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ যে স্থানে যাবার কথা বলেছিলেন, সেই স্থান অতিক্র ম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোন রূপ ক্লান্তি বোধ করেননি। সাথী ইউশা বিন নুন তখন বলল, 'আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যে পাথরটির নিকট আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম সেখানেই মাছটি অদ্ভুত ভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছে। কিন্তু আমি মাছটির কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মূলত: শয়তানই আমাকে এ কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মতো, যা তাঁদের জন্য ছিল এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।'

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছি।' অতঃপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এবং ঐ পাথরের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'এখানে সালাম কি করে এলো?' তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খিযির জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বনী ইসরাঈল বংশীয় মূসা?' মূসা (আঃ) বললেন, 'হ্যাঁ। আমি এসেছি এজন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা হতে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন।' খিযির বললেন, 'হে মূসা! আমার আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আপনি জানেন না। আর আপনিও আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন কিছু জ্ঞানের অধিকারী, যা আমি জানি না।' মূসা (আঃ) বললেন, 'আমি কি আপনার সাথী হতে পারি? খিযির বললেন, 'আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আপনি আমার সঙ্গে থেকে আমার কার্যাবলী দেখলে আমার নিকট তথ্যানুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবেন। যেমনটি ছাত্র শিক্ষককে শিক্ষণীয় বিষয়ে অবিরত প্রশ্নবাদ করতে থাকলে তাকে সঙ্গে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাছাড়া তুমি কীরূপে ধৈর্য ধারন করবে এমন বিষয়ে যাহা তোমার জ্ঞান সীমার বাহিরে?' (সূরা কাহফ: ৬৮)।

অতঃপর তাঁরা দুজনে সাগরের কিনারা ধরে হেঁটে চললেন। তখন একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তারা খিযিরকে চিনতে পেরে বিনা ভাড়ায় তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিলো। যখন তাঁরা দুজনে নৌকায় চড়লেন, তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসল এবং সমুদ্র থেকে এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা পানি পান করল। খিযির বললেন, 'হে মুসা! আমার ও আপনার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান হতে ততোটুকুও কমেনি, যতোটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের দ্বারা সাগরের পানি গ্রাস করেছে।'

অতঃপর খিযির একটি কুড়াল দিয়ে নৌকাটির একটা তক্তা খুলে ফেললেন। মূসা (আঃ) অকস্মাৎ দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন যে, তিনি কুড়াল দিয়ে একটি তক্তা খুলে ফেলেছেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি এ কী করলেন? লোকেরা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিলো, আর আপনি তাদেরকে

ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকা ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো একটি গুরুতর কাজ করলেন।' খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?' মূসা (আঃ) বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার এ ব্যবহারে আমার প্রতি কঠোর হবেন না।'

অতঃপর তাঁরা যখন উভয়ে সমুদ্র পার হলেন, তখন তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করছিল। খিযির ছেলেটির মাথা দেহ হতে ছিন্ন করে ফেললেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, 'আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন? আপনি খুবই খারাপ একটা কাজ করলেন।' খিযির বললেন, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?' মূসা (আঃ) বললেন, 'এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি, তাহলে আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না।' অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা একটি জন-বসতিতে গিয়ে পৌঁছালেন। কিন্তু উক্ত গ্রামবাসীদের নিয়ম ছিল যে, সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তারা গ্রামের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিত; কারও জন্য খুলত না। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত খিযির (আ.) তথায় পৌঁছে দরজা খুলতে বললে কেউ তাতে সাড়া দিল না। এমন কি তারা মুসাফির হিসেবে খাবার চাইলে তাও দিল না। তারা দুজনেই অনাহারে গ্রামের বাইরে রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন তারা সেখানে একটি পতনোমুখ প্রাচীর বা দেয়াল দেখতে পেলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হযরত খিযির প্রাচীরটি মেরামত করে সুদৃঢ় করে দিলেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, 'এই বসতির লোকদের নিকট এসে আমরা খাবার চাইলাম। তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অথচ আপনি এদের দেয়াল মেরামত করে দিলেন! আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' হযরত খিযির বললেন, 'এই মুহূর্ত থেকে আপনার এবং আমার সহযাত্রা এখানেই শেষ। এক্ষণে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি এর তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।'

প্রথমত: সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটির মালিক ছিল কয়েকজন গরীব লোক। সাগরে যারা জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে

দিলাম এই কারণে যে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে যে প্রত্যেকটি নিখুঁত অর্থাৎ ভালো নৌকা জোর-পূর্বক ছিনিয়ে নিত। তাই সেই রাজা যেন তা নিতে না পারে বা নিতে না চায়।

দ্বিতীয়ত: সেই ছেলেটির কথা। তার বাবা মা ছিল মুমিন বান্দা। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে পরবর্তীকালে তার নাফরমানী ও বিদ্রোহাচরণ করে তাদেরকে কষ্ট দিবে এবং কুফরীর দিকে তাঁদেরকে নিয়ে যাবে। অতএব, আমি চাইলাম বা ইচ্ছা করলাম যে তাঁদের রব তাঁদেরকে উহার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উহার চেয়ে উত্তম ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্টতর। রেওয়ায়েত আছে যে, নিহত ছেলেটির পরিবর্তে তাহার পিতা-মাতাকে আল্লাহ তা'আলা একটি কন্যা সন্তান দান করেছিলেন। তাহার বংশে পরবর্তীতে কয়েকজন পয়গাম্বর জন্ম গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয়ত: ঐ দেয়ালটির ব্যাপার এই ছিল যে, ঐ প্রাচীরটি ছিল এই শহরের দুইজন এতীম ছেলের। তাদের পিতা ছিল একজন সৎ ও নেককার ব্যক্তি। এই প্রাচীর বা দেয়ালটির নিচে তাদের জন্য গুপ্তধন পোঁতা ছিল। তাই তোমার প্রতিপালক দয়া পরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা যেন যৌবনে উপনীত হয় এবং তারা তাদের গুপ্তধন উদ্ধার করে নেয়। সুতরাং তাদের পিতার পূণ্যের খাতিরে তদীয় উত্তরাধিকারীদের সম্পদ রক্ষা করা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত হয়েছে। কিন্তু এই প্রাচীর বা দেয়ালটি ধ্বসে পড়লে দুষ্টেরা এই গুপ্তধন লুণ্ঠন করতো। এখানে আমি কোন কাজই নিজের ইচ্ছায় করিনি। সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশমত হয়েছে।'

"তাহলে কী বুঝলে জলিল?"

"বাবা, ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে আমাকে! অস্থির মনকে স্থির করতে হবে। "

"হ্যা, ঠিক তাই! সেই সাথে তোমার মনের মধ্যে জাগ্রত প্রশ্নগুলোকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তোমার দেখা চারপাশের এলোমেলো সূত্রগুলোকে একটি মালায় গাঁথতে হবে। মনে রেখো, তুমি

যা দেখছো তা সব সময়ের জন্য সত্য হতে পারে না। কারণ, তোমার দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মনে রাখবে এই দুনিয়াকে জানার কিংবা বোঝার জন্য ঈশ্বর তোমাকে খুবই ক্ষুদ্র স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।"

"Limited freedom has been given by the Lord."

" কিন্তু বাবা, এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দেয়ার ভেদ কী! "

"তোমাকে সীমানা বেধে দিয়েছে অসীমতাকে উপলব্ধি করার জন্য। সীমা না বুঝলে অসীমতা বুঝবে কিভাবে? যেমন, শুধু ভালো থাকলে তুমি খারাপের স্বাদ পেতে না কখনো। এটাও ঠিক তেমনই।"

"জি, বাবা।"

"এবার মন খুলে তোমার প্রশ্নগুলো করতে পারো। তবে আমি উত্তর দিব বেছে বেছে। অর্থাৎ যে প্রশ্নের উত্তর তোমার এই মুহূর্তে জানা প্রয়োজন ঠিক সে প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি এখন পাবে। কারণ, তুমি এখন অব্দি গুপ্ত জ্ঞানের চৌকাঠ অব্দি পৌছাও নি। "

"বাবা, আমি প্রথমে জানতে চাচ্ছিলাম যে , ঈশ্বরে অবিশ্বাস করা কি পাপ? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বর বলতে কেউ নেই। আমি কি সেই আগের মতোই জিন্দিক আছি এখনো? "

মুচকি হেসে আব্দুল দরবেশ কিছু সময় চোখ বন্ধ করে থাকলেন। এরপর চোখ বন্ধ করা অবস্থাতেই বলতে শুরু করলেন,

"হে জলিল! কলেমার প্রথম অংশটা শুরু হয়েছে কী দিয়ে জানো? "

"জি, বাবা! লা ইলাহা।"

"হ্যা, লা ইলাহা যার অর্থ নাই কোন ইলাহ। অর্থাৎ অবিশ্বাস! তাই অবিশ্বাসী হওয়া পাপ নয়, বরং এটা তোমার সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। তবে এই প্রবৃত্তিকে লালন করে বেঁচে থাকাটা মহাপাপ এবং অজ্ঞতার পরিচয়। আর খোদার দরবারে

অজ্ঞ ব্যক্তির ঠাই নেই। দেখবে আশেপাশের লোকজন তোমাকে বলবে, অবিশ্বাসী হওয়া খুবই কঠিন কাজ। আসলে তারা ভেদ না বুঝেই বক্তব্য দিয়ে থাকে। সমাজে যাদের দেখছ তারা কেউই প্রকৃত অবিশ্বাসী নয় । কারণ, তারাও তাদের বাস্তবিক জীবনে কারণে-অকারণে বিশ্বাস করতে বাধ্য। তাই অবিশ্বাস কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু অবিশ্বাসের সাগর পাড়ি দিয়ে বিশ্বাসের অসীম জগতে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। বলতে পারো কিছুটা দুরূহ ব্যাপার। তোমাকে বিশ্বাসী হতে হলে সকল প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিতে হবে। কারণ, বিশ্বাস মানেই আত্মসমর্পণ। আর, আত্মসমর্পণ অর্থ নিজের " আত্ম" ভাবটিকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে দেয়া। ভেবে দেখো ক'জন ব্যক্তি এই আমিত্বকে বিসর্জন দিতে পারে? "

"সাধু! সাধু! বাবা আপনার কথা শুনলে আমার দেহে এক অদ্ভুত কম্পনের সৃষ্টি হয়! এর কারণ কী? "

"এর কারণ আমি তোমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা, তোমার গোপন ভাব সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। তোমার দেহ তাই এটা সহ্য করতে পারছে না! সে শুধু ভাবছে এসব তো অন্য কারো জানার কথা নয়। তোমার ভেতরের প্রবৃত্তিগুলো নতুন করে সচেতন হচ্ছে। যাই হোক, জলিল আজ আর প্রশ্ন নয়। আমি বড্ড ক্লান্ত।"

"জি, বাবা। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। তবে বাবা আমার সামনের কাজ কী থাকবে? "

"কাজ তেমন কিছুই না। সামনের একটি সপ্তাহ তুমি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করবে। ইবাদত ঘরে বসে শুধু এক ধ্যানে আমার ছবকগুলো এবং আমার চেহারা স্মরণ করবে। কারণ, সাধনার প্রথম স্তর ফানা ফিল শায়েখ। অর্থাৎ নিজ স্বীয় পীরের সাথে ফানা হয়ে যাওয়া। এ পর্যায়ে তুমি অনেক কিছু দেখতে বা শুনতে পাবে। কিন্তু সেসময় তোমার ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে এবং আমার চূড়ান্ত সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। "

"জি, বাবা।"

এই বার জলিল উঠে। তার পেছনে উঠে আব্দুল দরবেশের দিকে মুখ করে বসে থাকা মানুষগুলো

(জলিলুদ্দিন)

জলিলুদ্দিন মুন্সীর জ্ঞান চক্ষু। আব্দুল দরবেশের কাছে তার যাওয়া আসা অনেকদিন ধরে। জলিল নিজে পূর্বে একজন কমিউনিস্ট। ময়মনসিংহ জেলা কৃষক ইউনিয়নের সাবেক সম্পাদক এবং সেই সাথে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মানিত সদস্য। তাই পড়াশোনার দৌড় নেহায়েই কম নয়। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও এমন মহান ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ পাঠচক্র প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আওড়াতে হয় তার। কিন্তু আব্দুল দরবেশের সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তার চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তিনি বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা থেকে কিছুটা সরে গিয়েছেন। এমন এক পরিস্থিতি তিনি তার মাথায় বহন করে বেড়াচ্ছেন যেটাকে কোন নির্দিষ্ট দর্শন কিংবা মতবাদ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। বস্তুবাদ এবং ভাববাদের জাতাকলের মধ্য দিয়েই জলিলের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি,

ময়মনসিংহ শাখা, পাটগুদাম,

সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ময়মনসিংহ পাটগুদামে অবস্থিত কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের পরিবেশ অত্যন্ত গরম থাকে। গরম বলতে প্রাকৃতিক গরম নয়। মূলত তাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক, উত্তেজনা এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় পরিবেশ গরম হয়ে যায়। এই অফিসেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত সকল অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিদিনকার শ্রেণী -দ্বন্দের আলোচনায় কিছুদিন ধরে খানিকটা ভিন্নতা এসেছে। আর এই ভিন্নতার কারণ জলিলুদ্দীন। তিনি যুগ যুগ ধরে চলে আসা কমিউনিস্টদের চিরাচরিত ধ্যান ধারণা ভেঙে ভিন্ন দিকে ধাবিত হচ্ছেন। তার এই পরিবর্তন কমিউনিস্ট পাড়ায় এখন হাস্যরসের মূল উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতো হাস্যরস এবং ঠাট্টা বিদ্রূপের পরেও জলিলুদ্দীন কোন প্রতি উত্তর না দিয়ে শুধু হেসেই পুরো ব্যাপারটাকে পাশ কাটিয়ে যান। প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পাঠ চুকিয়ে জলিলুদ্দীন উপস্থিত হলেন পার্টি অফিসে। অফিসের চৌকাঠ পেরোতেই -

"আরে পীরে কামেল জলিলুদ্দীন (দাঃবাঃ)- নাকি। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম পীরপন্থী কমরেড", আশরাফ আলী বিদ্রূপ মেশানো কণ্ঠে বললেন।

আশরাফ আলী ময়মনসিংহ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানীয় সদস্য। তিনি ছাড়াও আজকের আড্ডায় উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি নূরুল এবং সাধারণ সম্পাদক লেলিন।

অবশ্য লেলিন নামটা লেলিনের বাপ-মায়ের দেয়া না। তার আসল নাম আজিজ। কিন্তু অতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজের নাম পালটে রেখেছেন লেলিন। এছাড়াও কক্ষে উপস্থিত আছেন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফজল শিকদার। আশরাফ আলীর এরূপ ব্যাঙ্গার্থক সম্ভাষণের সাথে সাথে কক্ষে উপস্থিত সবাই সমস্বরে হেসে উঠলেন। এদিকে জলিলুদ্দীন মুচকি হাসি দিয়ে বললেন,

"কথা একদম খারাপ বলেননি কমরেড! কী যে হচ্ছে আমার সাথে কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। "

আশরাফ আলী হাসতে হাসতে বললেন, "দেখো জলিল টু বি অনেস্ট, এসব ইল্যুশন থেকে বেরিয়ে আসো। এসব পীর বাবাদের কাছে শুধু কথার ঝুড়ি পাবে। কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রমাণ নেই। তোমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। যেখানে ঈশ্বর বলতেই কেউ নেই সেখানে আবার ধ্যান, অতি ইন্দ্রিয়বাদ, এসবের অস্তিত্ব আসে কোথা থেকে? তোমার মতো এতো পড়ুয়া মানুষ যদি এভাবে ডিস্ট্রাক হয়ে যায় তাহলে অন্যদের কী হবে?"

পাশ থেকে শ্রমিক ইউনিয়নেরর সভাপতি ফজল শিকদার আশরাফ আলীর সাথে গলা মিলিয়ে বললেন,

"আপনি ঠিকই বলছেন। আমাদের আদর্শ যুক্তির এবং বিজ্ঞানের। কমরেড জলিলের কাজ কারবার পার্টির নিয়ম বহির্ভূত।"

জলিলুদ্দীন, "কিন্তু কমরেড আমি কী করবো সেটা বাছাই করার স্বাধীনতা কি আমার নেই? কার্ল মার্কস তো সারাজীবন এই ফ্রিডম অব স্পিচের জন্যই লড়াই করে গিয়েছিলেন, তাই না? "

আশরাফ আলী বললেন, "হ্যা! স্বাধীনতা আছে। তবে কারো স্বাধীনতা বুর্জোয়া তথা ধনিক শ্রেণির স্বার্থে কাজ করলে সেটাকে অবশ্যই রুখে দিতে হবে। আর এটাই শ্রেণী সংগ্রাম। "

"কিন্তু ভাববাদ, ধর্মের অর্থই কি বুর্জোয়া শ্রেণীর তাবেদারি করা? "

"অবশ্যই। এবং এটাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, ওদের নীতিই হচ্ছে- কেউ থাকবে সাত তলায় আর কেউ থাকবে গাছ তলায়। আর এটাই নাকি তাকদীর। ধার্মিকদের ঈশ্বর নিজেই শ্রেণী বৈষম্যের শিক্ষা দেয়।"

জলিলুদ্দীন খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন,

"কমরেড, আপনার কথা সত্য! তবে আপনি যেসব নীতির কথা বলছেন তা তাদের ধর্মগুরুদের নিজের বানানো তত্ত্ব। আর সেটাকে ঈশ্বরের ট্যাগ মেরে বাজারে প্রচার করা হচ্ছে। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সাম্যবাদের। একটু ভাবুন না ইসলামের কথা। যেখানে কঠোর নিয়ম রয়েছে, মসজিদে যেনো ধনী-গরিব একই কাতারে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সম্পদ পুঞ্জিভূত করার নিয়মও এখানে নেই। এই একই কথা কি মার্কস বলেন নি? মার্কস তার রচনায় ঠিক কোথায় সরাসরি ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন দেখাতে পারবেন? "

পাশ থেকে তরুণ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,

"তাহলে দ্বান্দিক বস্তুবাদ কী? জিনিসটা একটু বোঝাবেন? আপনার মত সিনিয়র নেতার কাছ থেকে এমন গোজামিল টাইপ কথা শুনতে হবে তা আমি কখনো আশা করিনি।"

জলিলুদ্দীন শান্ত রইলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন এদের বোঝানোর ক্ষমতা তার নেই। কারণ, অবুঝকে কখনো বুঝের জ্ঞান দেয়া যায় না। ইতিমধ্যে পার্টি অফিসে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। সবকিছু যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মত আটকে গেছে। দেয়ালে ঝুলন্ত মার্কস-এংগেলস-লেলিন-স্ট্যালিনের ছবি ব্রিটিশ টোবাকোর ধোঁয়ায় ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। জলিলুদ্দীন উঠে দাড়ালেন। একটু চিন্তা করে বললেন,

"কমরেডস, আমি বিশ্বাস করি আপনারা সর্বাবস্থায় আপনাদের জ্ঞান আহরণের দুয়ার খোলা রাখেন। কাল আপনাদের আমন্ত্রণ রইলো আমার গুরুর বাড়িতে। আশা করি তিনি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন।"

পার্টি অফিসে উপস্থিত সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পরল। কেও একজন হাসতে হাসতে বলে উঠল,

"হাতি- ঘোড়া গেল তল, পিপড়ে বলে কত জল। "

জলিলুদ্দীনও হেসে বললেন , "তাহলে কাল দেখা হচ্ছে, গুরুর বাড়িতে ঠিক ১০ টা ১৩ মিনিটে।"

এই কথা বলেই জলিল পার্টি অফিস থেকে বের হয়ে যায়। আজকের ঘটনাটা তার মনে দাগ কেটেছে। দুনিয়ার সকল সংশয় যেন একযোগে তার মাথায় ভেঙে পড়ছে। সংশয়ের বানে অস্থির হয়ে উঠেছে তার শরীরের শিরা-উপশিরা। তিনি স্থির হওয়ার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ তার মনে পড়লো বাবার দেয়া উপদেশের কথা-

"জলিল, যখন তোমার মন অশান্ত হয়ে উঠবে, তখন নিজের হুজরা খানায় প্রবেশ করবে এবং এক ধ্যানে আমাকে স্মরণ করবে। ইন শাআল্লাহ সকল অস্থিরতা স্থিরতায় রূপান্তরিত হবে।"

জলিলুদ্দীন বাড়ির উদ্দেশ্যে দ্রুত নিজের পা চালালেন। বাড়িতে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়ার আগেই তার স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন। জলিল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন,

"তুমি আগে থেকে বুঝলে কিভাবে যে আমি এসেছি?"

তার স্ত্রী মুচকি হেসে বললেন,

"তোমার পায়ের আওয়াজে। কিন্তু তোমাকে এতো অস্থির লাগছে কেন?"

"এখন কথা বলতে ভাল লাগছে না। পরে তোমায় সবকিছু খুলে বলবো। আমাকে ইবাদতে বসতে হবে।"

জলিলুদ্দীনের বাড়িটি আধাপাকা। এই বাড়ি তিনি পৈতৃক সূত্রে পেয়েছিলেন। বাড়িটি তিন কক্ষ বিশিষ্ট। একটি শোবার ঘর, একটি রান্না ঘর এবং অন্যটি জলিলের হুজরাখানা। অবশ্য এই ঘরটিই কিছুদিন আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। জলিলের সাথে দেখা করতে আসা সকলকে এ ঘরেই

বসতে দেয়া হতো। এক সময় ঘরটি লিফলেট, চাদার রশিদ, মস্ক থেকে প্রকাশিত প্রগতি পাবলিকেশনের এক গাদা বই দিয়ে ঠাসা ছিলো। দেয়ালে ঝুলতো মার্কস-এঙ্গেলস-লেলিন-স্ট্যালিনসহ প্রমুখ নেতাদের ছবি। সেই সাথে দেয়ালে ঝুলানো ছিল লাল রঙের কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত পতাকা। এই পতাকাটি বিশ্বের সকল শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

এসবই এখন ঘরটির কাছে অতীত। ঘরটি এখন নতুন রূপে সজ্জিত। হয়তো কক্ষটি কোনদিন ভাবেইনি যে তার এমন রূপান্তর হবে। তবে কক্ষের তো আর জীবন নেই, তাই ভাবা নামক শব্দটাই তার জন্য বেমানান। যদি সে কোনো প্রাণী হতো তবে হয়তো নিজের এহেন পরিবর্তনে প্রচণ্ড আপত্তি জানাতো। ছোটখাটো বিপ্লবও হয়তো করে ফেলতে পারতো।

ঘরটিতে এখন বড্ড আলোর স্বল্পতা৷ সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করেই না বলা চলে। সবকিছু কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছেন জলিলুদ্দীন। কক্ষের ভিতর বড় ফ্রেমে আব্দুল দরবেশের ছবি টাঙানো। তার ছবির সামনে আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালানো হয় নিয়ম করে। কক্ষে আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। একটি জায়নামাজ, কুরআন রাখার রেহাল এবং একটি তছবিহ। যে কেউ কক্ষে প্রবেশ করে প্রথম দর্শনেই ভিমরি খেয়ে যাবে।

জলিল অযু করে সাদা পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি পরে হুজরা খানায় প্রবেশ করলেন। গায়ে মেখেছেন আব্দুল দরবেশের দেয়া সুগন্ধি আতর। আতরের গন্ধটা খুবই তীব্র। জলিল জায়নামাজে দাঁড়িয়ে প্রথমে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি চোখ বন্ধ করে এক ধ্যানে আব্দুল দরবেশের কথা স্মরণ করতে লাগলেন। চারিদিক প্রচণ্ড রকমের নিস্তব্ধ। শুধু জলিলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে এক বিশেষ দোয়া। এই তালিম আব্দুল দরবেশ তার খাস খাদেম বা মুরিদদেরই দিয়ে থাকেন। খানিক পরেই জলিলের শরীর কেঁপে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন,

"বাবা, আপনি এখানে কিভাবে আসলেন?"

"এটা তোমার অন্তরকে শান্ত করার প্রশ্ন নয় জলিল। তুমি সাধনার স্তরগুলোতে খুবই দ্রুত উন্নতি করছো। আজকের পার্টি অফিসে তোমার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই তার প্রমাণ বহন করে।"

"কিন্তু বাবা, আপনি জানলেন কিভাবে আজ পার্টি অফিসের কথা?"

আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "এটাও তোমার মনকে শান্ত করার প্রশ্ন নয়। জলিল মনে রেখ, আমাদের জয় খুবই সন্নিকটে। তুমি তোমার বিজয়কাল নিশ্চিত দেখতে পাবে।"

জলিলুদ্দীনের ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। তার চোখ ভিজে এল। সেদিন সারারাত সে দুচোখের পাতা এক করতে পারল না। তার কাছে সবকিছু অগোছালো, অযৌক্তিক লাগতে লাগলো।

বিছানায় অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় তিনি ফজরের আযান শুনতে পেলেন। নামাজ শেষ করে তিনি সব চিন্তার ইতি টানলেন। অবশেষে নিজ শয়ন কক্ষে গিয়ে গভীর ঘুমিয়ে তলিয়ে গেলেন।

(আব্দুল দরবেশ)

আব্দুল দরবেশ প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করেন। এখন এলাকায় তাকে নিয়ে যে জনশ্রুতি আছে তা হলো - আব্দুল দরবেশের নামাজ দেখে নাকি মসজিদের ইমাম সাহেবও লজ্জা পান। কারণ, তিনি এশার নামাজ দীর্ঘ সময় ধরে আদায় করেন। এরপর প্রায় ঘন্টা খানেক জিকির করেন। যার ফলে ইমাম সাহেব লোক লজ্জার ভয়ে মসজিদ পরিত্যাগ করতে পারতেন না। খুবই সাদাসিধা ভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত আব্দুল দরবেশ। পরনে সবসময় সাদা পাঞ্জাবি, সাদা লুঙ্গি এবং মাথায় একটি খেঁজুরের পাতা দিয়ে বোনা টুপি থাকে। তাকে টুপি ছাড়া এলাকাবাসী কখনো দেখেনি। তার আবাসস্থলটি এলাকাবাসীর কাছে ফকির বাড়ি নামে পরিচিত। তিনি সপ্তাহে দু'দিন ঝাড়-ফুঁক করেন। তার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে তদবিরের জন্য অনেকেই আসেন। সপ্তাহে শুধুমাত্র দু'দিন, রবিবার এবং বৃহস্পতিবার রোগী দেখেন তিনি। বাকি সময়গুলোতে তিনি ধ্যান -সাধনা, ইবাদত, মুরিদ এবং পরিবারের সদস্যদের তালিম দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন। তার পরিবারের সবাই উচ্চ শিক্ষিত শুধুমাত্র তার স্ত্রী হাজেরা ব্যতীত। বড় ছেলে মারুফ বর্তমানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আছেন। রোগী দেখা, মুরিদদের তালিম দেয়া এবং ধ্যান-সাধনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখার মধ্য দিয়েই বর্তমানে আব্দুল দরবেশের দিন অতিবাহিত হচ্ছে।....

জেল রোড, কাশর, ময়মনসিংহ

সময়টা শীতকাল। তাই বেলা দশটা বেজে গেলেও প্রকৃতি এখনো সূর্যের হাসিমুখ ঠিকভাবে দেখতে পারেনি। চারিদিকে ঘন কুয়াশা। রাস্তার পাশে মোড়ে টং দোকান গুলোতে এখন বেশ ভিড়। পাশেই এক মহিলা চিতই পিঠার সাথে নানা রকম ভর্তা বিক্রি করছেন। এ সময়টাতে এ এলাকায় পিঠার কদর খুবই বেড়ে যায়। একটি পিঠা মাত্র দুই টাকা। ফলে কম খরচে সকালের নাস্তা হিসেবে বেশ সুবিধাজনক। কুয়াশা ভেদ করে জলিলুদ্দীন এবং তার সাথিরা আব্দুল দরবেশের বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন। চলতি পথে জলিলুদ্দীন গম্ভির থাকলেও, তার দুই সাথি বেশ হাসি ঠাট্টায় মেতে ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে নানারকম ফন্দি-ফিকির করে যাচ্ছেন, ঠিক কোন কোন উপায়ে আব্দুল দরবেশ কে প্যাঁচে ফেলা যায়। অন্যদিকে জলিল ভাবছেন আজ আসলে কি হতে যাচ্ছে এবং মনে মনে বলছেন,

"যত গর্জে, তত বর্ষে না।"

হাসি ঠাট্টার এক পর্যায়ে তরুণ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সিপিবি-র সভাপতি আশরাফ আলীকে বললেন ,

"শোনেন কমরেড, কোন ভাবেই আব্দুল দরবেশকে ছাড় দেয়া যাবে না। প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করে ফেলতে হবে ভণ্ডটাকে। কথা এবং যুক্তিতে যেন কোন ফাঁক না থাকে।"

"আরে টেনশন নিও না মিয়া। এসব বাল সাইজ করার জন্য কামান বের করতে হবে না। "

কথাটি বলেই আশরাফ আলী অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। এরপর জলিলুদ্দীনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

"দেখছ না, মুরিদের অবস্থাই টেনশনে কাহিল! "

জলিলুদ্দীন তাদের এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের কোন প্রতি উত্তর দিলেন না। কারণ, তিনি জানেন সময়ই সবকিছুর উত্তর দিবে। প্রায় ১০ মিনিট হাঁটার পরে জলিলুদ্দীন এবং তার দুই সঙ্গী আব্দুল দরবেশের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলেন। জলিল গেট নক করতেই আব্দুল দরবেশের ছোট ছেলে আদিল গেট খুলে দিল।

"আরে চাচা, ভেতরে আসুন। আপনার সাথে এরা কারা? চিনতে পারলাম না তো।"

জলিলুদ্দীন বললেন, "এরা আমার রাজনৈতিক সঙ্গী। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। "

"আচ্ছা, ভেতরে আসুন আপনারা", হাসিমুখে বলল আদিল।

হুজরাখানার ভেতরে প্রবেশের পূর্বে আদিল তাদের অযু করে নিতে বলল। অযু করার কথা শুনেই বেকে বসল তরুণ নেতা নুরুল। রাগান্বিত হয়ে সে বলে উঠল,

"কেনো? অযু করতে হবে কেনো? আমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী নই। আমরা এসব করতে পারবো না।"

আদিল খুবই শান্তভাবে বলল,

"আচ্ছা, আপনারা সারাদিনের কাজকর্ম সেরে যখন নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন তখন কি নিজেদের পরিষ্কার করার জন্য হাত-পা-মুখ ধৌত করেন না?"

আশরাফ আলী ব্যাপারটা দ্রুত অনুধাবন করে নুরুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

"আহা! এটা নিয়ে এতো রাগ করার কি আছে? ছেলেটা তো ঠিকই বলছে। আমরা বাহির থেকে এতোটা পথ হেটে এসেছি পরিষ্কার - পরিছন্ন হওয়াটা আসলেই জরুরি।"

জলিল, "জি আংকেল, আমি সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম।"

আর কথা না বাড়িয়ে তিনজনই দ্রুত অযু করে নিল। যদিও তরুণ নেতা নুরুল ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারল না।পুরো বাড়িটা এক অদ্ভুত সুগন্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত। স্বর্গীয় সেই ঘ্রাণ। আশরাফ আলী বোঝার চেষ্টা করলেন এই ধরণের সুগন্ধি তিনি আগে কখনো পেয়েছেন কি না। তিনি কিছুতেই তা ঠাহর করতে পারলেন না। হুজরাখানার চৌকাঠ পেরোতেই আশরাফ আলী এবং নুরুল আব্দুল দরবেশ কে দেখতে পেলেন। তিনি বসে আছেন হাতে একটি তছবিহ নিয়ে। তারা কক্ষে প্রবেশ করতেই আব্দুল দরবেশ বলে উঠলেন,

"কী অবস্থা কমরেডস? কেমন আছেন? আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন তাই না? তবে গতকাল সন্ধ্যায় জলিলুদ্দীনের সাথে যে ব্যবহার আপনারা করেছেন তা মোটেও সভ্য ব্যবহারের মধ্যে পরে না। মনে রাখবেন আপনাদের কাছে যেটা মজা কিংবা স্রেফ হাসি তামাশার ব্যাপার, অন্যের কাছে সেটা হয়তো জীবন-মরণের প্রশ্ন হতে পারে!"

আশরাফ আলী এবং নুরুল ভাবলেন নিশ্চয় আগে থেকে জলিলুদ্দীন আমাদের ব্যাপারে সবকিছু আব্দুল দরবেশ কে বলে রেখেছেন। তবে জলিলুদ্দীন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাবাকে তো তার কিছুই বলা হয়নি। আব্দুল দরবেশ জলিলকে ইঙ্গিত করে বললেন,

"জলিল তুমি যা ভাবছো আমি তা জানি। কিন্তু এটা নিয়ে তুমি পরেও চিন্তা করার সময় পাবে৷ এখন তুমি তোমার সঙ্গীদের মনকে শান্ত করার চেষ্টা কর। তাদেরকে আসন গ্রহন করতে বল।"

জলিলুদ্দীন তার সঙ্গীদের বাবার সামনে বসতে বলে নিজেও তাদের পাশে বসে পড়লেন।

আব্দুল দরবেশ, "আপনারা একটি একটি করে পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন গুলো খুবই শান্তভাবে করবেন। মগজে যা প্রশ্ন আছে তা নিশ্চিন্তে করতে পারেন। কোন সংকোচ করবেন না। আপনারা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যদি আমার

আপনাদের প্রশ্নের উত্তর জানা থাকে তবে তা দেয়ার চেষ্টা করবো। নতুবা আমি স্বীকার করে নিবো যে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর জানি না।"

জলিল আশরাফ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

"কমরেড, আপনিই প্রথম শুরু করুন।"

আশরাফ আলী সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নেড়ে বললেন,

"আপনাকে কী বলে সম্বোধন করবো? কারণ, আমার তো বাবা একজন। এবং আমি অবশ্যই আমার বাবা দুজন বানাতে চাই না। "

"দেখুন, বাবা শব্দের অর্থ শুধুমাত্র জন্মদাতা নয়। এই শব্দের বহু অর্থ রয়েছে। যার মধ্যে একটি হলো "পরিচালক"। আমি যেহেতু আপনার পরিচালক নই তাই আপনার আমাকে বাবা ডাকার প্রশ্নই ওঠে না। একজন মানুষের জন্ম দুবার হয়। প্রথমবার বাবার বীজের মাধ্যমে। যা মানুষ চর্ম-চক্ষু দিয়ে অবলোকন করতে পারে। এই জন্মের মাধ্যমে একটি শিশু এই নশ্বর পৃথিবীর দর্শন লাভ করে। যার বীজে শিশুটি এই নশ্বর পৃথিবীর দর্শন লাভ করলো তিনি হচ্ছেন তার প্রথম বাবা। আবার এই শিশুটিই ২য় বার জন্ম লাভ করে যখন সে আধ্যাত্মিক জগৎ বা স্রষ্টার জগতের দর্শন লাভ করে। আর শিশুটি যার মাধ্যমে এই জগতের দর্শন লাভ করে তিনিই হচ্ছেন শিশুটির ২য় বাবা। সুতরাং কোন পদ্ধতিতেই আমি আপনার বাবা নই। তাই আপনি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করতে পারেন।"

পাশ থেকে তরুণ নেতা নুরুল বলে উঠলেন,

"এহ্.. আধ্যাত্মিক! যত্তসব ভন্ডামি!"

আব্দুল দরবেশ বললেন,

"ঠিক ধরেছেন, ভন্ডামি। ঠিক যেমনটা পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী সমাজের কাছে আপনাদের তত্ত্ব কিংবা আদর্শকে ভন্ডামি মনে হয়। এই ব্যাপারটাকেও তেমনই বলতে পারেন।"

আশরাফ আলী "পুঁজিবাদ" শব্দটা শুনেই বেশ চটে গেলেন। বললেন,

"আপনার মত ফালতু পাড়ার কবিরাজ সমাজতন্ত্রের কী বোঝে? এই ভারত উপমহাদেশে হাজার বছর ধরে বৈদিক সমাজ জাত-পাত ভাগ করে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে এসেছে। কতটুকু জানেন আপনি ইতিহাস সম্পর্কে? সারাদিন তো বসে থাকেন এই অন্ধকার কুঠুরিতে। অসহায়, বোকা মানুষদের মুরিদ বানিয়ে তাদের কাছ থেকে সুকৌশলে হাদিয়া বাগিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন পার করছেন। আপনার মতো ভন্ডের মুখে নিদেন পক্ষে "সমাজতন্ত্র" শব্দটি মানায় না।"

জলিল তার সঙ্গীদের এরূপ আক্রমণাত্মক কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগলো- এরা দেশের ক্ষমতায় গেলে নিশ্চিত পুরো দেশটাকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলবে। যারাই এদের সাথে দ্বিমত পোষন করবে তাদেরই গুম করে দিবে। জলিল কিছুটা হতাশ বোধ করলো। বাবা মনে হয় এদের সাথে পেরে উঠবেন না, ভাবলো সে। আব্দুল দরবেশ খুব শান্তভাবে বললেন,

"কয়েকদিন আগে " Moscow News" - নামক পত্রিকাটি পড়ছিলাম। তাতে দেখলাম একটি কমিউনিস্ট সভাতে সভাপতি ঘোষণা করছেন -

"আমরা আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য অন্যদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।"

পাশ থেকে তরুণ নেতা নুরুল কিছুটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন , "আপনি আবার এগুলোও পড়েন নাকি!"

আশরাফ আলীও কিছুটা নড়ে চড়ে বসলেন।

আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "আপনাদের অভিব্যক্তি দেখে তো একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। আপনারা অনুমতি দিলে বলতে পারি। নতুবা সরাসরি "সমাজতন্ত্রের" আলোচনায় চলে যাবো।"

আশরাফ আলী বললেন,

"আপনি বলুন।"

আব্দুল দরবেশ বলা শুরু করলেন-

"আপনারা এতো পড়ুয়া মানুষ নিশ্চয়ই মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির কথা শুনেছেন! তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৭ই ডিসেম্বর, ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন ১৩ শতকের একজন ফার্সি সুন্নি মুসলিম কবি, আইনজ্ঞ, ইসলামি ব্যক্তিত্ব, ধর্মতাত্ত্বিক, অতীন্দ্রিয়বাদী এবং একজন সুফী দরবেশ। তিনি ফারসি জাতিভুক্ত ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে মসনবি শরীফ, দেওয়ান-ই-শামস তাবরিজ এবং ফিহি মা ফিহি। মসনবি কে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা ফারসি ভাষার কুরআন হিসাবে পরিগণিত করে থাকে। যদিও আপনারা অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী নন। তারপরও আমি বলবো এই বইগুলো পড়ে দেখতে পারেন। পড়তে তো আর কোন ক্ষতি নেই। মাওলানা রুমি যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তারা হলেন-

১. বাহা উদ্দিন জাকারিয়া।

২. রাজ্জাক আলী গিলানী।

৩.ফরিদ-আল-দ্বীন আত্তার।

৪. সানাঈ

৫. আবু সাঈদ আবদুল্লাহ।

৬. বায়জিদ বোস্তামি।

৭. শামস তাবরিজি।

তার সাহিত্য, দর্শন দ্বারা যারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তারা হলেন-

১. শাহ আব্দুল লতিফ।

২. কাজী নজরুল ইসলাম।

৩. আব্দুল হোসাইন যারিস্কুব।

৪. আব্দুল করিম সরুশ।

৫. হোসেন এলাহি গোমশী।

৬. স্যার ডক্টর আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল।

৭. হাফিজ নোরাব আলী।

৮. শায়খুল বাঙ্গাল (রহঃ)।

৯. হোসেইন নাসর।

রুমি জন্মগ্রহণ করেন স্থানীয় ফার্সি ভাষী মাতাপিতার কাছে। যারা মূলত বালখের বাসিন্দা ছিলেন। যা বর্তমানে আফগানিস্তান নামে পরিচিত। রুমির উপর তার পিতার বেশ প্রভাব ছিলো। তবে পিতার তুলনায় তার উপর বেশি প্রভাব ফেলেছিলো তখনকার ফার্সি কবি আত্তার এবং সানাই। রুমি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন-

"আত্তার হচ্ছে আত্মা, সানাই হচ্ছেন তার দু'চোখ এবং সময় এরপরে, আমরা তাদের ট্রেনে ছিলেম।"

তিনি আত্তারের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে আরো বলেছিলেন-

"আত্তার ভালবাসার সাতটি নগরই ভ্রমণ করেছেন;

আর আমি এখনো একটি গলির প্রান্তরে অবস্থান করছি।"

পিতার বংশের দিক থেকে তিনি নাজিম উদ্দিন কুবরার বংশধর ছিলেন। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় রুম সালতানাত এর পারস্যতে কাটিয়েছেন। তার জীবনের মোর সম্পূর্ণভাবে বদলে দেন দরবেশ শামস তাবরিজ। তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগ অব্দি তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষক এবং আইনজ্ঞ ছিলেন। শামস

মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে শুধুমাত্র একজন কে খুঁজেছেন। তিনি চক্ষু বন্ধ করে বললেন,

"কে আমার সঙ্গ সহ্য করিবে।"

একটি গায়েবি কণ্ঠ তাকে বললেন,

"বিনিময়ে তুমি কি দিবে?"

শামস উত্তর দিলেন, "আমার শির"

কণ্ঠটি আবার বললো,

"তাহলে তুমি যাকে খুঁজছো তিনি কোনিয়ার জালালউদ্দিন"

এরপর তিনি জালালউদ্দিনের খোজে কোনিয়া শহরে পৌছালেন। এলাকার যুবকরা তাকে দেখে ভীড় জমাতে লাগলো। সবাই তার কথায় প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। তখন জালালউদ্দিন রুমির অনুসারীদের নজরে ব্যাপারটা পরে যায়। তারা তৎক্ষনাৎ রুমিকে জানান-

"শহরে একজন দরবেশ এসেছেন। তাকে সবাই সম্মান করতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য যে তিনি শহরের যুবকদের বিভ্রান্ত করছেন।"

রুমি কিছুটা রাগান্বিত হয়ে বললেন, "এ শহরে আমার থেকে এলমের জ্ঞানে সমৃদ্ধ আর কে আছে? তোমরা তাকে আমার দরবারে নিয়ে আসো।"

অতঃপর রুমির অনুসারীরা তাকে ধরে আনার জন্য শহরের চত্বরে উপস্থিত হন। তারা দেখতে পেলেন যুবকদের একটি জটলা রাস্তার পাশে। তারা জটলার কাছাকাছি যেতেই একজন উষ্কখুষ্ক চেহারার ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। গায়ে জরাজীর্ণ আলখাল্লা। তাদের মধ্যে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"আপনিই কি দরবেশ শামস তাবরিজ?"

শামস তাবরিজ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন,

"জি, আমিই শামস। তোমাদের কি রুমি পাঠিয়েছে?"

তাকে ধরে নিয়ে যেতে আসা লোকগুলো সবাই অবাক হয়ে গেলেন। তারা বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

"কিন্তু আপনি এ কথা জানলেন কিভাবে? "

দরবেশ শামস মুচকি হেসে বললেন,

"আমি এতো বছর ধরে চক্কর কেটে বেড়াচ্ছি সে তো তার দর্শন পাওয়ার জন্যই।"

গল্প থামিয়ে আব্দুল দরবেশ অতিথি দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"কি আপনারাও তো ভেবেছিলেন যে আমি কিভাবে আপনাদের সম্পর্কে আগে থেকে জানলাম? আর ওদিকে আমার ভক্ত জলিলুদ্দীনের মনেও একই প্রশ্ন জেগেছে। জলিল সব প্রশ্নের উত্তর খুজতে এক জীবন যথেষ্ট নয়। তুমি এখন কেবল আমার কথার দিকে মনযোগ দাও।"

আব্দুল দরবেশ আবার গল্প শুরু করলেন-

"তো যা বলছিলাম। এরপর শামস রুমির মুরিদদের পথ অনুসরণ করে তার দরবারে পৌছালেন। বাড়ির দরজার সামনে রুমির ভক্তরা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে প্রবেশ করল।"

" শায়েখ, পাগল দরবেশটা এসেছে।"

রুমি দাম্ভিকতার সাথে বললেন,

"তাকে আমার পাঠাগারে বসতে দাও।"

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির বাসগৃহে বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে সুবিশাল পাঠাগার । পাঠাগারটি খুবই সজ্জিত এবং পরিপাটি করে রাখতেন তিনি। এই পাঠাগারের কক্ষের মাঝখানে রয়েছে একটি বড় হাউজ। দরবেশ শামস পাঠাগারে

প্রবেশ করে সেখানে সাজানো বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। ঠিক তখনই ভেতরের কক্ষ থেকে মাওলানা রুমি পাঠাগারে প্রবেশ করলেন। তিনি শামসের বই নিয়ে নাড়াচাড়া দেখে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন,

"হে পাগল শামস! তোমার মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ফকির এসব দুর্লভ বই সম্পর্কে কী জানে? দয়া করে ঐ অশিক্ষিত হাত দিয়ে দুর্লভ বই গুলোতে হাত দিও না। এতে বইগুলো অপমান বোধ করবে। তোমার মতো মূর্খের এই বইয়ের কদর বোঝার মতো জ্ঞান নেই।"

দরবেশ শামস কিছুটা সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সেল্ফ থেকে চার-পাঁচটা বই নিয়ে হাউজে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এমতাবস্থায় রুমি রাগে ফেটে পড়েন। তিনি রাগান্বিত স্বরে বললেন,

"হে নির্বোধ! তুমি এ কী অনিষ্ট করলে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তুমি জানো এই বইগুলো মূল্য কত? হায়! খোদা!"

দরবেশ শামস মুচকি হেসে হাউজ থেকে বইগুলো শুকনো অবস্থায় তুললেন। মাওলানা রুমি এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন,

"এ কিভাবে সম্ভব?"

দরবেশ শামস তার কণ্ঠ শক্ত করে রুমির চোখে চোখ রেখে বললেন,

"হে রুমি! এই জ্ঞান তোমার কাছে নেই!"

আব্দুল দরবেশ গল্প শেষ করে তার পুত্র আদিল কে ডাকলেন,

"আদিল! আদিল! বাবা আদিল!"

ডাকা মাত্রই আদিল হাতে একটি তছবিহ্ নিয়ে হুজরা খানায় প্রবেশ করল।

"বাবা আদিল, অতিথিদের জন্য একটু চা এবং খেজুরের ব্যবস্থা কর।"

"জ্বি বাবা। আমি নিয়ে আসছি।"

আদিল কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল। তরুণ নেতা নুরুল এক দৃষ্টিতে আব্দুল দরবেশের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকে আশরাফ আলী যেন এক অজানা শহরে হারিয়ে গিয়েছেন। কারো মুখেই কোন কথা নেই। সবার চেহারায় এক শিশু সুলভ ভাব জেগে উঠেছে। পাশ থেকে জলিলুদ্দীন তাদের ধাক্কা দিয়ে বললেন,

"কী হে কমরেডস! চুপ করে গেলেন যে! কিছু বলুন! সময় যে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।"

আব্দুল দরবেশ একটু হেয়ালি করে বললেন,

"হ্যা সেটাই, সময় নষ্ট করবেন না। লালন সাইয়ের গানটা শোনেন নি-

" সময় গেলে সাধন হবে না।"

সিপিবি নেতা আশরাফ আলী এবং তরুণ নেতা নুরুল নিজেদের স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এর মাঝেই আব্দুল দরবেশ তরুণ নেতা নুরুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

"এই গল্প থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করলেন আপনি?"

"এটা একটা গাঁজাখুড়ি গল্প। মিথ ছাড়া কিছুই নয়।"

আব্দুল দরবেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

"নুরুল, আপনাদের সমস্যাটাই এখানে। যেটা বোঝার সেটা না বুঝে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন। শুধুমাত্র সারফেস জিনিসটাই গ্রহণ করতে শিখেছেন।"

"যেমন?"

"গল্পটার মূল বিষয়টাই ধরতে পারেন নি!"

পাশ থেকে আশরাফ আলী বলে উঠলেন,

"বুঝেছি! এই গল্পের মোরাল হচ্ছে সব জ্ঞান সবার কাছে থাকে না। এবং কাউকেই তুচ্ছ করা যাবে না।"

"এক্সাক্টলি, ইউ যাস্ট গট দ্য পয়েন্ট।"

আশরাফ আলী বললেন,

"অনেক আজে বাজে কথা তো হলো। আমাদের এখন মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়া উচিত।"

আশরাফ আলীর কথা শেষ হতেই আদিল একটি ট্রে হাতে উপস্থিত হলো। ট্রেতে সুন্দর করে সাজানো চার কাপ চা এবং কিছু খেজুর। আদিল সবাইকে চা - খেজুর পরিবেশন করে কক্ষ ত্যাগ করল। আব্দুল দরবেশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,

"বৈদিক সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের সাথে খুব একটা সাংঘর্ষিক নয়। যদি আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন।"

আশরাফ আলীর চোখ রাগে লাল হয়ে গেলো। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

"এসব আপনি কী বলছেন! মাথা ঠিক আছে আপনার! কিছু সময়ের জন্য আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো কিছুটা হলেও প্রজ্ঞাবান। কিন্তু এ কী করুন অবস্থা আপনার! চোখের সামনে এতো এতো জলজ্যান্ত উদাহরণ থাকতেও আপনি নির্বোধের মতো আচরণ করছেন। সবকিছু অন্ধের মতো অস্বীকার করছেন! এর পেছনে আপনার কোন যুক্তি কাজ করছে?"

নুরুল বলে উঠল, "আপনি কি মন্দিরে শুদ্র মেয়েদের ব্রাহ্মণ কর্তৃক যৌন নির্যাতনের কথা জানেন না? নাকি জেনেও না জানার ভান করছেন?"

আব্দুল দরবেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন,

"শান্ত হন আপনারা! আমাকে কথাটা শেষ করতে দিন আগে। আপনাদের যদি প্রশ্ন করি মার্কসের দর্শন বুঝতে হলে আমাকে কোন বই পড়তে হবে? তখন আপনাদের উত্তর হবে কী? যদি আপনাদের উত্তর হয়, লেলিন-স্ট্যালিন-মাও-র

সাহিত্য পড়তে হবে। তাহলে আমি বলবো আপনারা মার্কসের দর্শনকে সরাসরি জানছেন না। বরং অন্যের চোখে মার্কসকে দেখছেন। এই দেখা বা জানা নিয়ে আপনি যদি মার্কসের সমালোচনা করেন তবে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে? মার্কসের সমালোচনা করতে হলে আমাকে বা আপনাকে তার লেখা রচনা পড়তে হবে। এখন আমি যদি লেলিনের চোখ দিয়ে মার্কসের দর্শন কে বিচার করি তবে তা হবে অন্যায়। এবং সেই সাথে মার্কসের প্রতিও অবিচার করা হবে। তাই কোন তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার আগে আপনাকে সেই তত্ত্বের মূলের কাছে যেতে হবে। কারো ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে মূল তত্ত্বের সমালোচনা করা নীতি বহির্ভূত কাজ।"

আশরাফ আলী বললেন, "ঠিক আছে তাহলে আপনি পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করুন আমাদের সামনে।"

আব্দুল দরবেশ আবার বলতে শুরু করলেন,

"সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি মুখ্য অভিপ্রায় হলো, কেউ সেখানে অভুক্ত থাকবে না। তেমনি বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় গৃহস্থকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- যদি তার গৃহে কোন সাপ বা টিকটিকও বাস করে তবে তারাও যেন অভুক্ত না থাকে। এই নিম্নস্তরের প্রাণীরাও যেনো খাবার পায়। তাহলে সেই সমাজব্যবস্থায় মানুষ না খেয়ে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। বৈদিক সমাজে গৃহস্থ ব্যক্তিরা মধ্যাহ্ন ভোজন করার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতেন,

"যদি কেউ এখনও ক্ষুদার্ত থাকে তবে এসো, খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে।"

যখন এই আহবানে কেউ সাড়া না দিতো, কেবল তখনই গৃহকর্তা খেতে বসতেন। আপনারা যে ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে আজ মারামারি করছেন তা নিয়ে উপনিষদে বলা হয়েছে প্রায় হাজার বছর আগে-

"মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম"

যার অর্থ, "কখনো অপরের সম্পত্তি কিংবা অধিকারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।"

তরুণ নেতা নুরুল হেসে বললেন-

"তা আপনি ভারতবর্ষের প্রকৃত সাংস্কৃতিক প্রথা "বর্ণাশ্রম" কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?"

আব্দুল দরবেশ চায়ের শেষ চুমুকটি দিয়ে বললেন-

"আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। আমাদের আলোচনা ধীরে ধীরে গভীরে পৌছাচ্ছে। আমি আশা করবো আপনারা এরকম সিস্টেমেটিক প্রশ্নের দিকে যাবেন। যাই হোক, ভারতবর্ষের প্রকৃত সাংস্কৃতিক প্রথাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম। এতে আছে চারটি বর্ণ-

১. ব্রাহ্মণ

২. ক্ষত্রিয়

৩. বৈশ্য

৪. শুদ্র

এবং সেই সাথে রয়েছে চারটি আশ্রম-

১. ব্রম্মচর্য

২. গার্হস্থ

৩. বানপ্রস্থ এবং

৪.সন্ন্যাস

বৈদিক প্রথা অনুযায়ী মানুষ যতক্ষণ অব্দি এই চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জীবন-যাপন করছে, ততক্ষন পর্যন্ত তাদেরকে সভ্য মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। বৈদিক শাস্ত্র মতে, মানুষকে এই চারটি সামাজিক বিভাগের আশ্রয় নিতেই হবে, একেই বলা হয় বর্ণাশ্রম।"

আশরাফ আলী মুখে একটি খেজুর পুড়ে দিয়ে বললেন, "নুরুলের প্রশ্ন কিন্তু এটা ছিলো না, জনাব।"

আব্দুল দরবেশ বললেন, "সেই উত্তরের দিকেই আমি যাচ্ছি। এতো দ্রুত সিদ্ধান্তে চলে যাবেন না। এই বর্ণাশ্রম প্রথা শুধু ভারতবর্ষেই নয়; বরং সারা বিশ্বেই এর উপস্থিতি লক্ষ্মণীয়। তবে তা আছে ভিন্ন রুপে ভিন্ন নামে। এখানে, ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায় সমাজের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকেরা। যাদের বলা যেতে পারে সমাজের মস্তিষ্ক। ক্ষত্রিয়রা হচ্ছেন পরিচালক গোষ্টী। বৈশ্যরা হচ্ছেন উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শূদ্রের হচ্ছেন শ্রমিক সম্প্রদায়। আর এটা চিরন্তন। কেওই কিছু করতে পারবে না এখানে।"

আশরাফ আলী বললেন, "অদ্ভুত! আপনি এটাকে চিরন্তন বললেন কিভাবে? অনেক ইউরোপীয় গবেষক এবং রুশ পন্ডিতদের মতে, এই বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন হয় অনেক পরে। আপনি নিজেও প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র পড়লে দেখতে পাবেন যে, তখনকার সমাজ ছিলো জটিলতাবিহীন, ভূমি-ভিত্তিক সমাজ। এই সমস্ত পন্ডিতদের মতে ভারতীয় সভ্যতায় বর্ণাশ্রমের প্রচলন হয়েছিলো বৈদিক সভ্যতার শেষ পর্যায়ে। প্রথম থেকে এই ব্যবস্থা ছিলো না। আর আপনি যদি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের বিশ্লেষণ করে দেখেন, তবে দেখবেন যে, প্রাচীন বৈদিক সমাজে এই বর্ণাশ্রমের প্রচলন ছিলো না।"

আব্দুল দরবেশ হেসে ফেলল, "আপনাদের সমস্যা হলো প্রতিটা তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনারা ব্যর্থ। পবিত্র গীতাতে বলা হয়েছে- "সৃষ্টং চাতুর্বর্ণ্যং ময়া"

এটা ভগবদগীতায় পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছিলো। এমনকি গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন-

"এই ভগবদগীতার তত্ত্ব আমি প্রথমে সূর্যদেব কে বলি।"

সুতরাং আপনারা যদি তা সময়ের মাপকাঠিতে হিসাব করতে চান তবে তা ৪ কোটি বছর আগের কথা। ইউরোপীয় পন্ডিতেরা ৫০০০ বছর আগের ইতিহাসেও

ঠিকভাবে জানে না। সেখানে তাদের পক্ষে ৪,০০,০০,০০০ বছর আগেকার কথা কল্পনা করা কিভাবে সম্ভব? আমার কাছে প্রমাণ আছে বর্ণাশ্রম ধর্ম ৫০০০ বছর আগে বর্তমান ছিলো। বিষ্ণু পুরানেও বর্ণাশ্রম ধর্মের উল্লেখ আছে-

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেন পরঃ পুমান"

তাই বর্তমান সমাজের মাপকাঠিতে বর্ণাশ্রমের বিচার করা সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে প্রকৃতিগত ধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে এর তুলনা করা হয়েছে দেহের সঙ্গে; দেহকে যেমন চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. মাথা

২. হাত

৩. উদর এবং

৪. পা

ঠিক তেমনি, প্রাকৃতিক নিয়মে সমাজ নামক দেহেরও চারটি ভাগ আছে । এক শ্রেণির লোকেরা হচ্ছেন সমাজের মাথা। এক শ্রেণির লোকেরা হচ্ছেন সমাজের উদর- অর্থাৎ, সমাজের যা কিছু প্রয়োজন তা তারা উৎপাদন করে পুরো সমাজের চাহিদার যোগান দেয়। আর এক শ্রেণির লোকেরা হচ্ছেন সমাজের পা- তাদের উপর ভর করে, সমস্ত সমাজটা দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই ইতিহাসকে অনুসরণ করে বর্ণাশ্রমের কাল নির্ণয় করার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই- সৃষ্টির মূহুর্ত থেকেই তা বর্তমান। "

আশরাফ আলী বললেন, "আপনি বলছেন, যে কোন সমাজেই এই চারটি বিভাগ রয়েছে। তবে তা কিন্তু যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। যেমন ধরেন, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক বিভাগ অনুযায়ী সমস্ত সমাজকে চারটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায়, তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে তা মেলাতে অসুবিধা হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে। সোভিয়েত আওতাভুক্ত দেশ গুলোতে উৎপাদক গোষ্ঠী এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আপনিই বলুন কী প্রক্রিয়ায় তা আপনি ভাগ

করবেন? যেমন দেখুন, আমারা হচ্ছি চিন্তাশীল বা বুদ্ধিজীবী মানুষ। এটা একটা বিভাগ হিসাব আপনি ধরতে পারেন। আমরা যদি চিন্তাশীল মানুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হই, তবে কি প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন?"

"অবশ্যই।"

"এবং তারপর তাদের দ্বারা মনোনীত শ্রেণীই হচ্ছে পরিচালক শ্রেণী, তাই তো?"

"হ্যা।"

নুরুল পাশ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "তবে বৈশ্য ও শূদ্র কারা? কেননা বাকি আর সকলেই শ্রমিক- কারখানার শ্রমিক, যৌথ খামারের শ্রমিক ইত্যাদি। তাই এই অংশে এসে আপনাকে মানতেই হবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে পূর্ববর্তী বর্ণাশ্রম সমাজের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আপনি আপনার এই ভাগ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের সাথে মেলাতে পারবেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে তা অসম্ভব। কারণ, আমাদের সমাজে কোন বৈশ্য নেই। কারখানার পরিচালক রয়েছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানেই কারখানার কাজ চলছে। এ কাজ যারা করছেন তাদের কে ক্ষত্রিয় বলা যেতে পারে। আর আছে শূদ্র। অর্থাৎ শ্রমিক। এই দুইয়ের মাঝে সমাজতান্ত্রিক সমাজে আর কোন শ্রেণী নেই। মোদ্দাকথা, আমাদের সমাজে সবাই মূলত শূদ্র বা শ্রমিক।"

আব্দুল দরবেশ বললেন,

"শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "কলৌ শুদ্র - সম্ভবাঃ" বর্তমান যুগে প্রকৃতপক্ষে সকলেই শূদ্র। আর যদি সমাজের সকলকেই আপনি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেন, তবে সামাজিক কাঠামোটাই বিকৃত হয়ে যাবে। সোভিয়েত সমাজ যদিও শূদ্রের সমাজ। তবু সেখানেও ব্রাহ্মণের দেখা পাওয়া যায়। এটা অপরিহার্য। যেমনঃ আপনাদের পলিসি মেকার লেলিন কিংবা স্ট্যালিন। সমাজের শ্রেণীগুলোতে যদি মানুষদের ঠিকভাবে বিভক্ত করা না যায়। তবে বিশৃঙ্খলা দেখে দেবেই। যেমন দেখুন না আপনাদের পার্টির মধ্যেই একগাদা পদ। সভাপতি আর প্রচার সম্পাদকের কাজ এবং মূল্য কি একই? আপনারা সবাইকে শূদ্র শ্রেণিভূক্ত করতেই পারেন। কিন্তু, সুষ্ঠ

ভাবে সমাজ পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে কয়েকজন শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করে গড়ে তুলতে হবে। কেবল শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে সমাজ বাঁচতে পারে না। ঠিক তেমনি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের উপর ভিত্তি করেও সমাজ টিকে থাকতে পারবে না। একটি আরেকটির পরিপূরক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, দেহের প্রয়োজন মেটাতে হলে মাথা, হাত, উদর, পা- এই সবকিছুরই দরকার। মাথা, হাত, উদর এবং পা যৌথভাবে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে বিধায়ই সারা দেহের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। তাই লক্ষ্য করে দেখবেন, যে সমাজে এই চারটি বিভাগ নেই, সেখানে বিশৃঙ্খলা আসবেই। সুষ্ঠভাবে সেই সমাজ কোন দিন চলতে পারে না। সেখানে মায়ার আধিপত্য দেখা দিবে। যে কোন সমাজে মস্তিষ্কের প্রয়োজন অপরিহার্য এবং আজকের সমাজে সেই মস্তিষ্করই ভীষণ অভাব। আমি আপনাদের অথবা কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের কথা বলছি না। আমি সমস্ত পৃথিবীর কথা বলছি। পূর্বে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা ছিলো রাজতন্ত্র। যেমন ধরেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করে সর্বত্যাগী হয়ে বনে গেলেন আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য। মানুষ যদি সম্পূর্ণ বিশ্বে সমাজের শান্তি ও উন্নতি কামনা করে তবে অতি বুদ্ধিমান লোকদের একটি শ্রেণি গড়ে তুলতেই হবে। অতি বিচক্ষণ একটি পরিচালক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। দক্ষ উৎপাদকের একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে। এবং গায়ে গতরে খেটে যারা কাজ করবে তাদের একটি শ্রেণি থাকাও অপরিহার্য। আপনি যতই উন্নত রাজনৈতিক মতবাদকে আপনাদের রাষ্ট্র শাসনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেন না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের এই চারটি অঙ্গকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে না তোলা যাবে, ততক্ষণ অব্দি সমাজ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হতে পারবে না।"

তরুণ নেতা নুরুল ফুঁসে উঠে বললেন,

"আপনি একটা বদ্ধ পাগল! আপনার এই ভাঙা ক্যাসেট অন্য কাওকে শুনবেন। বর্তমান যুগের যে কোন সমাজের জন্য শ্রম-বন্টনের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা খুবই জটিল বিষয়। আর এই তত্ত্ব যে চরম মাত্রায় বিভ্রান্তিকর আজ সারাবিশ্বের শূদ্র সমাজের বিপ্লবই তার প্রমাণ।"

আব্দুল দরবেশ শান্তস্বরে বললেন,

"দয়া করে রাগ করবেন না। আমি এই বিপ্লব এবং বিভ্রান্তির ব্যাপারটার সাথে আমি দ্বিমত করছি না। কিন্তু এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো পরে। যখন ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ব্রাহ্মণের গুণ না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব দাবি করলো এবং লোকেরা অন্ধের মত সেই দাবীকে সামাজিক রীতি বলে মনে করে তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করল। তার ফলাফল স্বরূপ ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিলো। এই একই অবস্থার কারণেই বিশ্বের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিলো। যার ফল হিসাবে আমরা এখন শ্রমিক বিপ্লব দেখতে পাচ্ছি। যে যেখানে যোগ্য, তাকে ঠিক সেখানেই বসাতে হবে। পৃথিবীর সর্বত্রই ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের প্রয়োজন। তবে তা অবশ্যই সঠিক উপায়ে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন সম্রাট ছিলেন। তার রাজত্বে একদল ব্রাহ্মণ ও মহাজ্ঞানী ঋষিদের নিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা মন্ডলী ছিলো এবং তিনি তাদের কাছ থেকে উপদেশ এবং মন্ত্রণা গ্রহণ করতেন। তখনকার দিনে সম্রাটেরা স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, কোন রাজা সুদক্ষভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে না পারলে ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা মন্ডলী তাদের সিংহাসনচ্যুত করতো। ব্রাহ্মণেরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন না। কিন্তু রাজাকে তারা রাজকার্য পরিচালনার পরামর্শ দিতো। এটা তো খুব বেশিদিন আগেকার কথাও না। অশোক কতোদিন আগে রাজত্ব করেছিলেন তা কি আপনার জানা নেই?"

আশরাফ আলী বললেন,

"ইতিহাস অনুযায়ী সেটা প্রায় প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারত।"

"হ্যা।"

তরুণ নেতা নুরুল বলে উঠলেন,

"আব্দুল দরবেশ, আমাদের আলোচনা মনে হয় খুব বেশি বৈদিক শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে গেছে। এখন আমাদের উচিত শুধুমাত্র এককভাবে মার্কসীয় দর্শন নিয়ে

আলোচনা করা। আমার সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, মার্কসীয় দর্শন কতটা যৌক্তিক আপনার কাছে?"

আব্দুল দরবেশ তার আসন থেকে উঠে দাড়ালেন। কক্ষে একটি মাত্র জানালা রয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই জানালাটা বন্ধ থাকে। আজ তিনি সেটা খুলে দিলেন। সাথে সাথে এক চিলতে আলো ঘরে প্রবেশ করে তার ভেতরে থাকা অন্ধকারকে দূর করে দিলো। দেখে মনে হচ্ছে যেন কক্ষটি তার হারানো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। জলিলুদ্দীন খানিকটা বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ, তিনি আজ পর্যন্ত কখনো আব্দুল দরবেশকে এ ঘরের জানালা খুলতে দেখেননি। আব্দুল দরবেশ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জলিলুদ্দীন কে ইঙ্গিত করে বললেন,

"জলিল অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনাদের জীবনে আলোর খুবই অভাব। তাই কৃত্রিম আলো দিয়ে আপনাদেরকে কিছুটা আলোকিত করা যায় কি না সেই চেষ্টা করছিলাম! মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে আপনারা ঠিক কতটুকু জানেন এবং এক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান আমার আগে জানতে হবে। আমার এই আলোচনার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে সংক্ষেপে বলবেন কারণ আমি এই মুহূর্তে বেশ ক্লান্তি অনুভব করছি।"

আশরাফ আলী বললেন,

"আমার মনে হয় আপনি মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন। তারপরও আমি সংক্ষেপে পুরো চিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কার্ল মার্ক্স প্রথমেই বলেছেন-

"দার্শনিকরা এই পৃথিবীকে কেবল বিশ্লেষণই করে গেছেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পৃথিবীর পরিবর্তন সাধন করা।"

এই উক্তিটি আপনাদের মতো হুজরাখানায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা ভণ্ড দার্শনিকদের উদ্দেশ্য করেই তিনি বলেছিলেন। আপনাদের কাছে আছে শুধু কথার ঝুড়ি আছে কিন্তু বাস্তবিক কোনো সমাধান নেই। সে যাই হোক, তার দর্শনকে বলা

হয় "ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়ালিজম"; যার বাংলায় দাঁড়ায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই তত্ত্ব তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়-

১. থিসিস (যুক্তি)

২. এন্টি থিসিস (বিরোধ)

৩. সিনথিসিস (সমন্বয়)

এই তত্ত্ব মূলত মার্কস তার শিক্ষক হেগেলের কাছ থেকে ধার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তা সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রয়োগ করেছিলেন। এই ধারণাটিকে সহজভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে এভাবে-

"সমাজে দুটো শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে। অবশেষে যে সমাধান আসবে সেটাই মূলত সাম্যবাদ বা কমিউনিজম।"

তার মতবাদ হচ্ছে, বহুকাল ধরে বুর্জোয়া (মালিক সম্প্রদায়) এবং প্রোলেতারিয়াতদের (শ্রমিক সম্প্রদায়) মধ্যে সংঘাত চলে আসছে এবং কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখানে, মালিক সম্প্রদায়কে থিসিস, শ্রমিক সম্প্রদায়কে এন্টি থিসিস বলা হয়। এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, এই দ্বন্দ্বে মূলত জিতবে কারা? মার্কসের মতে, যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর কাছেই সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা জিম্মি এবং তারা সংখ্যায়ও অনেক অধিক। তাই এই যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় অনিবার্য। শ্রমিক শ্রেণী - ধণিক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। যা অবশেষে এক শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।"

আব্দুল দরবেশ খুব মনযোগ দিয়ে কথা গুলো শুনে বললেন,

"খুবই গতানুগতিক তথ্য দিলেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন একটাই, শ্রেণীবিহীন সমাজ কিভাবে সম্ভব? মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আপনার প্রকৃতি আমার প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। তাই কৃত্রিমভাবে আমাদের কি করে এক স্তরে আনা সম্ভব?"

[illegible] বললেন.

মার্কসের মতে মানুষের প্রকৃতি আর তাদের শ্রম ও উৎপাদন [illegible] শ্রেণীহীন সমাজে সবাই [illegible]।

আচ্ছা, তাহলে শিল্পের প্রয়োজন [illegible] বলছেন?

অবশ্যই

আদম নরবেশ প্রশ্ন করে বললেন, "তবে এই শ্রেণীহীন সমাজের উদ্দেশ্য কী হবে? তার আদর্শ কী হবে?"

অধ্যাপক আলী বললেন, "আদর্শ হচ্ছে - 'প্রত্যেকের সাধ্য অনুসারে দেওয়া এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া'। এই আদর্শটি হচ্ছে এমন যে, 'সকলেই কিছু না কিছু দেবে এবং সকলেই তাদের প্রয়োজন অনুসারে পাবে।"

আদম নরবেশ বললেন, "কিন্তু প্রত্যেকের দেওয়ার ক্ষমতা কি এক? একজন বৈজ্ঞানিক একরকম ভাবে সমাজকে কিছু দেয়, আর একজন দার্শনিক অন্যভাবে সমাজকে কিছু দেয়। যেমনঃ

একটি গাভী দুধ দেয়, আর

একটি কুকুর পাহারা দেয়।

এমন কি বৃক্ষ, পশু, পাখি - সকলেই কিছু না কিছু দিচ্ছে। তাই প্রকৃতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইতিমধ্যেই আদান-প্রদানের একটি বন্দোবস্ত রয়েছে। সুতরাং শ্রেণীবিহীন সমাজ কিভাবে সম্ভব?"

তরুণ নেতা নুরুল বলে উঠলেন,

"মার্কসের মতে যৌথভাবে সকলেই সমস্ত উৎপাদনের মালিক হবে। কেউই কারো উপর আধিপত্য করতে পারবে না। ফলে মানুষ মানুষকে প্রতারণা করতে পারবে না। মার্কস "লাভ" এর পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু বিচার করেছেন।"

"আচ্ছা, তাহলে তো আমাদের প্রথম জানা উচিত লাভ বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়? যেমন- আমেরিকান হিপ্পিদের ইতিমধ্যেই অনেক কিছু লাভ হয়েছিলো। তারা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলো। তাদের পিতা-মাতারা ছিলো অত্যন্ত ধনী তাদের বলতে গেলে জাগতিক সবকিছুই ছিলো। কিন্তু তারপরও তারা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তারা সবকিছু বর্জন করেছে। তাই " লাভ" বন্টনের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিহীন সমাজের ধারণাটিই ভ্রান্ত। আর তা ছাড়া কমিউনিস্টরা বর্ণ-বিহীন সমাজ তৈরি করতে আদৌ পেরেছে কি? মস্কোর এখন একটি স্বাভাবিক চিত্র হচ্ছে কিছু দরিদ্র মহিলা রাস্তা পরিষ্কার করছে। অপর দিকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাদের দামি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং শ্রেণীবিহীন সমাজটা কোথায়? সমাজ-ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণী থাকতে বাধ্য। কিন্তু সমাজের কেন্দ্রবিন্দু যদি এক হয় তবে কেউ বড় কাজ করুক কিংবা ছোট কাজ, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। যেমনঃ আমাদের এই শরীরটির বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে- মাথা, হাত, পা- কিন্তু সকলেই কাজ করছে শুধুমাত্র উদরের জন্য। "

আশরাফ আলী বললেন,

"মার্কসের দর্শন সম্পর্কে আপনার ধারণাটি পুরোপুরি ভ্রান্ত।"

"হ্যা। তবে এই "ভ্রান্ত ধারণা" অবশ্যম্ভাবী। তারা কোনদিনই বর্ণহীন সমাজ তৈরি করতে পারবে না। কারণ আমি আগেই বলেছি প্রত্যেকের মধ্যে মনোভাবের ভিন্নতা রয়েছে। আর এটাই ন্যাচারাল ল'।"

জলিলুদ্দীন দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। কোন কথা বলছিলেন না। তিনি হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন,

"বাবা, আমি এই টপিকের সাথেই রিলেটেড একটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই।"

"অবশ্যই।"

"আপনি যে দেহের অংশগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, আমাদের মাথা, হাত, পা - শরীরের উদরকে কেন্দ্র করে কাজ করে। ঠিক তেমনি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও কিন্তু সব

জনগণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই কাজ করে। এখানে আমি তো কোন ভিন্নতা দেখছি না।"

জলিলের এই প্রশ্নে আশরাফ আলী এবং নরুল খানিকটা অবাক হলেন। তারা ভেবেছিলেন জলিলুদ্দীন পুরোপুরি বিগড়ে গেছে।

আব্দুল দরবেশ জলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার এই প্রশ্নই প্রমাণ করে আমি তোমাকে বেঁধে রাখিনি। তোমাকে আমি উম্মুক্ত চিন্তা করার স্বাধীনতা দিয়েছি। যাই হোক তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। "রাষ্ট্র" কখনো নিখুঁত হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্র থেকে সরকারকে আক্ষরিকভাবে আলাদা ভাবা হলেও তার পরিচালক একজন মানুষ। একজন "মানুষ" কিভাবে নিখুঁত হবেন? চাক্ষুষ প্রমাণ দিচ্ছি- রাশিয়ান সরকার যদি অভ্রান্ত হতো, তা হলে ক্রুশ্চেভকে কেন গদিচ্যুত করা হলো? তাকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়েছিলো। তবে কেন সেই ক্রুশ্চেভকেই গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো?"

আশরাফ আলী বললেন,

"কারণ তিনি শ্রেণীশত্রু ছিলেন। এবং সেই সাথে তিনি জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।"

"আচ্ছা, তাহলে পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান যে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই একই কাজ বারবার ঘটবে। শ্রেণীশত্রু নাম নিয়ে আপনারা কতজনকে হত্যা করতে পারবেন? কেন্দ্র ক্রুশ্চেভ যেহেতু ত্রুটিহীন নয় তাই জনসাধারণ তার আনুগত্য স্বীকার অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। অকমিউনিষ্ট দেশগুলোতেও সেই একই জিনিস দেখা যাচ্ছে - সরকার পরবর্তীত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীদের গদিচ্যুত করা হচ্ছে, সাথে রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তাহলে রাশিয়ার কমিউনিজম এবং অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক পন্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী? অন্যান্য দেশ গুলোতে যা হচ্ছে, সোভিয়েত আওতাভুক্ত দেশেগুলোতে ঠিক একই ব্যাপার চলমান। পার্থক্য শুধু নামে। আপনারা আজ ঈশ্বরকে অস্বীকার করছেন, ঈশ্বরের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়ানো যাবে না। ঠিক আছে ধরেই নিলাম

ধর্ম ভ্রান্ত - ঈশ্বর ভূঁয়া। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা ঈশ্বরকে ছুঁড়ে ফেলে লেলিনকে কি ঈশ্বরের জায়গা দেন নি? তার তত্ত্বের কাছে কি মাথা নত করেন নি? আপনারা মূর্তি পূজার বিরোধিতা করে নিজেরাই পাড়ার মোড়ে মোড়ে বসিয়েছেন লেলিনের মূর্তি! ধার্মিকদের বলছেন উগ্রবাদী, তারা নাকি ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করছে। ধরে নিলাম এটা সত্য। কিন্তু আপনারা কি করছেন? শ্রেণিশত্রু নাম দিয়ে এখন মানুষ হত্যা করছে কারা? কেউ মাও-লেলিন-স্ট্যালিনের সমালোচনা করলে তার মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য - জেল, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি করে অত্যাচার করছে কোন ধার্মিক গোষ্ঠী? এই একই দমন পুঁজিবাদী দেশ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের উপর চালিয়ে আসছে! তাহলে দিনশেষে আপনাদের মধ্যে নৈতিক পার্থক্যটা কোথায়?"

চারিদিকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। জলিলুদ্দীন, আশরাফ আলী এবং তরুণ নেতা নুরুলকে দেখে মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীটা তাদের মাথার উপর ভেঙে পড়েছে। আশরাফ আলী মরিয়া হয়ে উঠলেন এতো বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা আদর্শকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তিনি আশায় বুক বেধে ছিলেন হয়তো তরুণ নেতা কিছু একটা বলবেন। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন মৃত লাশ যেন। আশরাফ আলী উপায় না দেখে নিজেই বললেন,

"ইতিহাস পাঠ করে মার্কস সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা এমন কি মানুষের চিন্তাধারাও গঠিত হয় অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে।"

আব্দুল দরবেশ তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললেন, "আমেরিকার মত অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ উন্নত দেশগুলোর সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে মার্কসের ধারণা কী বলতে পারেন?"

"তিনি বলেছেন - পুঁজিবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপাদনের অধঃপতিত অবস্থা। কেননা এটা এক শ্রেণির লোকের উপর অন্য শ্রেণির লোকেদের শোষন করার উপর নির্ভরশীল।"

আব্দুল দরবেশ বললেন, "মূর্খের দল সব। আপনারা নিজেদের দিকে একবার তাকান। আপনারা কী করছেন? ভেবেছেন আমি হুজরাখানার ভেতর বন্দি থাকি! দ্বীন দুনিয়ার কোন খবর রাখি না? আমি অন্ধ নই। আমি সচেতনভাবে জ্ঞান আহরণ করি। বুকে হাত দিয়ে বলুন- শোষন কি আপনাদের সো কল্ড কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে হচ্ছে না? ক্রুশ্চেভকে গদিচ্যুত করা হলো। কেননা সে তার পদের সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করছিলো। সে সরকারি বড় পদে তার পুত্র এবং মেয়ে জামাই কে বসিয়ে ছিলো।"

আশরাফ আলী বললেন, "হ্যা, তিনি মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন।"

"শুনুন, জনাব এসব আষাঢ়ে গাল-গপ্প, যুক্তি তরুণ নেতাদের শোনাবেন। কাজে দেবে। কিন্তু, আমাকে এসব বোঝাতে আসবেন না।"

"আপনি কিন্তু রেগে যাচ্ছেন।"

"হ্যা, আমি রাগছি কারণ আপনারা নিজেরা ভুল পথে হেঁটে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করছেন। এক অন্ধ আরেক অন্ধ কে পথ দেখাতে পারে না। আপনি বলছেন ক্রুশ্চেভ মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাহলে আমি তো বলতেই পারি, যেকোন নেতাই এভাবে বিচ্যুত হতে পারে। আর যেকোন নেতাই যেহেতু মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে, তাই পূর্ণতা আসবে কোথা থেকে? মূল কথা হচ্ছে কেন্দ্র বিন্দু রূপে যিনি থাকবেন, তাকে অবশ্যই অভ্রান্ত হতে হবে। কেবল তখনই তার নির্দেশগুলো অভ্রান্ত হবে। তা না হলে কতগুলো ভ্রান্ত মানুষকে ক্ষমতায় বসিয়ে লাভ কী? পাপকর্মগুলো তখনও বৃত্তাকারে চলতে থাকবে।"

তরুণ নেতা বললেন,

"আমাদের কাছে নেতা নির্বাচনের মাপকাঠি মার্কসীয় দর্শন। যিনি অবিচলিত ভাবে মার্কসের দর্শন অনুশীলন করবেন তিনিই আদর্শ নেতা।"

"নেতা মাপার সেই মাপকাঠিতেই সমস্যা। শ্রেণীবিহীন সমাজ সম্পর্কে তার যে প্রস্তাব তা কখনো কার্যকরী হয়নি। এক শ্রেণির মানুষ কে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে

হবে এবং আর এক শ্রেণির মানুষ কে রাস্তা ঝাট দিতেই হবে। সুতরাং বর্ণহীন সমাজ হবে কী করে? অন্য একজনকে মস্ত বড় রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত হতে দেখে রাস্তার ঝাড়ুদার সন্তুষ্ট হবে কী করে? সে মনে মনে ভাবতে বাধ্য-

"ও আমাকে জোর করে রাস্তা ঝাড় দেয়ার কাজ করাচ্ছে। আর নিজে আরামে গদিতে বসে আছে।"

এই সমস্যার সমাধান একটাই আর তা হলো একজন আদর্শ মানুষ খুঁজে বের করতে হবে। যাকে সমাজের ১০০% মানুষ সমর্থন করবে। কিন্তু কমিউনিস্ট দেশগুলোতে সেই "আদর্শ মানুষ" কোথায়?"

তরুণ নেতা নুরুল বললেন, "আমাদের আদর্শ নেতা ছিলেন লেলিন।"

"হা হা! আর হাসাবেন না দয়া করে। লেলিন! ভেবে বলছেন তো? লেলিন এমন একজন নেতা ছিলেন যাকে আক্ষরিকভাবে কেউই গ্রহণ করে নি। যদি তাই করতো তবে আপনারা "স্ট্যালিনবাদ-মাওবাদ" নামক নতুন টার্ম সংযোজন করতেন না। লেলিনের একমাত্র কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি তার সরকারকে উচ্ছেদ করেছিলেন। লেলিনের লিখিত সাহিত্য কটা মানুষকে সুখী করতে পেরেছে? আমরা এখন সবাই জানি রাষ্ট্র তাদের উপর কৃত্রিমভাবে সুখী হওয়ার ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল। যিনিই কোন সমস্যার ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন, তাকেই শ্রেণী শত্রু বানিয়ে জেলে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডে দেয়া হয়েছে।"

জলিলুদ্দীন পাশ থেকে বললেন, "মার্কসের নীতি অনুযায়ী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ হলেই তারা সুখে থাকবে। তাই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য জাগতিক জিনিসপত্র উৎপাদন করে থাকে।"

"এই কথাগুলো পুরোটাই অর্থহীন। আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে পৃথিবীর কোন দেশের তুলনা হয় না। কিন্তু তবুও সেখানকার মানুষ সন্তুষ্ট নয়। উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই যে সকলে সুখী হবে তেমনটা নয়। মানুষ তো আর গরু ছাগল না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খাওয়া না। তার শারীরিক চাহিদার পাশাপাশি রয়েছে তীব্র মানসিক চাহিদা। ভারতবর্ষে বহু মানুষ নিঃসঙ্গভাবে জঙ্গল

কিংবা হিমালয়ে ধ্যান সাধনা করে। তাদের তেমন কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধি হলে তারা কি সন্তুষ্টি লাভ করবে? তাদের কাছে গিয়ে যদি কেউ বলে, আপনি যোগ অভ্যাস বা ধ্যান সাধনা বন্ধ করে দিলে আমি আপনাকে দু'শ বস্তা চাল দেব।" এরকম প্রস্তাবে তারা শুধু হাসবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই যে সকলে সুখী হবে, এটা একটি পশুর মনোভাব। যথার্থ আনন্দ উৎপাদন অথবা অনাহার কোনটির উপরই নির্ভর করে না। এটা অনেকাংশে নির্ভর করে মানসিক অবস্থার উপর। যেমনঃ কোন শিশু কাঁদলে মা যদি তার কান্নার কারণ বুঝতে না পারেন তবে কেবল একটু দুধ পেয়েই সেই শিশু সন্তুষ্ট হবে না। তেমনি মানব-সভ্যতার অসন্তোষের কারণ কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদনের অক্ষমতা নয়। মানুষের অসন্তোষের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তার মধ্যে হয়তো একটি অর্থনৈতিক উৎপাদনের অক্ষমতা। এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমেরিকা। সেখানে সব কিছুই পর্যাপ্ত মাত্রায় উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু তবুও সেখানকার যুবক সম্প্রদায় হিপ্পি হয়ে যাচ্ছে। তারা সন্তুষ্ট নয়, বিভ্রান্ত। মার্কসের সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের দুরাবস্থা পর্যবেক্ষণ করে।"

তরুণ নেতা নুরুল নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন,

"আপনি ঠিকই বলছেন। শুধুমাত্র খাদ্য মানুষকে সুখী করার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি তাই হতো তবে দেশে দেশে ফ্রিডম অব স্পিচের জন্য আন্দোলন হতো না।"

জলিলুদ্দীন এবং আশরাফ আলী অবাক হয়ে গেলেন নুরুলের কথায়। কিন্তু তারা কী বলবেন খুঁজে পেলেন না৷ প্রকৃতি এক অদৃশ্য হাতে যেন তাদের গলা টেনে ধরেছে। আব্দুল দরবেশ বলতে লাগলেন,

"প্রকৃতিতে ভোক্তা এবং সেবক শ্রেণী থাকতে বাধ্য। যেমনঃ আমাদের দেহের উদর বা পেট হচ্ছে ভোক্তা এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি হচ্ছে সেবক। তাই এই ব্যবস্থাটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কেউ না কেউ ভোক্তার ভূমিকা পালন করবে। অপর দিকে কেউ না কেউ সেবকের ভূমিকা পালন করবে। পুঁজিবাদী

সমাজে যেটা বিদ্যমান। রাশিয়াতেও তাই বিদ্যমান। আমরা জানি রাশিয়াতে সর্বদাই মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত হচ্ছে।

একদিকে শ্রমিকরা বলছে - "এটা যদি শ্রেণীবিহীন সমাজ হয়, তা হলে ঐ লোকটা কেন আরামে গদিতে বসে রয়েছে এবং আমাদের সকলকে কাজ করতে আদেশ করছে?" এই সমস্যা রাশিয়া দূর করতে পারেনি। ষ্ট্যালিনের বিলাসবহুল জীবনধারা তারই প্রমাণ । তাই যথার্থ শ্রেণীবিহীন সমাজ তখনই তৈরি করা যাবে যখন মালিক এবং শ্রমিক তাদের নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু পূরণ করতে পারবে।"

আশরাফ আলী উঠে দাড়ালেন। তার দেখাদেখি তরুণ নেতা নুরুলও। কোন কথা না বলে আশরাফ আলী কক্ষ থেকে বেড়িয়ে গেলেন। তাকে অনুসরণ করলেন নুরুল। আব্দুল দরবেশ কিছু সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। জলিলুদ্দীন এখনো আগের অবস্থানেই বসে আছেন।

আব্দুল দরবেশ তাকে বললেন- "তুমিও চাইলে চলে যেতে পারো। সত্য সবার জন্য নয়। মুহাম্মদ (সাঃ)-র দর্শন আবু লাহাবও পেয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহাবী নন; বরং কাফের।"

জলিলুদ্দীন বাবার কথার ভেদ খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে যথাযথ আদবের সাথে কক্ষ থেকে প্রস্থান করলেন।

বেলা ১.২০ মিনিট

আব্দুল দরবেশ গোসল সেরে ওযু করে জোহরের নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করতেই বেশি পছন্দ করেন। তবে আজ সকাল থেকে ভারী বিষয় নিয়ে এতো বেশি আলোচনা হয়েছে যে তিনি অনেকটাই ক্লান্ত বোধ করছেন। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও আব্দুল দরবেশের সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছু সময় পর মোনাজাত শেষে আব্দুল দরবেশ আদিলকে বললেন-

"শোন আদিল, এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কারো কথা শোনাটা পাপ। এই অভ্যাস তুমি অবশ্যই ত্যাগ করবে।"

আদিল শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তার মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন আনাগোনা করছে। কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস তার হলো না। আজ সারাদিন বাবার শরীরের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গিয়েছে। তার মেজাজটাও কিছুটা বিগড়ে আছে। বিবি হাজেরা বললেন, "এখন খাবার বাড়ব সবার জন্য?"

আব্দুল দরবেশ সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নড়লেন।

আব্দুল দরবেশের পরিবারের সদস্য নেহাত কম নয়। দুই ছেলে, চার মেয়ে। বড় ছেলের নাম মারুফ। যিনি এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আছেন। ছোট ছেলে আদিলের বয়স তেরো। চার মেয়ে যথাক্রমে আফসারি, মানসুরা, রাজিয়া এবং শারমিন। আফসারির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তিনি কুড়িগ্রামে নিজ শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। বাকিরা সবাই পড়াশোনা করছে। আফসারি এবং মারুফ ব্যতীত আব্দুল দরবেশের বাড়িতে বর্তমান সদস্য সংখ্যা পাঁচ।

রাত ১১.৩৩ মিনিট

আব্দুল দরবেশের বাড়িটি ময়মনসিংহ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হলেও এই এলাকার তেমন কোন বাহ্যিক উন্নয়ন হয় নি। বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হয়েছে বছর খানেক হবে। এখানে এশার নামাজের পরেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাট তো দূরের কথা আশেপাশের বাড়ি গুলোতে রাত ৯.০০ টার পর আলো জ্বলতেও দেখা যায় না। পুরো এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র ফকির বাড়িতেই গভীর রাত পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখা যায়। সারাদিনের কাজ শেষে প্রতিদিন রাত ১১.৩৩ মিনিটে শুরু হয় পারিবারিক তালিম। তালিম দেন স্বয়ং আব্দুল দরবেশ। পরিবারের সবাই তার হাতেই বায়াতবদ্ধ।

হুজরাখানার ভেতরে সবাই যার যার অবস্থানে বসে আছেন। আব্দুল দরবেশ সবার সামনে। তার হাতে একটি তছবিহ। একদম স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি। সামনে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বলছে। হুজরাখানার ভেতরে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। আব্দুল দরবেশই তা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি কোনো সদুত্তর দেননি। হুজরাখানার ভেতরটা ভরে আছে আগরবাতির ধোঁয়ায়। এক অদ্ভুত সুগন্ধিতে চারদিক আচ্ছাদিত। আব্দুল দরবেশ গভীর ধ্যানে মগ্ন। পরিবারের সবাই অপেক্ষা করছেন তাঁর চোখ খোলার। কিছু সময় পর আব্দুল দরবেশ চোখ খুললেন। তিনি চোখ খুলতেই একে একে সবাই তার সাথে মুসাফা সেড়ে নিলেন।

আব্দুল দরবেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন,"আজ আমি নিজে থেকে কোন রহস্যালোকের জ্ঞান তোমাদের দিবো না। শুধু তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিবো। কেবল একটি প্রশ্নই গৃহীত হবে। কে করতে চাও?"

আব্দুল দরবেশের কথা শেষ না হতেই আদিল উৎসাহী কণ্ঠে বলে উঠল,

"বাবা, আমার অনেক গুলো প্রশ্ন আছে। যেহেতু একটি মাত্র প্রশ্নই করার অনুমতি দিচ্ছেন তাই যে প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে, আপনি অনুমতি দিলে তা ব্যক্ত করে পারি।"

"অবশ্যই, আদিল। ব্যক্ত কর তোমার সংশয় এবং প্রশান্ত করো তোমার দিলকে। নয়তো আল্লাহর কাছে আমার এর জবাবদিহি করতে হবে।"

আদিল বলল, "বাবা, আমরা জানি মূর্তি পূজা করা পাপ। পূর্বে অনেক জাতিকে নাকি আল্লাহ এই মূর্তি পূজার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই ভারতবর্ষে তো হাজার হাজার বছর ধরে, এমনকি এখনো মূর্তি পূজা চলছে। তাহলে এদেরকে আল্লাহ কেন ধ্বংস করছেন না?"

আদিলের মুখ থেকে এই প্রশ্ন শোনার পর আব্দুল দরবেশের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো। তার শরীরে এক প্রকার কম্পনের সৃষ্টি হলো। তিনি আকাশের দিকে দুহাত জোর করে বললেন,

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার দুই পুত্রকেই আপনি প্রজ্ঞাবান করে এই ধরণীতে পাঠিয়েছেন।"

বাবার এহেন আচরণ দেখে আদিল চিন্তিত স্বরে বলে উঠলো, "বাবা, আমি কি কোন ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছি?"

"না বাবা, তুমি উত্তম প্রশ্ন করেছ। মন দিয়ে এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন।"

পরিবারের সবাই গভীর মনযোগে আব্দুল দরবেশের কথা শুনতে লাগলেন।

"আদিল, তুমি যদি কোন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা কর মূর্তি পূজা বলতে তারা কী বোঝে, তারা উত্তর দেবে, মাটির কোন পুতুল বা পৃথিবীতে যেকোন কিছুকে ঈশ্বর হিসাবে পূজা বা এবাদত করাকেই মূর্তি পূজা বলে। এই উত্তর সম্পূর্ণ সত্য তবে তা বাহ্যিকভাবে। তুমিও সেই বাহ্যিক উত্তরটি জানো বিধায় তোমার মনে এরূপ প্রশ্নের জাগরণ ঘটেছে। এটা খুবই যৌক্তিক জিজ্ঞাসা যে, পূর্বের অনেক জাতিকে মহান

আল্লাহ মূর্তিপূজার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাহলে ভারতবর্ষকে কেন করছেন না।"

"হ্যা বাবা, এটাই আমার প্রশ্ন সেই সাথে সংশয়ও বলতে পারেন।"

"আল্লাহ মূর্তি পূজার জন্য সরাসরি যে জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন তার প্রেক্ষাপটটা আমাদের আগে জানা প্রয়োজন। হযরত হুদ (আঃ) তার জাতি তথা আদ জাতিকে একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এবং সব ধরণের অন্যায় এবং পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন-

"এবং হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপর তার দিকে ফিরে আসো। তবেই তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর মূষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তিকে আরও শক্তি দিয়ে বৃদ্ধি করবেন। এবং অপরাধী হয়ে তোমরা তার থেকে বিমুখ হইও না।"

- সূরা হুদ (আয়াত-৫২)

কিন্তু আদ জাতি যখন হুদ (আঃ)-র আহবান প্রত্যাখ্যান করে তখন আল্লাহ এক খণ্ড কালো মেঘ পাঠান তাদের মাঝে। তারা মাথার উপর মেঘ দেখে ভেবেছিলেন এবার বুঝি বৃষ্টি হবে। ফলে সবাই মেঘ খণ্ডের নিচে একত্রিত হন। আর তখনই ওঠে তীব্র ঝড় সেই সাথে বিদ্যুতের ঝলকানি। এ অবস্থা চলে প্রায় আটদিন। ঝড়-তুফান এতোটাই তীব্র ছিলো যে আশেপাশের সবকিছু হওয়ায় ভাসতে লাগলো। ঝড়ের দাপটে গাছের ঝড়া পাতার মতোই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পুরো আদ জাতি। তাদের একজনও জীবিত ছিলো না; শুধুমাত্র হুদ (আঃ)- এবং তার কিছু সঙ্গী - সাথি ব্যতীত।"

আদিল বললেন, "বাবা, এটা তো আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।"

"হ্যা, জানি। আদিল, এই গল্প এবং আয়াতটাকে যদি তুমি খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ কর, তবে দেখতে পাবে এখানে শুধুমাত্র "মূর্তিপূজা"-র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তার রূপ কী সেটা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।"

"এর দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?"

আব্দুল দরবেশ পরিবারের সবার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,

"আমরা এখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করবো যা সম্পর্কে দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষই জানে না।"

সবাই একসাথে বলে উঠল- "বাবা, আপনি সে সম্পর্কে আমাদের জানান।"

বিবি হাজেরা খাতুনও তার স্বামীকে জ্ঞান আহরণের সময় বাবা বলেই সম্বোধন করে থাকেন। আব্দুল দরবেশ লম্বা করে শ্বাস নিয়ে ধীর গতিতে বলতে শুরু করলেন,

"তোমরা কি জানো এ দেহে কজনের বাস?"

পাশ থেকে মানসুরা বলে উঠল,

"এ আবার কঠিন কী! আমার দেহটা তো আমারই এখানে আবার অন্য কে বাস করবে! এই দেহে শুধুমাত্র আমার আত্মাটাই আছে।"

আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "শোন মন দিয়ে। আদিল যখন তুমি শেরেক নিয়ে প্রশ্ন করবে তখন তার সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসবে "তাওহীদ"-এর কথা। সকল নবি-ই আমাদের সর্বপ্রথম তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। এই বিষয়ে আমরা পরে আসছি। এর আগে একটি বিষয় মনের মধ্যে গেথে রাখো, এ দুনিয়াতে তুমি যা কিছু দেখছ সবকিছু দুটি অর্থ বহন করে।

১. মেজাজি

২. হাকিকি

মেজাজি অর্থ তোমার চোখ যেটা দেখছে তা গ্রহণ করা। আরো একটু সোজা ভাষায় বলতে গেলে কোন কিছুর বাহ্যিক রূপ। পৃথিবীর এই রূপটা সব সময় সংশয়ে ভরপুর। দেখবে যেটাকে তুমি ঠিক ভাবছো, ঠিক সেটাকেই অন্যজন ভুল ভাবছে। এক শব্দে এ রূপটাকে আপেক্ষিক বলা যেতে পারে। যেমন তুমি "মূর্তি"

শব্দের মেজাজি রূপ এবং সংজ্ঞা জেনে সংশয়ে পরে গেছ। প্রকৃতির আরেকটি রূপ হলো "হাকিকি" যা অন্তর্নিহিত। যা খালি চোখে দেখা যায় না। যা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নয়। এই জগতে কোন সংশয় নেই। নেই কোন বিতর্ক। এ জগতে সবকিছু সুন্দর, ধ্রুব এবং সত্য। এটাকেই বলে এলমে লাদুনির জগত।"

আদিল বলে উঠলেন, "বাবা আমি সেই জগতে যেতে চাই।"

আব্দুল দরবেশ উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, "ধীরে বালক ধীরে। সে জগতের প্রথম শর্তই হচ্ছে ধৈর্য্য। যাই হোক মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। আমাদের শরীরে তিনজনের বাস।"

বিবি হাজেরা অবাক হয়ে বললেন, "তিনজন!"

"হ্যা, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটাই সত্য। পবিত্র কুরআনেই এই ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।"

পাশ থেকে মানসুরা মাথা চুলকাতে - চুলকাতে বলল, "বাবা, আমি কুরআন শরীফ অনেকবার অর্থসহ পড়েছি। কিন্তু আমি তো এরকম কিছুই পেলাম না।"

"তুমি কিছু পাওনি কারণ তোমার চোখে শুধু কুরআনের বাহ্যিক রূপটাই ধরা দিয়েছে। তোমার হাকিকি-র জগত দেখার চোখ এখনো বন্ধ।"

আদিল মানসুরার উপর কিছুটা বিরক্ত হলো। সে বলল, "আপা, একটু চুপ থাক না। বাবা কে বলতে দে!"

আব্দুল দরবেশ আবার বলতে শুরু করলেন, "শোন প্রথমেই আমাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতের উপর। তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে এক দেহে তিনের বাস কিভাবে।

"হে রাসূল! যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন- অবশ্যই আমি মাট থেকে মানুষ সৃষ্টি করলাম; অতঃপর আমি যখন তাকে ঠিকঠাক বা ভারসম্যের অধিকারী করবো এবং তার মধ্যে আমার রুহ থেকে ফুকে দেবো। এরপর তোমরা

তার উদ্দেশ্যে সিজদাহ্ অবনত হও। অতঃপর ফেরেশতারা সকলে সেজদাহ করল।" (সূরা ছোয়াদ - ৭১-৭৩)

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মহান আল্লাহ তা'আলা তার নিজ রূহ থেকে ফুৎকার দিয়ে আদমের দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। তার মানে মানুষের দেহের মধ্যে থাকা প্রথম জনকে খুঁজে পাওয়া গেলো। এই আয়াতের সাথে কিছু সম্পৃক্ত প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। যেমন:

১. রূহ কী?

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদাহ দেয়া শিরক। তবে এখানে তিনি এই আদেশ কেন দিলেন?

৩. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-র মধ্যে রূহ ফুৎকার দেওয়ার পরই কেন সকল ফেরেশতাদের সেজদাহ করার নির্দেশ দিলেন?"

ইরি হঠাৎ আব্দুল দরবেশ কে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমরা কখন পাবো? আজকের আলোচনাতেই কি পাবো?"

"আহা ইরি! এতো অস্থির হওয়ার কিছু নেই আজই সবকিছুর উত্তর পাবেন, ইন শা আল্লাহ।"

আদিল বলল, "বাবা, আপনি আলোচনা সামনে এগিয়ে নিন।"

"হ্যাঁ, তো যা বলছিলাম, তাহলে দেহের মাঝে একজনের খোঁজ পাওয়া গেলো। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

"আল্লাহ নফস সমূহকে অধিগ্রহণ করেন তার মৃত্যুর সময়।"

(সূরা আয-যুমার ৪২)

"সকল নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"

এই নফস হচ্ছে দেহের আরেক বাসিন্দা। এখানেও আমরা একটা প্রশ্ন রেখে যেতে পারি-

কেন আল্লাহ বলেন নি "রুহ" মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এর ভেদ কী?

তৃতীয় জন হচ্ছে শয়তান। আমরা জানি শয়তান আমাদের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। এ সম্পর্কে সূরা নাসে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।"

সন্দিল, "তাহলে আমরা কি একা, নাকি তিনজনের সম্মিলিত একের রূপ?"

"মানুষ হচ্ছে তিনের সম্মিলিত এক রূপ। মানুষের ভেতরে থাকা নফস এবং শয়তান একে অপরের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। শয়তান কোন সময় "রুহ"-র সাথে মিশতে পারে না। কারণ, "রুহ" স্বয়ং আল্লাহর আদেশ-

"আর (হে রাসূল) তারা আপনার নিকট "রুহ" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলুনঃ রুহ হচ্ছে তোমার রবের আদেশ বা কাজ, আর তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" (বণী ঈসরায়েল - ৮৫)

রাজিয়া দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন- "বাবা, তাহলে কি আমরা সবাই আল্লাহ বা ঈশ্বর নাকি?"

"অবশ্যই না। মনে কর একটি বড় আগুনের কুন্ডলী রয়েছে। সেখান থেকে যদি তুমি হাজার হাজার মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করো তবে কি সেই মোমবাতির আগুনের তাপ বা পরিব্যাপ্তি কুন্ডলির থেকে বেশি হবে?"

"না, বাবা।"

"ঠিক তেমনি আল্লাহ তাঁর রুহ থেকে ফুৎকার দিয়েছেন এবং আদমের দেহে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে পরমকে সেই আগুনের কুন্ডলী হিসাবে কল্পনা কর এবং আদম হলো সেই মোমবাতি। শুরুর দিকে একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, কেন আল্লাহ আদমকে সেজদাহ দেয়ার হুকুম দিলেন? আল্লাহ আদমের দেহে রুহ ফুৎকারের আগ পর্যন্ত কাওকেই তাকে সেজদাহ করার হুকুম দেননি। তখন হুকুম

দিলে হয়তো সেটা শিরক হয়ে যেতো। তাই তিনি প্রথমে আদমের দেহ খাঁচায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এরপর সেজদাহ-র হুকুম দিয়েছেন। মূল কথা হলো- "মানুষ আল্লাহ নয়; আবার তার থেকেও জুদাও নয়।"

" Limited freewill has been given by the Lord."

আদিল, "বাবা, তাহলে এই আলোচনার সাথে মূর্তি পূজার সংযোগ কোথায়?"

"বলছি, এই দেহ খাঁচায় তিনের বাস। প্রথমজন রুহ, ২য় জন নফস এবং ৩য় জন ইবলিশ। ইবলিশ নফসকে অপবিত্র করতে পারলেও রুহের কাছে যেতে পারে না। এখন আমাদের জানতে হবে নফস কী? তা কিভাবে গঠিত হয়? নফস কী এই প্রশ্নের উত্তর যদি সহজভাবে দিতে চাই, তবে বলা যেতে পারে এটা আমাদের দেহের চাহিদা। এই চাহিদা গঠিত হয় ছয়টি জিনিস দ্বারা-

১. অহংকার

২. হিংসা

৩. ক্রোধ

৪. কাম

৫. লোভ

৬. মোহ

শয়তানের কাজ আমাদের দেহে এই ৬ টি জিনিসকে সক্রিয় রাখা। যাতে আমরা নিজেদের শুদ্ধ করে রুহের জগতে পৌছাতে না পারি। এবার আদিল এই ছয়টা জিনিসকে তুমি ছয়টা মূর্তি হিসাবে কল্পনা করো।"

আদিল বলে উঠলো, "আমরা তো জীবনভর এই ছয়টি মূর্তির পেছনেই দৌড়াই।"

আব্দুল দরবেশ আবারো হেসে উঠে বললেন- "আদিল তুমি অল্প বয়সেই বেশ পেঁকে গিয়েছ।"

তার এহেন রসিকতায় সবাই হেসে উঠল। রাজিয়া এবং মানসুরা বললেন- "বাবা, আমাদেরও কিন্তু আদিলের কথাই সত্য মনে হচ্ছে।"

"হ্যা, সত্য। অধিকাংশ মানুষ এই ছয় মূর্তির পূজা করেই জীবন পার করে দেয়। আল্লাহ এটাই দেখতে চেয়েছেন যে, আমরা এই ছয় মূর্তির পূজা করি নাকি আমাদের অন্তরালে থাকা পরম আত্মার এবাদত করি। হুদ (আঃ) তার কওম কে এই ছয় মূর্তির পূজা থেকে ফিরিয়ে তৌহিদের পথে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। ফলে আদ জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিটা সভ্যতা ধ্বংসই হয়েছে এই ছয় মূর্তির কারণে। অতিরিক্ত লোভ, অহংকার, উগ্র যৌনতা, মোহ, ক্রোধ এবং হিংসাই তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের কারণ ছিলো। এবার বুঝতে পারলেন সবাই?"

সবাই একসাথে বলে উঠলেন, "জি, বাবা।"

"এই ছয় মূর্তিকে পরাজিত করেই আমাদের পৌছতে হবে তৌহিদের রাজ্যে। এ রাজ্য একত্ববাদের। এখানে দুই কিংবা অধিকের থাকার অনুমতি নেই। এরজন্যই আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন-

"তোমরা একা হও! আমি তোমাদের ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিবো!"

আমার ভাবি, আমরা সবাই একা। আসলেই কি তাই? একা হলে তো তিনি জবাবই দিতেন। এই একা বলতে ঐ ছয় মূর্তি বিতরণের আদেশ দিচ্ছেন আল্লাহ। তাদের পরিত্যাগ করে আমার কাছে আসো। আমি তোমাকে গ্রহণ করবো। তৌহিদের রাজ্যে দুইজনের স্থান নেই। তৌহিদের রাজ্যে হয় আল্লাহ থাকবেন, নাহয় "আমিত্ব" থাকবে।

এই আমিত্বই হলো সেই ছয় মূর্তি। বাহিরের মূর্তিকে ভাঙার থেকে বেশি জরুরি ভেতরের মূর্তিকে ভাঙা। ইসলামের শিক্ষা দুটি-

১. মেজাজি, এবং

২. হাকিকি

মুহাম্মদ (সাঃ) কাবা ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ৩৬০ টি মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন। এই ঘটনাটি মেজাজি যা আমরা চর্ম চক্ষু দিয়ে আবলোকন করেছি। এই শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের হাকিকি-র শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এবার দেহটাকে আল্লাহর ঘর কাবা হিসাবে কল্পনা কর। সেখানে বসবাসরত সেই অদৃশ্য কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী মূর্তিগুলোকে নবী (সাঃ)-র ঐ ৩৬০ টি মূর্তি ভাঙার ন্যায়ে চুরমার করে দাও। কেবল তখনই দিল-কাবা শুদ্ধ হয়ে যাবে। তুমি চলে যাবে তৌহিদের রাজ্যে। তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হবে দেহের অভ্যন্তরে। এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত শেরেকের অবসান ঘটবে।"

আদিল বলল, "কিন্তু বাবা আমরা কিভাবে টের পাবো, যে আমরা তৌহিদের রাজ্যে পৌছে গেছি?"

"ইমামুল আউলিয়া হযরত বায়োজিদ বোস্তামি বলেছিলেন-

"আল্লাহ আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট"

প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক তাঁকে বলেন-

"তুমি যদি সত্যই সন্তুষ্ট হতে, তাহলে আমি অন্য কথা শুনতে পেতাম।"

এ কথা শোনার পর ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়জিদ বোস্তামি পুনরায় কঠিন সাধনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। এবং একপর্যায়ে তিনি উচ্চারণ করলেন-

"আনা সুবহানি, মা আজামুশ শানি"

অর্থাৎ, আমিই সোবহানি, সব শান আমারই।

মনসূর হল্লাজ লা-মোকামে অবস্থান করে এ কথাই বলে ছিলেন-

"আনাল হক" অর্থাৎ আমি-ই সত্য।

পুত্র আদিল বললেন- "বাবা, এ তো শেরেক।"

"ভুল বুঝছো। তারা নিজেদের আল্লাহ দাবি করেননি। তুমি তোমার দেহের ছয় মূর্তিকে তাড়িয়ে দিলে অবশিষ্ট থাকবে শুধু একজন আর সে হলো "রুহ"। আর রুহ তো স্বয়ং আল্লাহর আদেশ। সেই আদেশই তার মহত্ত্ব প্রকাশ করছে। তৌহিদের রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছো সেটা তখনই বুঝতে পারবে যখন তুমি শুধু আল্লাহকেই দেখতে পাবে। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

"আইনামা তুয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ।"

অর্থাৎ, "যেদিকেই তাকাও না কেন একমাত্র আল্লাহকেই দেখতে পাবে।"

আব্দুল দরবেশ এখানেই তার আলোচনার ইতি টানলেন। সবাই হুজরাখানা ত্যাগ করে নিজ নিজ শোবার ঘরে চলে গেল। শুধুমাত্র বিবি হাজেরা ব্যতীত। বেশিরভাগ সময় তিনি এই হুজরাখানায় আব্দুল দরবেশের সাথেই রাত কাটান। শুধুমাত্র যে দিনগুলোতে আব্দুল দরবেশ তাকে থাকতে নিষেধ করেন সেদিন গুলো ব্যতীত। বিবি হাজেরা রাতে খুব অল্প সময়ের জন্য ঘুমান। রাতের বেশিরভাগ সময়ই তিনি ধ্যান এবং আব্দুল দরবেশের সেবা করে কাটিয়ে দেন।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি,

ময়মনসিংহ শাখা, পাটগুদাম

সন্ধ্যা ৭.০৩ মিনিট।

প্রায় পাঁচদিন পর আজ জলিলুদ্দীন পার্টি অফিসে এসেছেন। পার্টি অফিসের চিত্রটা আজ কিছুটা ভিন্ন। অফিসে আজ কোন হাসি ঠাট্টা কিংবা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা নেই। জলিল অফিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তার সামনে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত সকল অঙ্গ সংগঠনের উর্ধ্বতন নেতারা উপস্থিত। জলিলুদ্দীন পরিস্থিতির কিছুই বুঝতে পারছেন না। পার্টি নতুন কোন বিপ্লবের পথে হাঁটছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি সন্দিহান। সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসয়ে কোনো একটা আলাপ করে যাচ্ছেন। জলিলুদ্দীনও যে পার্টির একজন কর্মী সে ব্যাপারে কারও কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। হঠাৎ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি আশরাফ আলী নিজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সবাইকে ধমকের সুরে কথা বন্ধ রাখার আদেশ দিলেন। এরপর জলিলুদ্দীনের হাতে একটি লাল খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন,

"আমরা সকল স্থানীয় নেতা কর্মীদের পূর্ণ সম্মতিতে আপনাকে দল থেকে আজীবন বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হলো।"

জলিলুদ্দীনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তার সারা শরীরের রক্ত যেন বরফে পরিণত হয়েছে। সবকিছু তার কাছে অবাস্তব মনে হতে লাগলো। তিনি একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই রাজপথ, অগ্নিঝড়া

স্লোগান, লাল পতাকা, পুলিশের মার, জেল-যুলুম, হাজারো তর্ক বিতর্ক। সেই মস্ক'র প্রগতি প্রকাশন থেকে আসা বইয়ের দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকা। এ সবকিছুই কি তবে এখন অতীত!

জলিলুদ্দীন নীরবতা ভেঙে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "জর্জ অরওয়েলের লিখিত "Animal Farm", যা ছিলো রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক স্যাটায়ার। আগে ভাবতাম সেটা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এক প্রকার প্রোপাগাণ্ডা। কিন্তু আমার সে ভুল আজ ভেঙে গেলো। ওটা প্রোপাগাণ্ডা নয় বরং ওটা ছিলো ধ্রুব সত্য। কমরেডস আজ তার বইয়ের একটি লাইনের কথা বড্ড মনে পরছে। আপনাদের কি মনে আছে, বক্সারের দেয়া সেই উক্তি- "I will work harder and Napoleon is always right."

তরুণ নেতা নুরু রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনি এখন আমাদের শ্রেণী শত্রুতে রুপান্তরিত হয়েছেন।"

জলিলুদ্দীন তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "এই চিত্রের উল্লেখও জর্জ অরওয়েল তার বইতে করেছিলেন। ট্রটস্কিকে জীবিত ধরার আহ্বানের মধ্য দিয়ে- " Comrades, here and now I pronounce the death sentence upon Snowball, "Animal Hero, Second Class," and half a bushel of applies to any animal who brings him to justice. a full bushel to anyone who captures him alive."

আর শেষ যে লাইনটি'র কথা মনে পরছে সেটা হলো-

"All animals are equal but some animals are more equal than others."

ভালো থাকবেন কমরেডস। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।"

এ কথা বলে জলিলুদ্দীন পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন বহিষ্কারের কথা শুনে প্রথমে তার যে পরিমাণ কষ্ট লাগছিল এখন আর ততটা লাগছে না। তিনি এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করছেন। হাটতে হাঁটতে

জলিলুদ্দীন অনুধাবন করলেন- "সত্য প্রথম পর্যায়ে স্বীকার করতে কষ্ট হলেও, পরবর্তীতে সেটাই চূড়ান্ত শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

জলিল আজ যে সুখ অনুভব করছেন তা হলো মুক্তির সুখ। এই মুক্তি মানসিক মুক্তি। তিনি বাসার দরজায় পৌঁছাতেই তার স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন। মৃদু হাসলেন জলিলুদ্দীন। তিনি আজ আর হুজরাখানায় প্রবেশ করলেন না। নিজ কক্ষে প্রবেশ করে খাওয়া দাওয়া সারলেন তিনি। পার্টি অফিস থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে তিনি তার স্ত্রীকে কিছু জানালেন না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি। তার মনে হলো বহু বছর পর তিনি এত প্রশান্তির ঘুম দিলেন।

পরের দিন.....

আব্দুল দরবেশের বাড়ি...

জলিল হুজরাখানার ভেতর প্রবেশ করতেই দেখতে পেলেন বাবা তার আসনে বসে আছেন। সামনে কিছু খেজুর এবং একটি নতুন পাঞ্জাবি রাখা। জলিলের খুবই অবাক হলেন। এ সময়ে তিনি যতবারই হুজরাখানায় এসেছেন, বাবাকে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় পেয়েছেন। তবে আজকের চিত্রটা পুরোপুরি ভিন্ন। জলিল আব্দুল দরবেশের সাথে মুসাফা শেষ করে আসন গ্রহন করলেন।

"বাবা, অনুমতি দিলে একটি প্রশ্ন করতাম।"

"আমি জানি তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে। এতো আয়োজন কিসের, তাই তো?"

জলিলুদ্দীন কোন উত্তর দিলেন না। তার মনের এ প্রশ্নটাই খেলা করছিল।

আব্দুল দরবেশ বললেন, "তোমার নতুন জন্ম হয়েছে জলিল। আজ তুমি অন্ধকারের রাজ্য থেকে আলোর রাজ্যে পদার্পণ করেছ। পার্টি ছেড়ে তুমি উত্তম কাজ করেছ। বস্তুজগৎ তোমার জন্য নয়। পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছো। ভাবতে পারো, যেখানে মানুষ ২০ ডেসিবলের নিচে এবং ২০,০০০ ডেসিবলের উপরে কোন শব্দ তার কান দ্বারা শুনতে পায় না, সেখানে বস্তুবাদীরা সমাধানে চলে এসেছে যে- ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলতে কিছু নেই। এই সমাধানে কিন্তু খোদ কার্ল মার্কসও পৌঁছাতে পারেননি।"

জলিলুদ্দীন বললেন, "বাবা। ওরা আমাকে বহিষ্কারের নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে গতকাল। আমি এখন ওদের শ্রেণী শত্রু। আমি ওদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জবাবদিহি চাই নি। আমার উপলব্ধি হয়েছে এই এক চোখ কানা ব্যাক্তিদের সাথে থাকার অর্থ নিজের জীবনের কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করা।"

"উত্তম! অতি উত্তম উপলব্ধি তোমার জলিল। তুমি আজ থেকে সামনের একশ বিশ দিন গভীর সাধনায় মগ্ন থাকবে। যেসব জিনিস থেকে এ চার মাস তুমি বিরত থাকবে তা হলো-

১. বই পড়া

২. আমিষ আহার

৩.অতিরিক্ত ঘুম

৪.লেখা লেখি

৫. যৌন মিলন

শোন জলিল, এই চার মাসের ধ্যান সাধনা করে যে তুমি সত্যের আগুন অবলোকন করতে পারবে তা নয়। কিন্তু তুমি ধোঁয়া দেখতে পারবে। আর একবার ধোঁয়া দেখতে পারলেই আগুনের উপর আর তোমার কোনো সংশয় থাকবে না। "আইনুল একিন"-র উপর মানব মগজের বড় উপলব্ধি আর কিছুতে নেই। এই চার মাস তুমি অনেক কিছু দেখতে পাবে। যেগুলো তোমাকে মূল উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে প্রলোভন দেখাবে। তুমি এতে বিচলিত হবে না। শক্তভাবে সবকিছুর মোকাবেলা করবে। সর্বোপরি আমি তোমার সাথে আছি।"

জলিলুদ্দীন বিনয়ী কণ্ঠে বললেন, "আপনিই ভরসা বাবা। এ তরী আমি কখনোই একা বাইতে পারবো না।"

"না জলিল! আমি ভরসা নই। আমি একটি নির্দিষ্ট সময় অব্দি তোমার সাথে থাকতে পারবো। এরপর বাকি যাত্রা তোমাকে একাই সম্পন্ন করতে হবে। কারণ, তৌহিদের রাজ্যে দুইয়ের অবস্থান নেই। যাই হোক আজ আর কথা না।"

আব্দুল দরবেশ খেজুরের বাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে একশ বিশটি খেজুর আছে। প্রতিদিন এশার নামাজের পড়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটি করে খেজুর গ্রহণ করবে। এরপর সাধনায় বসবে। এই প্রক্রিয়া একশ বিশ দিন তথা দীর্ঘ

চার মাস ব্যাপি চালিয়ে যাবে। ধ্যান করার সময় অবশ্যই আমার দেয়া পোশাক পরিধান করবে। এর মাঝে একটা রাত তোমার আমার সাথে অতিবাহিত করতে হবে।"

এরপর তিনি খেজুরের বাটি এবং নতুন পোশাকটি জলিলুদ্দীনের হাতে তুলে দিলেন।

"তোমার যাত্রা শুভ হোক। এখন থেকে তোমার-আমার সাক্ষাৎ প্রতিনিয়ত রুহানি জগতে হবে। অবশ্যই তা একটা নির্দিষ্ট সময় অব্দি।"

জলিলুদ্দীন সন্তুষ্ট চিত্তে আব্দুল দরবেশের দেয়া ছবক এবং উপহার সামগ্রী নিয়ে হুজরাখানা ত্যাগ করলেন।

খুব দ্রুতই আব্দুল দরবেশের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর কারণ ছিলো কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি আশরাফ আলী এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নুরুর। তারা তাদের এহেন পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নিষ্ফল ক্রোধে তারা আব্দুল দরবেশকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নেতিবাচক আলোচনা করে বেড়াতে লাগলেন। মানুষের সামনে আব্দুল দরবেশকে ভণ্ড প্রমাণ করাটা তাদের নিত্য দিনের কাজ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এর ফলাফল তাদের পক্ষে না গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। তাদের বলা গল্প শুনে আগ্রহী হয়ে অনেকেই আব্দুল দরবেশের কাছে যেতে লাগলেন। তর্ক করতে যারাই তার কাছে যেতেন তারাই তার মুরিদ হয়ে ফিরে আসতেন। আব্দুল দরবেশ সম্পর্কে জেলার বুদ্ধিজীবীরা অন্যদের সতর্ক করে বলতেন-

"তোমাদের নাস্তিক্যবাদ আব্দুল দরবেশের সামনে টিকবে না; কারণ তিনি সম্মোহন জানেন।"

১৯৯১ সালের শুরুর দিকে ময়মনসিংহ এলাকার ধর্মীয় সম্প্রতিতে ভাঙন ধরতে শুরু করে। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী-ওহাবি ঝামেলা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। সহীহ হাদিস নামের এই ফেরকা খুব বেশি দিন হয়নি ময়মনসিংহে ঢুকেছে। বছরের শুরুর দিকেই তাদের আনাগোনা প্রথম চোখে পরে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের বিস্তৃত পুরো ময়মনসিংহ জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পরে।

এদের দলে যোগ দেয়া অধিকাংশই ছিল পাড়ার উঠতি যুবক। প্রথম পর্যায়ে সুন্নীরা এদের পাত্তা না দিলেও এক পর্যায়ে "সহীহ হাদিস" দলটি রীতি মতো তাদের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দলের অন্তর্ভুক্তরা এলাকায় প্রায়ই গ্যাঞ্জাম করা শুরু করেছিলো। নামাজ চলাকালীন সময় ইমামের পেছনে লাগা তাদের নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়েছিলো। জেনে কিংবা না জেনে যেকোনো

কিছুকে "বেদাত" এবং "হারাম" আখ্যা দেয়া তাদের কাছে মামুলি বিষয় হয়ে উঠেছিলো।

আব্দুল দরবেশের মুরিদ সংখ্যা তখন প্রায় ৫০০০ এর অধিক। তার বাড়িতেই নিয়মিত তালিম চলে। সবকিছুই শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছিলো কিন্তু তার এই "সূফি চর্চা" এলাকার সহীহ হাদিছ যুব সংঘের কাছে রীতিমতো মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মত অনুযায়ী "পীর-মুরিদের" কনসেপ্টই ভ্রান্ত। আব্দুল দরবেশ খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ । ফলে তার মুরিদরা তাকে সহীহ হাদিছ যুব সংঘের বিরোধিতার কথা জানালেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। প্রতিবারই শুধু মুচকি হেসে এড়িয়ে গেছেন।

কাশর জামে মসজিদ, ময়মনসিংহ পৌরসভা।

আব্দুল দরবেশ পা চালিয়ে হাটছেন। যেন আজকের জামাতটা ছুটে না যায়। আজ বের হতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। আজ তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দুপুরের রোদে দ্রুত হাঁটার কারণে তার সাদা ফতুয়াটি ঘামে ভিজে জবজব করছে। মসজিদে ঢুকেই তিনি বুঝতে পারলেন জামাত মাত্রই শুরু হয়েছে। ইমাম মোটে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করেছেন। তিনি আর দেরি না করে তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে পরলেন। মসজিদে আব্দুল দরবেশের সালাতের সাথে অন্যান্য মুসল্লীদের সালাতের পার্থক্য বেশ লক্ষ্যনীয়। তিনি নামাজে দাড়ালে তাকে দেখে মনে হয় যেন কোনো পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের কোন বিষয়ই যেন তার মাথায় থাকে না। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে সালাত আদায় করেন। প্রতিদিন এশার নামাজ শেষ করে বেশ কিছু সময় মসজিদেই জিকির করে কাটিয়ে দেন। আব্দুল দরবেশ নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে ইমামের সাথে মোনাজাত ধরতে যাবেন, এমন সময় মসজিদে চরম হট্টগোল শুরু হলো। একজন আঠারো-উনিশ বছরের যুবক মাঝখানের কাতার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন-

"ইমামের নামাজ আদায় হয়নি। এ নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। উনি মূর্খ, নামাজ সঠিকভাবে পড়াতে পারেন না।"

যুবকটির নাম আসাদ। অল্প কিছু দিন হয়েছে সে সহীহ হাদিছ যুব সংঘের সদস্য হয়েছে। আগে সে বেশ শান্ত স্বভাবের ছিল কিন্তু এখন তার মধ্যে উগ্রতার বৃদ্ধি ঘটেছে। আব্দুল দরবেশ প্রথমে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি দেখে তিনি আর নিজেকে সংবরন করে রাখতে পারলেন না। ইতোমধ্যে মসজিদের অতি উৎসাহী সুন্নি জনতা ছেলেটাকে সঠিকভাবে না বুঝিয়ে তাকে শারীরিক ভাবে আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু যুবক আসাদ মার

খাওয়ার পরও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসছিলেন না। আব্দুল দরবেশ ভাবলেন এটাই তো স্বাভাবিক। জোড় করে আর যাই হোক আইডিওলজি গেলানো যায় না। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এলাকার সকলেই অব্দুল দরবেশকে বেশ শ্রদ্ধা করে। সকলেই আব্দুল দরবেশকে উঠে দাঁড়াতে দেখে চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু আসাদের রাগ কিছুতেই কমছিল না। আব্দুল দরবেশ আসাদকে বললেন,

"বাবা, তুমি শান্ত ভাবে বসো। তোমার তো এই হাদিছ জানার কথা যে, মুহাম্মদ সাঃ বলেছেন- ঝগড়ার সময় রাগান্বিত ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে থাকে তবে তাকে বসিয়ে দাও।"

আসাদ কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে পড়লেন। এখনো রাগে ফুসছেন তিনি। আব্দুল দরবেশ বাকি মুসল্লিদের কেও বসার পরামর্শ দিলেন। এরপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

"হে! আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা শান্ত হন। একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন আপনার কী করছেন! আল্লাহ্ কি আমাদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো থাকতে নির্দেশ দেন নি?"

যুবক আসাদ উদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠল, "হ্যা, নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে পথভ্রষ্টদের পথ পরিত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন।"

আব্দুল দরবেশ নিজের হাত আসাদের মাথার উপর রাখলেন। এরপর বললেন,

"বাবা, শান্ত হও। নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র সিরাতে কি পড়নি, মক্কার কাফেররা তাঁকে শত অত্যাচারের পরেও তিনি তাদের হেদায়েতের পথে আনার জন্য দোয়া করেছিলেন।"

আসাদ চুপ করে রইলো। তার শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল। আব্দুল দরবেশ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা কি জানেন না সালাতের অর্থ কী?"

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

আব্দুল দরবেশ বললেন, "যদি সঠিকভাবে জেনে থাকতেন তবে হয়তো আজ আমাকে এই মসজিদের ভিতর ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি দেখতে হতো না। আপনাদের প্রথমে খুবই সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হবে সালাত কী। কুরআনে বলা হয়েছে - "সলাত সকল অশ্লীল কাজ থেকে আমাদের মুক্ত রাখে" কিন্তু, আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ নামাজি অবিরাম পাপ করে চলেছে দেশের প্রতিটা অলি-গলিতে চোর বাটপার। তাহলে কি আমরা ধরে নিবো সালাত ব্যর্থ বা পবিত্র কুরআনে আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা? অবশ্যই না! কারণ, সেটার কোন সুযোগই নেই। ব্যর্থ আপনারা! ব্যর্থ আপনাদের বুঝ। মসজিদে আসেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং আসেন জান্নাতের লোভ আর জাহান্নামের ভয়ে। আজ যদি আল্লাহ বলেন- "জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছুই নেই", আপনাদের মত ভণ্ড ধার্মিকদের আর মসজিদে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজেদের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করুন। এটা আল্লাহর ঘর; আপনাদের প্রবৃত্তি মেটাবার জায়গা নয়।"

এক মুহূর্ত থেমে আব্দুল দরবেশ উপস্থিত এক মুসল্লিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, "সালাত কার উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়? সালাতে আমরা কার ধ্যান করি?"

সবাই একযোগে বলে উঠলেন, "আল্লাহর!"

"তাহলে এই এবাদতের সময় অন্য কিছুর কথা মাথায় আসে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন! এখানে ক'জন আছেন যারা সালাতে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যান করেছেন?"

মসজিদে উপস্থিত সকল মুসল্লি নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। কেউই জোর গলায় দাবি করতে পারলেন না যে তিনি নামাজে শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যানই করেছেন।

"আমি জানি কেউ নেই! যদি থাকতো তবে এই কলহ দেখতে হতো না। এই যুবক সালাতে দাঁড়িয়েছে ইমামের ভুল ধরতে! তার ধ্যান ছিলো ভুল ধরা! তাহলে তার নামাজে "আল্লাহ" কোথায়? আপনাদের মধ্যে অনেকে নামাজে দাঁড়িয়ে বাজার,

বউ কিংবা জাগতিক নানা বিষয় নিয়ে চিন্তায় মেতে থাকেন। তাহলে এবার আপনারাই বলুন এই সালাত বাজার, বউ কিংবা টাকার জন্য নাকি মনের সন্তুষ্টির জন্য! কখনো কি নিজেদের কিছু প্রশ্ন করেছেন-

১. কুরআনে মোট ৮২ টি আয়াত রয়েছে শুধুমাত্র সালাত সম্পর্কে। এই ৮২টি আয়াতে যেসব সালাতের বর্ণনা পাওয়া যায় তা একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণ কী? কী সেই নিগুঢ় ভেদ?

২. সালাত কি শুধু মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতরাই আদায় করেছেন নাকি পূর্ববর্তী সকল নবী এবং তাঁদের উম্মতরাও তা আদায় করেছেন? আর যদি আদায় করেই থাকে তবে তার রূপ কী? পূর্ববর্তী নবীদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত রয়েছে কুরআনে। সূরা বাকরাহ এবং আল ইমরানে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা আছে।

৩. নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় অবস্থানের সময় ওয়াক্তিয়া সালাতের প্রচলন ছিলো না। এদিকে আশ্চর্যের বিষয় কুরআনের ১১৪ টা সূরার মধ্যে ৮৬ টি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর মক্কায় নাজেল হওয়া অধিকাংশ সূরাতেই সালাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাহলে উক্ত সূরাগুলোতে কোন সালাতের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? কারণ, তখন তো কোন সালাতই ছিলো না।

আমরা কুরআন থেকে প্রমাণ পাই পূর্ববর্তী নবীদের সময়ও সালাত ছিলো। আবার আমরা এও জানি তাদের উম্মতদের মধ্যে এরূপ ৫ ওয়াক্ত সালাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতির প্রচলন ছিলো না। এদিকে কুরআন আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে- "অতীতের সব নবীদের ক্ষেত্রেও ছিলো একই বিধান। তুমি কখনো আমার বিধান পরিবর্তন করতে পারবে না।" (১৭ঃ৭৭)

তাহলে এখানে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ্ কি সালাত বলতে আমরা যা জানি তা থেকে ভিন্ন কিছু বুঝিয়েছেন? এসব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন কখনো?

সালাত দুই প্রকার-

১. দায়েমি সালাত

২. ওয়াক্তিয়া সালাত

দায়েমি সালাত হচ্ছে সেই সালাত যা প্রতিটি যুগেই ছিলো। কিন্তু ওয়াক্তিয়া সালাত শুধুমাত্র নবী (সাঃ)-র উম্মতরাই পেয়েছেন। কারণ, তিনি আমাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ করার চেষ্টা করেছেন। যাতে আমরা ওয়াক্তিয়া সালাত অনুশীলন করার মাধ্যমে দায়েমি সালাতের কাছে পৌঁছাতে পারি। দায়েমি সালাত হচ্ছে সার্বক্ষণিক সালাত। আল্লাহ্ বলেন- "আমি জ্বীন এবং মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার এবাদতের জন্য।"

তাহলে আপনারাই বলুন সবচেয়ে উত্তম এবাদত কী?

মুসল্লিদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, "সালাত।"

মুচকি হেসে আব্দুল দরবেশ বললেন, "এবার আপনারাই বলুন এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দিয়ে কি সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র এবাদত করা সম্ভব? আল্লাহ্ কোথাও বলেননি যে সালাত পড়তে হবে। তিনি বলেছেন "আকিমুস সালাত" অর্থাৎ সালাত প্রতিষ্ঠিত, আদায় কিংবা কায়েম করো। এখানে খুব ভাল ভাবে বুঝতে হবে যে, পড়া আর আদায় করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মনে করুন- আপনি কোন বই থেকে "আগুন" নামক শব্দটি পড়লেন। অতঃপর, তা মুখস্ত করে ফেললেন। কিন্তু এই মুখস্ত শব্দটি কি আপনাকে কোন দিন প্রকৃত আগুনের স্বাদ দিতে পারবে? তাই, সালাত আসলে পড়ার বিষয় নয় এটি আদায় বা প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়। আর আপনারা গন্ডগোল করছেন জোরে আমিন বলা নিয়ে, হাত বুকে বাধতে হবে নাকি নাভিতে, রফল ইয়াদিন করতে হবে নাকি করতে হবে না! আমি জানতে চাই এ বিষয়গুলো কি ফরজ নাকি মুস্তাহাব? আপনারা কি বুঝতে পারছেন না শয়তান আপনাদের কে ধোঁকা দিচ্ছে! সালাতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ধ্যান, তা থেকে আপনাদের ভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত রাখছে?

হে! আমার ভাইয়েরা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। রোজ হাশরে আল্লাহ শুধু আমাদের কালবের দিকে দৃষ্টি রাখবেন৷ অন্য কিছুই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়!"

মসজিদে উপস্থিত সকল মুসল্লি আব্দুল দরবেশের কথার ভেদ সহজে বুঝতে পারলো। সবাই প্রচণ্ডভাবে অনুতপ্ত হলেন। মুসল্লিদের মধ্যে যারা যুবক আসাদকে আঘাত করেছিলেন তারা সবাই তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু এতকিছুর পরেও যুবক আসাদ নিজের অবস্থান থেকে নড়লেন না। তিনি বললেন,

"দলিলবিহীন কোন কাজই গ্রহণযোগ্য নয়!"

আব্দুল দরবেশ এবার তার মাথায় হাত রাখলেন। তার চোখে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। এরপর বললেন,

"বলতে পারবে আসাদ সালাতে দুটো সেজদাহ দেয়া হয় কেনো? যেখানে বুখারী শরীফের হাদিসে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সনদে মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেছেন- অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে লোক তা আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে গমন করবে৷ হাম্মাম (রহঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ)-র সূত্রে নবী (সাঃ) থেকে একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে- "তিনি বেজোড় এবং তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন।" (ই.ফ. ৬৫৬৬)

কদরের রাত খোঁজার জন্য রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে বেজোড় রাত খোজার নির্দেশ দিয়েছেন নবী (সাঃ)। তাহলে তুমিই বলো সালাতে একটি, তিনটি কিংবা বেজোড় সংখ্যক সেজদাহ দেওয়ার নির্দেশ কি বেশি যৌক্তিক ছিল না? এই দুটো সেজদাহর কারণ কি সে ব্যাপারে তুমি সহীহ সিত্তাহর কোন হাদিস থেকে দলিল এনে দিতে পারবে?

শোন আসাদ-

"নামাজ পড়লে নামাজি ভাই,

নামাজের ভেদ জানলি না,

ওরে ভেদ না জেনে পড়লে নামাজ;

সেই নামাজ তোর হবে না।।

নামাজ পড়লে নামাজি ভাই,

নামাজের ভেদ জানলি না।"

আসাদের চোখ হঠাৎ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি নিজেকে আর সামলাতে না পেরে আব্দুল দরবেশ কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। অনুতপ্ত সূরে বললেন-

"বাবা, আমি ভুল করেছি! এখন আমি সেই ভেদ সম্পর্কে জানতে চাই।"

আব্দুল দরবেশ তার কপালে চুমু দিয়ে বললেন-

"এই বুঝ- জ্ঞান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আমি তো উপলক্ষ মাত্র।"

একথা বলেই আব্দুল দরবেশ মসজিদ ত্যাগ করলেন।

পর দিন...

সকাল ৬ টা ৩৩ মিনিট

আব্দুল দরবেশ হুজুরাখানা থেকে বের হয়ে বাড়ির সদর দরজার কাছে গেলেন। ভোরের সূর্যের আলো তার ভীষণ প্রিয়। বের হওয়ার উদ্দেশ্যে সদর দরজা খুলতেই চমকে উঠলেন তিনি। দরজার চৌকাঠের কাছে একটি বছর উনিশের ছেলে বসে আছে। আব্দুল দরবেশ ছেলেটিকে দেখতেই চিনতে পারলেন, আসাদ। তিনি লক্ষ্য করলেন ছেলেটির চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। তার বুঝতে বাকি রইলো না ছেলেটি সারারাত ঘুমায়নি। আব্দুল দরবেশ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "বাবা, তোমার এই অবস্থা কেনো? তুমি কখন থেকে এখানে বসে আছো?"

আসাদ অনুনয়ের সুরে বলে উঠলেন- "কাল রাত থেকে! আপনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আমিও নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেই। কিন্তু যতবারই আমি আমার বাড়ির পথ ধরে হেঁটেছি ততবারই আমার যাত্রা শেষ হয়েছে আপনার সদর কোঠায় এসে। প্রথমে ভেবেছিলাম মনের ভুল। কিন্তু, কিছু সময় পরই উপলব্ধি করলাম আমার গন্তব্য খোদা নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আপনি আমায় আপনার চরণে আশ্রয় দিন। আমি আমৃত্যু আপনার গোলাম হয়ে থাকতে চাই।"

আব্দুল দরবেশ বললেন, "আসাদ এসব বাক্য ব্যবহার করে আমাকে পাপের ভাগীদার করো না। গোলাম শুধু আল্লাহর হওয়া যায়। তিনি ভিন্ন আর কারো নয়। আমার চরণে নয় বরং মহান আল্লাহর নিকটে যাওয়ার চেষ্টা কর। তার হুকুম বিনে বান্দার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।"

আসাদ মারিয়া হয়ে বলে উঠলেন, "বাবা, দয়া করে আপনি আমায় দূরে ঠেলে দিবেন না।"

আব্দুল দরবেশ লক্ষ্য করলেন তার চোখে পানি। তিনি বললেন, "আহাঃ আচ্ছা ঠিক আছে এখন শান্ত হও। ভেতরে এসো।"

আব্দুল দরবেশ আসাদকে নিয়ে হুজুরাখানার ভেতরে প্রবেশ করলেন। আব্দুল দরবেশ তার নির্ধারিত আসনে বসলেন । আসাদ ঠিক তার সামনে বসল, "বলুন বাবা, আমাকে কি করতে হবে? আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করব।"

আব্দুল দরবেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এরপর চোখ খুলে আসাদের চোখে চোখ রাখলেন। আসাদ নিজের ভেতর এক ধরনের শীতলতা অনুভব করলেন। তিনি দেখতে পেলেন একদল ঘন কালো মেঘ তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে। তিনি ভীত হয়ে পরলেন। ঠিক কিছু সময় পরেই তিনি কালো মেঘগুলোর মাঝে এক আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন। আসাদ উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি আর এই বস্তুজগতে নেই।

আব্দুল দরবেশ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "কিছু বুঝলে, যুবক?"

আসাদ প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না। সে জানে এই অনুভূতি ব্যাখ্যা করার মতো কোন শব্দ তার ঝুলিতে নেই। আব্দুল দরবেশ আসাদের মাথার উপর থেকে হাত সরিয়ে বললেন-

"শোন আসাদ, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অদ্ভুত জগত রয়েছে। যেখানে কোন কলহ নেই। সেই জগতে প্রবেশ করাই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তুমি যাবে আমার সাথে সেই জগতে?"

আসাদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

"কিন্তু আসাদ এই জ্ঞান অর্জন এবং রহস্যালোকে পৌছানোর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প। তুমি কি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে?"

"পারবো, বাবা!"

"এ জগতে আছে আয়না মহল, ত্রিবেণীর ঘাট, আঠারো মকাম, সাত চক্র আরো কত কি.....কিন্তু তোমার মাথা এখন ভর্তি নানা রকম দলিলভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা। শূন্য হয়ে আসো আসাদ। তবেই কেবল সেই রহস্যলোকের জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। শূন্য হওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজেকে জানা। খুঁজে বের করো নিজের পরিচিতি! তোমাকে নতুন করে শিখতে এবং জানতে হবে কলেমাকে! আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে তোমাকে। আর তোমার এই জন্ম ঘটবে ভাব জগতে!"

আসাদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "বাবা, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। কিন্তু, আমি তো জানি আমি কে। আবার নতুন করে কিভাবে চিনব নিজেকে?"

আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "তুমি নিজেকে যতটুকু চিনো তা অপরের দৃষ্টিতে। যেমনঃ তোমার নাম আসাদ। আর সেটা তুমি জানো কারণ এই নামের পরিচিতি তোমাকে তোমার বাবা মা প্রদান করেছেন।"

আসাদ, "ঠিক! আমি যে মুসলিম সেটাও তো আমি সমাজ থেকে জানতে পেরেছি। তাহলে আমি নিজে কি জানি নিজের সম্পর্কে?"

"একদম মূলটাই তুমি ধরতে পেরেছ। রহস্যলোকের জ্ঞান ভিন্ন। সেখানকার জানা বোঝা আর এ জগতের দশজন মানুষের জানা বোঝার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তোমার দেহটা কি তোমার না কি অন্য কারো? এটা খুবই সূক্ষ্মজ্ঞান। আসাদ- তোমার দেহের ছায়া আর দেহ কি এক নয়? দেহের ভেতরে আরো একজন তুমির বাস রয়েছে। আর, এই তুমির ছায়াটাই হলো দেহ। ছায়া কিন্তু দেহ নয়। তবে ছায়াকে অনুসরণ করে আগাতে থাকলে মূল দেহের খোজ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি নিজ দেহের সঠিক পরিচয় জেনে আগাতে থাকলে সেই মূল আমি তথা পরমের দর্শন পাওয়া যায়। একটু জটিল হয়ে গেল, তাই না?"

আসাদ বোকার মতো হেসে বললেন, "জি বাবা।"

"সহজ করে দিচ্ছি। তুমি এই ধরায় আসার আগে কোথায় ছিলে?"

"মায়ের গর্ভে"

"গর্ভে কী অবস্থায় ছিলে? "

"ছোট শিশু।"

"শিশু থাকার আগের অবস্থাটা কী ছিলো?"

"ভ্রুন"

"তার আগে?"

"আমার জন্মদাতা পিতার বীজ।"

"তার আগের রূপ?"

"রুহ"

আব্দুল দরবেশ হেসে বললেন,

"শোন এই রুহটাই তুমি। বাকিসব তার খোলস৷ এই খোলস গুলো পার করেই রুহের কাছে যেতে হয়। এটাই মূল পরীক্ষা।"

"এরপরেই কি খোদা প্রাপ্তি হবে?"

"আরো একটু গভীরভাবে রুহের এক ধাপ উপরে চিন্তা করো।"

"ঠিক ধরতে পারছি না বাবা।"

"ধরিয়ে দিচ্ছি। "রুহ" কে ফুৎকার দিয়েছেন?"

"আল্লাহ"

"আর এই পৃথিবীতে "রুহ" খোলসের আবরণে যুক্ত হওয়ার আগে কার জিম্মায় ছিলো?"

"আল্লাহ।"

"তাহলে এখনো কি তুমি বুঝতে পারো নি আসাদ! তোমার কাছে তো এটা খুবই সহজ হয়ে যাওয়ার কথা এখন। এই খোলসের রাস্তা পারি দিয়ে যখন তুমি সেই "রুহ"-র কাছে যাবে তখন তুমি মহান আল্লাহর জিম্মাতেই চলে যাবে। আর এটাকে বলা হয় আত্মদর্শন। মূলত আত্মদর্শনই খোদা দর্শন। কারণ, আল্লাহ এই "রুহ" তার নিজ রুহ থেকেই ফুৎকার করেছিলেন। এখনো কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?"

"না, বাবা। সবকিছু পরিষ্কার এখন আমার কাছে। এখন আমি কিভাবে সেই রুহের কাছে পৌঁছাবো? আমাকে এই খোলস পারি দেয়ার পন্থা গুলো বলুন।"

আব্দুল দরবেশ একটি লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন, "এতো দ্রুত সব বিষয়ের ছবক তোমাকে দেয়া যাবে না। কারণ, এই পথের প্রধান শর্তই হচ্ছে ধৈর্য্য এবং অধ্যাবসায়। স্বল্প জ্ঞান, অধিক ধ্যান। প্রথমেই নতুন করে কলেমার শিক্ষা নিয়ে এই জগতে পা রাখতে হবে। এরপর, দেহের পরিচিতি। তবে আজ আর নয়। তোমাকে আজ ২টি নির্দেশ দিবো আমি এবং নির্দেশগুলো যথোপযুক্তভাবে এক সপ্তাহ পালন করবে। এরপর, শনিবার এশার নামাজের পর আমার বাসায় আসবে। যদি নির্দেশনা গুলো ঠিকঠাকভাবে মানতে পারো তবেই তোমার আনুষ্ঠানিক তালিম শুরু হবে। সেদিন অবশ্য তুমি একা থাকবে না। আমার পরিবারের সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেই সাথে আমার খুব কাছের একজন শিষ্য -ও সেখানে উপস্থিত থাকবে। তোমার দুজনেই সেদিন আমার বাড়িতে রাত্রিযাপন করবে।"

"ঠিক আছে বাবা। আপনার যেমনটা ইচ্ছা।"

"প্রথমত, সামনের এক সপ্তাহ তুমি কারো সাথে কথা বলবে না খুব প্রয়োজন ব্যতীত। বিশেষত, এমন কিছু বলবে না যা জ্ঞান মূলক। দ্বিতীয়ত, সালাত আদায় করবে তবে আল্লাহর কাছে তার বিনিময়ে কিছুই চাইবে না।"

"আচ্ছা, বাবা।"

"ব্যাপারটা শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আদোতে কিন্তু এতোটা সহজ নয়। তুমি হয়তো ব্যর্থ হতে পারো। তবে তোমার চেষ্টা যেন পরিপূর্ণ থাকে। এবং ভূলেও ভেবো না যে আমাকে মিথ্যা বলে পার পেয়ে যাবে। মনে রাখবে আমার দৃষ্টি

তোমার উপর সব সময় থাকবে। যখনই বড় কোনো সমস্যায় পড়বে আমাকে স্মরণ করো। এখন তুমি আসতে পারো।"

অতঃপর, আসাদ আব্দুল দরবেশ কে সালাম দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সহীহ হাদিছ আন্দোলন বাংলাদেশ,

ময়মনসিংহ শাখা, কাশর।

অফিসে আজ তুমুল ভেজাল চলছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু "আসাদ"। আসাদের হঠাৎ দল ত্যাগ রীতি মতো মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সহীহ হাদিছ যুব সংঘের সভাপতি মহাসিনের জন্য। তিনি প্রচুর কটু বাক্যের সম্মুখীন হয়েছেন পার্টির সিনিয়র শায়েখদের কাছ থেকে। সহীহ হাদিছ আন্দোলন - ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি শায়েখ রাজ্জাক। তিনি এই পুরো ঘটনার দায় চাপিয়েছেন মহাসিনের উপরে। অন্যদিকে যুব সংঘের সভাপতি মহাসিনও সংঘের অন্যান্য সদস্যদের উপর চটে আছেন। তুমুল আলোচনা সমালোচনা, পক্ষে-বিপক্ষে নানান বিক্ষিপ্ত বাক্যালাপ চলছে অফিস। একসময় মহাসিন নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

"ভাইয়েরা আমার, অনেক ভেবে দেখলাম এভাবে একে অন্যকে দোষ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। এটা আল্লাহর দেয়া পরীক্ষাও হতে পারে। একটা কথা সবাই মনে রাখবেন, বাতেলদের শক্তি যতই বেশী হোক না কেন তা ভাঙতে বাধ্য। কারণ, "হক"-র সৃষ্টিই হয়েছে বাতেল কে পরাস্থ করার জন্য। আমাদের কোন ভাবেই নিরাশ হলে চলবে না। সব অবস্থায় আমাদের মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে।"

সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "তাহলে আপনি কী করতে চাচ্ছেন? আপনার মতে সমাধানের পথটা কী?"

"আমাদের একটি বাহাসের আয়োজন করা উচিৎ। আর, এটা আমারা এই বাহাস এলাকার মসজিদেই আয়োজন করবো। এতে আমাদের লাভ দুটো-

১. সবার সামনে ঐ বাতেল কে ভূয়া প্রমাণ করা যাবে।

২. আমাদের সহীহ্ মতবাদকে সকলের সামনে তুলে ধরা যাবে।

এর ফলে আরো অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে। আপনাদের সকলের এ ব্যাপারে কী মতামত?"

পাশ থেকে দলের সাধারণ সদস্য সুমন আলী বললেন- "বাহাসে যাওয়াটা কি একটু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে না?"

সভাপতি মহাসিন বললেন, "ঝুঁকি হবে কেনো? এসব ভণ্ডদের পড়াশোনার দৌড় আমার জানা আছে!"

সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ বললেন, "তারপরও হয়তো আমাদের আরেকটু ভাবা উচিত। কারণ, এলাকার মানুষজনের তথ্য অনুযায়ী ওই দরবেশ নাকি যথেষ্ট জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান। আমাদের সিলসিলার একজন বড় শায়েখকে সাথে নেয়া উচিৎ। এতে আমাদের ভিত্তিটা শক্ত হবে। আর বাহাসে জেতার সম্ভাবনা যেমন আছে ঠিক তেমনি হেরে যাওয়ারও খানিকটা সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ্ না করুক সবার সম্মুখে যদি সেই সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে যায় তাহলে এলাকায় আর মুখ দেখানোর কোনো উপায় থাকবে না।"

পাশ থেকে সুমন আলী বললেন, "সবার আগে এটা জানা উচিত ঐ ভণ্ডটা বাহাসে যেতে রাজি হবে কি না!"

সভাপতি মহাসিন কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার কথাটা যৌক্তিক। এই ভণ্ডটা রাজি হবে কি না সেটাই প্রথমে জানা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের যে করেই হোক তাকে রাজি করাতে হবে। বাহাসে না আসতে চাইলে আমরা আলোচনার প্রস্তাব দিবো। এমনভাবে তাকে আমরা দাওয়াত দিবো যেন আমরা জ্ঞান পিপাসু। এ কাজের দায়িত্ব থাকবে আমানুল্লাহর উপর। তুমি আজই বেরিয়ে পর। আর আলোচনার সময় শুক্রবার বাদ জুম্মা ঠিক করবে। বলা বাহুল্য যে আমরা কোন সিনিয়র শায়েখ আনতে পারব না। কারণ, তারা প্রচণ্ড ক্ষেপে

আছেন আমাদের উপর। আর সামান্য ফুটো পয়সার ভক্তের সাথে বাহাস কিংবা আলোচনার জন্য আমাদের সম্মানিত শায়েখদের আহবান করাটা লজ্জাজনক। ইনশা-আল্লাহ, আমরাই বিজয়ী হব।"

মহাসিনের বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সবাই একসাথে আল্লাহু আকবার বলে ধ্বনি তুললেন। ঘরের মধ্যে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। সভাপতি মুহাসিন উত্তেজিত সদস্যদের শান্ত করে বললেন,

"আমরা আবার এশার নামাজের পরে একত্রিত হবো।"

তখনই সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ অফিস ত্যাগ করে বেরিয়ে পরলেন আব্দুল দরবেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

বেলা ২.৩১ মিনিট

আব্দুল দরবেশ তার হুজরাখানায় ইবাদতরত অবস্থায় বসে আছেন। হঠাৎ তিনি কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন আদিল দরজার কোণায় উঁকি দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে। এতো কৌতুহল কেন ছেলেটার ভেতর? আব্দুল দরবেশ ইবাদতে বিরতি টানলেন। আদিলকে ডাক দিয়ে বললেন, "আদিল! আদিল! দরজার কোণা থেকে বেরিয়ে এসো!"

আদিল বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল এবার আর তার রক্ষা নেই। বাবা আজ নিশ্চিত প্রচণ্ড বকা দিবেন। তার ইবাদত নষ্ট করেছি আমি। আদিল মাথা নিচু করে আব্দুল দরবেশের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন,

"বাবা, আমি দুঃখিত। আমি এমনিতেই আপনার কক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না!"

আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "আদিল আমি কি তোমায় বলেছি যে তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে? মনের অজান্তেই তুমি সত্যটা প্রকাশ করে দিয়েছ। এখন যা মনে আছে সেটাও প্রকাশ করতে পারো। আমার সামনে মিথ্যা বলো না। কারণ সেটা আমার সামনে টিকবে না।"

আদিল অস্থির স্বরে বলল, "ইয়ে মানে বাবা বলছিলাম যে, কুন্ডলিনী সাধনা কী?"

আদিলের প্রশ্ন শুনে আব্দুল দরবেশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার হাতে তছবিহ'র দানা স্থির হয়ে গেল। আদিল কোথা থেকে এই শব্দটা জেনেছে তা তিনি কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না। আদিলের প্রশ্নের উত্তর দেয়া তো দূরের কথা আব্দুল

দরবেশের কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দই বের হচ্ছিল না৷ তিনি নিজেকে সামলানোর জন্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এতে করে তার মনের স্থিরতা পুনরায় ফিরে আসল। অন্যদিকে আদিল মহা দুশ্চিন্তায় পরে গেল। আব্দুল দরবেশের গম্ভীর মূর্তি দেখে সে ভাবল, আজ থেকে মনে হয় তার জন্য হুজুরাখানার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

কিছু সময় পরে আব্দুল দরবেশ চোখ খুলে মুচকি হাসলেন। বললেন, "এই বাদর, এই শব্দ তুই কোথা থেকে শুনেছিস।"

বাবার মুখে "তুই" সম্বোধন শুনে আদিল এবার সাহস পেলো। সে জানে বাবা ভালবাসে তাকে তুই সম্বোধন করে।

আব্দুল দরবেশ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে বলছিস না কেন?"

"ইয়ে বাবা, আমাদের স্কুলের পাশে কালিবাড়ি রোডে একটা দরবার আছে, সেখানে আমি স্কুল ছুটির পরে মাঝেমধ্যে যাই।"

"আচ্ছা, তাহলে স্কুল বাদ দিয়ে এসবই করা হয় তোর।"

আদিল গোমড়া মুখ করে বলল, "আমার কী দোষ আপিনই তো আমাকে জ্ঞান দেন না।"

"এরজন্য তুই এখন অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে যাস।"

আদিল কিছুটা বিব্রত বোধ করলো। বললো, "আপনি তো বলেছিলেন জ্ঞান আহরণের জন্য যেন চীন দেশে হলেও চলে যাই। আর, এ তো মাত্র কালি বাড়ি। "

আব্দুল দরবেশ চিন্তায় পরে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন আদিল ঠিকই বলেছে। আমি তার মনের জানার ইচ্ছা পূরণ করতে পারছি না বিধায়ই তো সে অন্যের কাছে ছুটছে।

আব্দুল দরবেশ বললেন, "তা- তুই তো আমাকে কিছুই ভেঙে বলিস না। তেমন কোন প্রশ্নও তো করিস না! "

বেলা ২.৩১ মিনিট

আব্দুল দরবেশ তার হুজরাখানায় ইবাদতরত অবস্থায় বসে আছেন। হঠাৎ তিনি কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন আদিল দরজার কোণায় উঁকি দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে। এতো কৌতুহল কেন ছেলেটার ভেতর? আব্দুল দরবেশ ইবাদতে বিরতি টানলেন। আদিলকে ডাক দিয়ে বললেন, "আদিল! আদিল! দরজার কোণা থেকে বেরিয়ে এসো!"

আদিল বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল এবার আর তার রক্ষা নেই। বাবা আজ নিশ্চিত প্রচণ্ড বকা দিবেন। তার ইবাদত নষ্ট করেছি আমি। আদিল মাথা নিচু করে আব্দুল দরবেশের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন,

"বাবা, আমি দুঃখিত। আমি এমনিতেই আপনার কক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না!"

আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে বললেন, "আদিল আমি কি তোমায় বলেছি যে তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে? মনের অজান্তেই তুমি সত্যটা প্রকাশ করে দিয়েছ। এখন যা মনে আছে সেটাও প্রকাশ করতে পারো। আমার সামনে মিথ্যা বলো না। কারণ সেটা আমার সামনে টিকবে না।"

আদিল অস্থির স্বরে বলল, "ইয়ে মানে বাবা বলছিলাম যে, কুন্ডলিনী সাধনা কী?"

আদিলের প্রশ্ন শুনে আব্দুল দরবেশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার হাতে তছবিহ'র দানা স্থির হয়ে গেল। আদিল কোথা থেকে এই শব্দটা জেনেছে তা তিনি কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না। আদিলের প্রশ্নের উত্তর দেয়া তো দূরের কথা আব্দুল

দরবেশের কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দই বের হচ্ছিল না। তিনি নিজেকে সামলানোর জন্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এতে করে তার মনের স্থিরতা পুনরায় ফিরে আসল। অন্যদিকে আদিল মহা দুশ্চিন্তায় পরে গেল। আব্দুল দরবেশের গম্ভীর মূর্তি দেখে সে ভাবল, আজ থেকে মনে হয় তার জন্য হুজুরাখানার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

কিছু সময় পরে আব্দুল দরবেশ চোখ খুলে মুচকি হাসলেন। বললেন, "এই বাদর, এই শব্দ তুই কোথা থেকে শুনেছিস।"

বাবার মুখে "তুই" সম্বোধন শুনে আদিল এবার সাহস পেলো। সে জানে বাবা ভালবাসে তাকে তুই সম্বোধন করে।

আব্দুল দরবেশ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে বলছিস না কেন?"

"ইয়ে বাবা, আমাদের স্কুলের পাশে কালিবাড়ি রোডে একটা দরবার আছে, সেখানে আমি স্কুল ছুটির পরে মাঝেমধ্যে যাই।"

"আচ্ছা, তাহলে স্কুল বাদ দিয়ে এসবই করা হয় তোর।"

আদিল গোমড়া মুখ করে বলল, "আমার কী দোষ আপিনই তো আমাকে জ্ঞান দেন না।"

"এরজন্য তুই এখন অন্যের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে যাস।"

আদিল কিছুটা বিব্রত বোধ করলো। বললো, "আপনি তো বলেছিলেন জ্ঞান আহরণের জন্য যেন চীন দেশে হলেও চলে যাই। আর, এ তো মাত্র কালি বাড়ি। "

আব্দুল দরবেশ চিন্তায় পরে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন আদিল ঠিকই বলেছে। আমি তার মনের জানার ইচ্ছা পূরণ করতে পারছি না বিধায়ই তো সে অন্যের কাছে ছুটছে।

আব্দুল দরবেশ বললেন, "তা- তুই তো আমাকে কিছুই ভেঙে বলিস না। তেমন কোন প্রশ্নও তো করিস না! "

আদিল কপট রাগ দেখিয়ে বললো, "এহ্! আপনিই তো কিছু বললে বলেন তোমার এখনো বয়স হয়নি। আমি ছোট, আরো কত কী! এরপরও, আমি যদি কোন কথা শুনতে আসি তখন আমাকে রুম থেকে বের করে দেন। প্রশ্ন করা তো দূরের কথা।"

আব্দুল দরবেশ হেসে আদিলের কপালে চুমো খেয়ে বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে এখন থেকে আর এরকমটি হবে না। এবার বল কুন্ডলিনী সম্পর্কে তুই কী কী জানিস?"

"তেমন কিছু না। শুধু জানি এটা সাধনা করলে অনেক সুপার পাওয়ার পাওয়া যায়।"

"যেমন? "

"এই মনে করো, ঐ বাবা কে বলতে শুনেছি এটা জাগ্রত করতে পারলে-

১. যে কারো মাইন্ড কন্ট্রোল করতে পারবো।

২. আত্মাকে শরীর থেকে আলাদা করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারবো।

তারপর, আরো যেন কী কী বলছিলো ঠিক মনে পরছে না।"

আব্দুল দরবেশ আদিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন- "আচ্ছা, বুঝলাম। তাহলে এখন ঠিক কী জানতে চাইছো? "

"বাবা, জানতে তো চাই সবকিছুই। আপনি আমাকে ব্যাপারটা ভেঙে বলেন। পুরাটা বলবেন।"

আব্দুল দরবেশ হেসে ফেললেন, "আচ্ছা তবে মন দিয়ে শোন। আসলে কুন্ডলিনী হলো এক ধরনের শক্তি। আর এ শক্তির মূলত কোন সীমা নেই। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এর ক্ষমতা কতটুকু। আর এই অসীম ক্ষমতা তুমি তোমার নিজ দেহে ধারণ করে আছো আদিল।"

আদিল অবাক হয়ে বলল, "এগুলো কী বলছেন আপনি? আমার দেহেই জিনিসটা আছে আর আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি না। কিভাবে সম্ভব!"

আব্দুল দরবেশ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, " আদিল তোমাকে যে কিভাবে বোঝাই ব্যাপারটা। আচ্ছা, শোন এই যে তুমি আমার সাথে কথা বলছ। এটা কি তোমার কাছে অদ্ভুত লাগে না? কখনো কি ভেবেছো এ শক্তির উৎস কোথায়? এই যে আমার সাথে কথা চলাকালীন তোমার চোখ এতো বার পলক ফেলছে সেটা কি তুমি গণনা করে রাখতে পারছ?"

"না, কারণ আমি মনযোগ দেই নি!"

"হ্যা, "মনযোগ" - এই শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি মনযোগ না দিলেও কিন্তু কাজগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। ঠিক তেমনি এই অসীম শক্তি রয়েছে এবং সে তার নিজ গতিতেই কাজ করে যাচ্ছে তোমার মনযোগের অগোচরে। এবার ভাবো দেহের প্রতিটা অংশে যদি তুমি তোমার মনযোগ স্থাপন করতে পারো তবে কেমন হবে?"

"আর একটু খুলে বলবেন?"

"ধর তুমি একটি মাঠে দাঁড়িয়ে তোমার বন্ধুর সাথে কথা বলছো। সেই সাথে মাঠে আরো অনেকে কথা বলছে। সেগুলো তোমার কানে আসছে কিন্তু তুমি সচেতনভাবে ধরতে পারছো না। তাহলে কি কথা গুলো তোমার ব্রেইন থেকে হারিয়ে যাবে? অবশ্যই না! সবকথা গুলোই তোমার মাথাতে জমা থাকবে। এবার তুমি যদি এই সুপ্ত তথ্য গুলোকে সচেতন চিন্তায় আনতে পারো তবে তোমার জ্ঞানের ভান্ডার কেমন হবে?"

আদিল একটু চমকে বলে উঠলেন, "অনেক! কারণ তখন আমি সকলে কী বলছে সেটা সম্পর্কে জানতে পারবো।"

"হ্যা! মূলত এটাই কুন্ডলিনী। আমাদের শরীরে মোট সাতটি চক্র রয়েছে। যাদের মধ্যে প্রায় সব কয়টি চক্রই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আমাদের শরীরের এই

সাতটি চক্রের মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত শক্তি। যেই শক্তি আমাদের ধরণার বাইরে। আর এই ধারণার বাইরে থাকার কারণ আমরা আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় পার করে দেই অন্যকে চিনতে চিনতে। এদিকে নিজেকে চেনা-জানার সময়-ই পাই না। মনে রাখবে আদিল এই বিশ্বকে পরিচালনা করার জন্য যেমন একটি ম্যাকানিজম আছে, ঠিক অনুরূপ আমাদের দেহেরও একটি ম্যাকানিজম রয়েছে। একজন চালক যদি তার নিজ গাড়ির প্রতিটি ফাংশন সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না হয়, তবে তার গাড়ি যতই উন্নত হোক না কেন তিনি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না।"

"জি"

"যাই হোক, এখন দেহের এই সাতটি চক্রের অবস্থান কোথায় এবং তাদের নাম জানা যাক-

১. শরীরের সব থেকে নিচের চক্রটিকে বলা হয় মূলাধার চক্র।

২.স্বাধিষ্ঠান চক্রঃ এই চক্র দেহের তলপেট বা অগ্নাশয় নিয়ে গঠিত। এই চক্রে ছয়টি দল। এর রঙ গাঢ় গোলাপি। এতে আছে মেদ ধাতুর শক্তি। এ চক্রে দিব্যশক্তির নৃত্যে কামনা-বাসনা, লোভ এবং ভয় বৃদ্ধি পায়।

৩. মনিপুর চক্র বা নাভিচক্র (Solar Plexus):

মনিপুর চক্র দেহের নাভি বা পাকস্থলীর নিচে শিরাজাল নিয়ে গঠিত। এ চক্রের দশটি দল। এটির রঙ বেগুনি। এটি আমাদের উচ্চ চেতনা, জীবনীশক্তি, আবেগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটাতে আছে মাংসধাতুর শক্তি। তেজশক্তির আধার এটি।

৪. অনাহত চক্র (Thymus Gland):

এই চক্র আমাদের বুকের মাঝখানে অবস্থিত। এ চক্রের বারোটি দল। এর রঙ গোলাপি। এটি আমাদের আবেগ, রাগ-অনুরাগ, প্রেম, বিরহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটর গভীরে আত্মার বাস।

৫. বিশুদ্ধ চক্র (Throat):

বিশুদ্ধ চক্র আমাদের কণ্ঠে অবস্থিত। এ চক্রের রয়েছে ১৬ টি দল। এর রঙ ধূসর। এটি আমাদের ভাবপূর্ণ মন ও বাহির মনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. আজ্ঞা চক্র (Third Eye):

আজ্ঞা চক্র আমাদের দুই ভ্রুর মাঝখানে অবস্থিত। এ চক্রের দুটি দল। এর রঙ সাদা। এই চক্রে জাগরণে ভবিষ্যৎ দেখা যায়।

৭. সহস্রার চক্র (Pituitary Gland):

সহস্রার চক্র আমাদের মাথার ঠিক উপরে অবস্থিত। এ চক্রের সহস্রটি দল। এর নির্দিষ্ট কোন রঙ নেই। এটি আমাদের অবচেতনা, অন্তর্দৃষ্টি, বোধসত্ত্ব, দিব্য চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই সাত চক্রের পূর্ণ জাগরণই মূলত কুন্ডলিনী। তবে সবচেয়ে নিচের চক্র অর্থাৎ মূলাধার চক্রের জাগরণের সাথে সাথেই ধীরে ধীরে বাকি চক্র গুলোর জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।"

অদিল অত্যন্ত উৎসাহী কণ্ঠে বলল, "বাবা, আমি এই শক্তির জাগরণ করতে চাই। কতদিন লাগতে পারে? "

আব্দুল দরবেশ তার আসন থেকে উঠে হাসতে হাসতে বললেন, "শোন আদিল, তুমি যা ভাবছো ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। এখন তুমি যা ভাবছো বা এই শক্তি পেয়ে তুমি যা যা করতে চাইছো তা কুন্ডলিনী জাগরণের সাথে সাথে সবকিছুই তুচ্ছ মনে হবে। আর সময়ের ব্যাপারটা এখানে হাস্যকর। কারণ, মহাজগত বা অসীম কে কোনদিন সময় দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না।"

আদিল বলল, "বাবা, আপনি বড্ড পেঁচিয়ে কথা বলছেন। সোজাসাপটা বলে দিন না আমি এসব চক্র খুলবো কিভাবে?"

"শোন, আদিল এটার প্রতি তোমার আগ্রহ জেগেছে এর মূল কারণ হচ্ছে তোমাকে তোমার প্রবৃত্তি সেদিকে টানছে। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রবৃত্তি। আর প্রবৃত্তি নিয়ে কুন্ডলিনীর জগতে প্রবেশ করা যায় না। প্রবৃত্তিকে জয় করে সেখানে পা রাখতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প এবং সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি। শোন আদিল, যে জিনিসের শক্তির পরিমাণ যত বেশি, সেই জিনিসের নিয়ন্ত্রণ তত কঠিন।"

"বুঝলাম না।"

"আচ্ছা আদিল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় কী দ্বারা?"

আদিল, "এটা তো সহজ প্রশ্ন। পানি, কয়লা ইত্যাদি থেকে।"

"ঠিক, তবে সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে পরমাণু। কিন্তু এই মাধ্যমের যেমন সুবিধা আছে ঠিক তেমনি ভয়ানক অসুবিধাও রয়েছে। ঠিকভাবে এটাকে আয়ত্তাধীন না করা গেলে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। অনুরূপ ভাবে, এই কুন্ডলিনীও তাই। এটাকে জাগ্রত করার পরে তোমার দেহ তা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না থাকলে তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। প্রজ্ঞাবান হওয়ার বিপরীত হয়ে যাবে পাগল অথবা জীবন্ত লাশ।"

আদিল তার নখ দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে বললেন, "তাহলে, বাবা আপনি কি কুন্ডলিনী জাগ্র...."

আদিলের কথা শেষ না হতেই বাইরে থেকে কে যেন তীব্র গলায় ডেকে উঠলেন, "দরবেশ সাহেব, ও দরবেশ সাহেব বাড়িতে আছেন...!"

আব্দুল দরবেশ ভ্রূ কুচকে মনে মনে ভাবতে লাগলেন এই অসময়ে আবার কে! লোকটার গলার স্বরটাও অপরিচিত। তিনি কিছু বলার আগেই আদিল দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আদিল দরজা খুলতেই দাড়ি ওয়ালা এক লোককে দেখতে পেল। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। সে মনে মনে ভাবলো, এই লোকটা আবার কে?

আগন্তুক দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে আদিলকে সালাম দিয়ে বললেন, "দরবেশ সাহেব আছেন?"

আব্দুল দরবেশ তার প্রশ্ন শুনেই আদিলকে লোকটাকে হুজরাখানার ভেতরে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। আদিল বাবার নির্দেশ মোতাবেক তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আব্দুল দরবেশ লোকটাকে আসন গ্রহণের অনুরোধ করলেন।

লোকটি বসতে বসতে তাকে সালাম দিয়ে বললেন,

"আমি আমানুল্লাহ, ময়মনসিংহ সহিহ হাদিস আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক।"

আব্দুল দরবেশ অতিথির জন্য চা এবং খেজুরের ব্যবস্থা করতে বললেন। আদিল তার আদেশ শুনে কক্ষ ত্যাগ করলো। তার মুখ ভার। সে মায়ের কাছে গিয়ে খেজুর এবং চায়ের কথা বলল। হাজেরা বেগম আদিলের এহেন গোমরা মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে কী হয়েছে তোর?"

"কথা বইলো না তো! কিছু হয়নি। ভাল্লাগে না কিছু! তাড়াতাড়ি খেজুর এবং চা দেও।"

হাজেরা বেগম আদিলের রাগ মাখা মিষ্টি মুখ দেখে হেসে ফেললেন। তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে? বলবি তো... "

"আরে ধুর! যখনই বাবার সাথে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে যাই তখনই কোন না কোন ঝামেলা এসে হাজির। আর আমাকে কামলার মত এসব উটকো ঝামেলাদের আপ্যায়ন করতে হয়।"

হাজেরা বেগম আদিলের কপালে চুমু দিয়ে বললেন- "রাগ করে না বাবা। চা আর খেজুর গুলো নিয়ে যাও। আর শোন মনে রাখবে, অতিথিদের সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার করতে হয়।"

আদিল ট্রে-টা হাতে নিতে নিতে বলল, "হ্যা, ওটাই তো করে যাচ্ছি।"

হুজরাখানার ভেতর

"তা জনাব, এই অধমের কাছে কী মনে করে?" আব্দুল দরবেশ বললেন।

আমানুল্লাহ অত্যন্ত মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, "জি জনাব, আমাদের দলের পক্ষ থেকে আপনার সাথে ছোট্ট একটি বাহাসের আয়োজন করতে চাই। অবশ্য, যদি আপনি সম্মতি দেন আর কি! আমাদের এলাকার মসজিদেই আয়োজনটি করার ইচ্ছা আছে।"

"আমার মতো এরকম নগণ্য ব্যক্তির সাথে বাহাসে যাওয়ার কারণ কি? আমি মনে করি এতে আপনাদের মান-সম্মান ক্ষুন্ন হবে। হাজার হোক আপনারা "সহিহ হাদিস সম্মেলন"।"

আমানুল্লাহ আব্দুল দরবেশের শেষ বাক্যটি শুনে বেশ দ্বিধায় পরে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে এই ভণ্ডটা আসলে আমাদের সুনাম করলো নাকি উপহাস। এরই মধ্যে আদিল কক্ষে চা এবং খেজুর নিয়ে হাজির। আব্দুল দরবেশ আদিলকে আগত অতিথির সামনে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন। আদিল তার নির্দেশ পালন করল। খাবার পরিবেশনের পর আব্দুল দরবেশ বললেন, "নিন জনাব, গ্রহণ করুন। খেতে খেতে বাকি কথা বলুন। আদিল তুমি এখন..... "

"থাক আর বলতে হবে না। জানি আমি। চলে যাচ্ছি কক্ষ থেকে। বয়স হলে আসবো।"

আব্দুল দরবেশ আদিলের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে আমানুল্লাহর দিকে খেজুরের বাটি এগিয়ে দিলেন। আমানুল্লাহ চায়ে চুমুক দিয়ে খেজুর মুখে পুড়ে বললেন,

"আসলে আপনার একটি বিশেষ প্রভাব যে এ এলাকায় রয়েছে তা তো আপনি বা আমি কেউই অস্বীকার করতে পারবো না তাই না?"

"আপনি বলে যান।"

"তাই চাচ্ছিলাম কিছু বিষয়ে আমাদের একটু বোঝা পড়ায় আসা উচিত। কারণ, আমরা কেউই চাই না মানুষ হেদায়েত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হোক। আপনি হয়তো এমন কিছু করছেন যা একদম ভুল কিন্তু তা আপনি জানেন না। আর এক মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের ভুল ধরিয়ে দিবে এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? আর আমি মনে করি আপনি অনেক প্রজ্ঞাবান মানুষ। ভুল থাকলে নিজেকে শুধরে নিয়ে হকের পথ আঁকড়ে ধরবেন।"

আব্দুল দরবেশ তার চোখ বন্ধ করলেন। আমানুল্লাহ খেয়াল করলেন তিনি খুব দ্রুত তছবিহ দানা জপছেন। তিনি কিছুটা ভরকে গেলেন এই দৃশ্য দেখে। কী হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। সময় যেন খুব দ্রুত অতিবাহিত হতে লাগল। আমানুল্লাহ লক্ষ্য করলেন তিনি আর মেঝেতে বসা নেই। শুভ্র সবুজ দুর্বা ঘাসের উপর বসে আছেন। তিনি চেষ্টা করলেন উঠে দাড়াবার কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। কোন এক শক্তি যেন তাকে নিচের দিকে টেনে ধরে রেখেছে। আমানুল্লাহ আশপাশে তাকালেন। এখানে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ আছে কি না তার অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু তিনি আব্দুল দরবেশ ব্যতীত আর কাউকে দেখতে পেলেন না। প্রচণ্ড ভয়ে আমানুল্লাহ কাঁপতে শুরু করলেন। এমন প্রকৃতি তিনি আগে কখনো দেখন নি। এ যেন প্রকৃতির এক স্বর্গীয় রূপ। এই স্বর্গীয় প্রকৃতির মধ্যে তার অশান্তির কারণ ছিলো দুটি -

১.তিনি এখানে এলেন কিভাবে?

২. এই স্থানটি কোথায়? এরকম মাঠ যে এই তল্লাটে নেই এটা তিনি নিশ্চিত। তাহলে এটা আসলো কোথা থেকে?

আমানুল্লাহ চিৎকার দিয়ে আব্দুল দরবেশ কে কয়েকবার ডাকার পরেও কোন প্রকার সাড়া পেলেন না। তিনি প্রচণ্ড ভীত হয়ে চোখ বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি উপলব্ধি করলেন তার মাথার উপর এক নরম হাতের ছোয়া। তিনি খুবই ভীত অবস্থায় ধীরে ধীরে তার চোখ খুললেন। কিন্তু

একি? আমানুল্লাহ অবাক হয়ে গেলেন। কারণ দেখতে পেলেন তিনি তার আগের অবস্থানে অর্থাৎ আব্দুল দরবেশের হুজরাখানাতেই বসে আছেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আব্দুল দরবেশ। আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে আমানুল্লাহর চোখে গভীর দৃষ্টি রাখলেন। তিনি তার চোখের দৃষ্টির তীব্র গভীরতা অনুধাবন করলেন খুব সহজেই। সে এক অসাধারণ অনুভূতি। আমানুল্লাহ এক বন্ধন অনুভব করলেন যা ছিলো যুগ থেকে যুগান্তরের। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে তিনি তার উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন। ভয়-ক্রোধ দূর হয়ে মনে এশকের ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। কত কথা যেন তার বলবার বাকি। তবে ঠিক কী বলতে হবে তিনি বুঝতে পারছেন না।

আব্দুল দরবেশ বললেন, "জনাব, আমানুল্লাহ! কখনো কি ভেবেছেন এই "হেদায়েত" শব্দটার গভীরতা ঠিক কতটুকু?"

আমানুল্লাহ নিথর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না, দরবেশ।"

"শোনেন তাহলে, যে হেদায়েতের ঝুড়ি নিয়ে আপনারা ছুটে বেড়াচ্ছেন, সেই হেদায়েত তো নবী (সাঃ) তাঁর আপন চাচা আবু তালেবকেই দিতে পারেননি। সেখানে আপনারা কারা? কোথা থেকে পান এই স্পর্ধা? যে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন?"

আমানুল্লাহ চুপ করে আছেন। কোন এক অচেনা শক্তি যেন ভেতর থেকে তার মুখে লাগাম টেনে ধরেছে। তিনি এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। কিছু সময় চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, "তবে কি বাহাসের জন্য আপনি রাজি নন?"

"বাহাস কোন কিছুর সমাধান নয়। এগুলো গাধারা করে বেড়ায়। কারণ, এতে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বরং, ফেতনা বৃদ্ধি পায়। বাহাসে দু-পক্ষই তাদের মতের উপর অটল থাকেন। তাহলে, ইহা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কী?"

আমানুল্লাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাকে রাজি করাতে না পারলে তিনি কাওকে মুখ দেখাতে পারবেন না। যেভাবেই হোক তাকে রাজি করাতেই হবে। তিনি কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন,

"ঠিক আছে, আমরা তাহলে সাধারণ আলোচনা করবো। এলমের আদান প্রদান হবে।"

"হ্যা, সেটা করা যেতে পারে। কবে করতে চান?"

"আপনি অনুমতি দিলে সামনের শুক্রবার বাদ জুম্মা।"

আব্দুল দরবেশ রহস্যময় ভাবে হেসে বললেন, "ঠিক আছে, তবে তাই হোক?"

আমানুল্লাহর মুখ পুলকিত হয়ে উঠলো। তিনি মনে মনে এই ভেবে চরম খুশি হলেন যে, তিনি তার কাজে সফলতা অর্জন করেছেন। দলের কাছে এখন তার সম্মান আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টির স্বরে বললেন, " ঠিক আছে দরবেশ সাহেব, তহলে দেখা হচ্ছে সামনের শুক্রবার।"

কথা শেষ করে আমানুল্লাহ সালাম দিয়ে হুজরাখানা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে হেটে দরজার কাছে যেতেই, পেছন আব্দুল দরবেশ গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেলেন,

"আমানুল্লাহ সাহেব!"

আমানুল্লাহর অন্তর কেঁপে উঠলো । এক অজানা ভয় তাকে জেঁকে ধরলো তিনি পেছন ফিরে আব্দুল দরবেশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তার চোখ বন্ধ।

"জি, দরবেশ সাহেব কিছু বলবেন?"

"আপনাদের আলোচনার মাকসাদ ভালো তো?"

আমানুল্লাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, আব্দুল দরবেশ হয়তো সবকিছু বুঝে গিয়েছেন। তিনি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললেন বললেন, "অবশ্যই মাকসাদ ভালো, জনাব।"

"তাহলে ঠিক আছে। আপনি এবার আসতে পারেন। আর হ্যা, একটা কথা মাথায় গেঁথে রাখুন। আমার কাছে কখনোই মিথ্যা দাঁড়াতে পারে না। সত্যের জয় অনিবার্য।" আমানুল্লাহ সৌজন্যমূলক হেসে দ্বিতীয় বার সালাম দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

বিকাল ৪ টা ৪১ মিনিট.....

আদিলের আজ প্রচণ্ড মন খারাপ। সেই সাথে সে বেশ চিন্তিত। তার মনের মধ্যে একটি কথাই ধাক্কা মারছে, আমার বাবার কাছ এসে বাইরের মানুষ জ্ঞান নিয়ে যায়। আর আমি কিছুই নিতে পারি না। মূলত নিতে পারি না বললে ভুল হবে। নিতে চাই তবে দেয়া হয় না। অবহেলা করা হয়। আদিল নিজের কক্ষে দরজা বন্ধ করে ভাবছে,

"আমি কি এতোটাই অপদার্থ নাকি? বাবা কেন আমার সাথে এরূপ আচরণ করেন!"

আজ আদিল বাইরে খেলতে যায়নি। যদিও সে যে খুব একটা খেলাধুলা করে এমনটি নয়। না খেললেও সে একবারের জন্য হলেও বিকালে বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে যায়। সে আসলে তার অন্য ভাই বোনদের মতো না। কিছুটা ভিন্ন। এই বয়সে তার ঠিক যেসব ব্যাপারগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, সে ঠিক তার উলটো পথের পথিক।

ঘড়ির কাটায় ৫ টা বেজে ৩০ মিনিট।

হাজেরা খাতুন দীর্ঘ সময় ধরে আসরের নামাজ শেষ করে তার কক্ষ থেকে বের হতেই খেয়াল করলেন আদিলের কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, আদিল এ সময় কক্ষে থাকে না। বাইরে খেলতে কিংবা হাটাহাটি করতে যায়। ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়লো কি না? এসব ভাবতে ভাবতে তিনি আদিলের কক্ষের দরজায় ধাক্কা দিলেন,

"আদিল! আদিল! ভেতরে আছ বাবা?"

ভেতর থেকে কোন প্রকার উত্তর আসলো না। হাজের খাতুনের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি আবার যখন ডাকতে যাবেন,

"আ...."

ঠিক তখনই আদিল ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হাজেরা খাতুন খেয়াল করলেন তার ছেলের মুখের চঞ্চল হাসি মলিন হয়ে গিয়েছে। মুখ মণ্ডলে কোন লাবণ্যতা নেই। কিছু সময় দরজা খুলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার পর কোন প্রকার বাক্যালাপ না করে বিছানায় গিয়ে একপাশ হয়ে শুয়ে পড়লেন।

হাজের খাতুন এগিয়ে গিয়ে আদিলের মাথার কাছে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

"বাবু, কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ?"

আদিলের কোন সাড়া নেই। খানিক সময় পরে গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলেন হাজেরা খাতুন। উনি দ্রুত আদিলকে শোয়া থেকে টেনে বিছানায় বসালেন। আদিলের চোখ লাল। চোখের পানি যেন থামছেই না। চোখের পানি দেখেই খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে যে এই পানি রাগের নয়, বরং প্রচণ্ড কষ্টের এবং অভিমানের। আদিল কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল,

"মা, আমি কি এতোটাই অপদার্থ!"

হাজেরা খাতুন আদিলকে থামানোর চেষ্টা করতে করতে বললেন,

"তা হবে কেন, বোকা! কী হয়েছে বল আমায়?"

আদিলের কান্নার আওয়াজ কিছুটা প্রশমিত হলো। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল,

"তাহলে বাবা আমাকে কিছু শেখায় না কেন? আমাকে তার কক্ষ থেকে চাকরের মত বের করে দেয় কেনো? তার ব্যবহার দেখে মনে হয় আমি তার কেউ না!"

হাজেরা খাতুন আদিলের কপালে চুমু দিয়ে বললেন,

"আচ্ছা, চিন্তা করিস না। তোর বাবাকে আমি বলে দিব। তোকে যেন সব শিক্ষা দিয়ে দেয়। তবে তিনি এই অনুরোধ রাখবেন কি না সেটা আমি বলতে পারছি না। কিন্তু, আমি আশাবাদী তিনি রাখবেন আমার কথা।"

"হ্যা, সেটাই!"

হাজেরা খাতুন আদিলের গাল টেনে বললেন,

"এখন আর পাকামো করতে হবে না। আমি দেখছি কী করা যায়। এখন যা, উঠে হাতমুখ ধুয়ে আয়। মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে। এরপর নাস্তা করে পড়তে বসবি।"

আদিল আর কোন বাক্যালাপ করল না। চুপচাপ বিছানা থেকে উঠে বাড়ির উঠানে কলঘরের দিকে হাটা দিলো।

রাত ৯ টা

ময়মনসিংহ সহিহ হাদিস আন্দোলন।

বড় বাজার।

আমানুল্লাহ অফিসে প্রবেশ করতেই তিনি বুঝতে পারলেন সবাই তার জন্যই অপেক্ষা করছেন। সংগঠনের সভাপতি নিজের চেয়ার থেকে উঠে দাড়ালেন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,

"আমানুল্লাহ কী খবর! আগেই আপনাকে বলে রাখি আমি কোন ব্যর্থতার বাণী শুনতে চাই না।"

আমানুল্লাহ মুচকি হেসে বললেন, "হে সম্মানিত নেতা এবং সেই সাথে আমার শিক্ষাগুরু! আপনার কি আমার উপর এতটুকুও ভরসা নেই?"

সভাপতি মহাসিন বললেন, "দেখেন আমানুল্লাহ সাহেব, এখন হেয়ালি করার সময় নয়। আমরা সবাই অত্যন্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সময় পার করছি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে প্রস্তুত হন বিতর্কের জন্য।"

সভাপতি মহাসিন খুশিতে আত্মহারা হয়ে আমানুল্লাহ কে জড়িয়ে ধরলেন। খুশীতে তার চোখে পানি চলে এলো। তিনি আমানুল্লাহর পিঠ চাপড়ে বলতে লাগলেন, "সাবাস, আপনার এই কাজই হয়তো হাশরের ময়দানে মুক্তির সোপান হিসাবে সাক্ষী দিবে। এ বিজয় আমাদের সকলের।"

মহাসিনের এতো প্রশংসার পরেও আমানুল্লাহ গম্ভীর। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই সফলতা যেন তার শরীরে কাঁটা হয়ে বিঁধছে। খানিক সময় পর মহাসিন

আমানুল্লাহর মুখভাব খেয়াল করে বললেন, "কী হয়েছে আমার বন্ধু। এই বিজয় লগ্নে আপনি এতো নিরাশ কেন?"

আমানুল্লাহ তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বললেন, "ভাই মহসিন, প্রস্তুতিটা ভালো করে নিয়েন। চূড়ান্ত বিজয় এখনো অর্জিত হয়নি। তাই আমার কাছে এখন উল্লাসের কোন অর্থ নেই!"

কথাটি বলে আমানুল্লাহ সবাইকে সালাম দিয়ে অফিস কক্ষ ত্যাগ করলেন। মহসিন আমানুল্লাহর এহেন ব্যবহারের কোন অর্থ খুঁজে পেলেন না। তিনি ব্যাপারটা সাদামাটা ঘটনা ভেবেই ছেড়ে দিলেন। খানিক সময় পর অফিসের অন্যান্য সদস্যদের বিদায় দিয়ে তিনি অফিস বন্ধ করে বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন।

মধ্যরাত

"চল তোমাকে একটা গল্প শোনাই", আগন্তুক।

"কিন্তু আপনি কে?"

"আহা! পরিচয় না হয় একটু পরেই জানলে। তাতে তো আর তেমন ক্ষতি নেই।"

"তা ঠিক আছে! কিন্তু আমি কোথায়? আর চারিদিকে এতো অন্ধকার কেন?"

"অন্ধকার দেখে তো এতো বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। এই মহাবিশ্বে আলোর পরিমাণ ঠিক কতটুকু, বলতে পারো?"

"দেখুন আমার এসব হেয়ালি ভালো লাগছে না। আর তার উপর আপনাকে এখন অব্দি আমি দেখতেই পারলাম না। কিসের মধ্যে, কোথায় আছি, সেটাও বুঝতে পারছি না!"

অট্টো হাসি দিয়ে তীব্র অন্ধকারের মধ্যে আমানুল্লাহর হাত কেউ একজন স্পর্শ করলো। আমানুল্লাহর শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। বুঝতে পারছিলেন এই হাতের ছোঁয়া তিনি পূর্বেও কোথাও পেয়েছেন। বড্ড পরিচিত হাত। তবে তিনি তা কোন ভাবেই ঠাহর করতে পারলেন না। হঠাৎ একটি মৃদু কণ্ঠ ভেসে এলো আমানুল্লাহর কানে।

"চলো আমানুল্লাহ যাত্রা শুরু করা যাক। আলো খুব নিকটেই। খানিক সময় হাঁটলেই আমরা আলোর কাছে পৌঁছে যাবো।"

আমানুল্লাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, এতো সময় যিনি কথা বলছিলেন, আর এখন যিনি আমার হাত ধরে আছেন দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। তাদের গলার স্বরে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। আমানুল্লাহ কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। এখন তার কাছে যে ব্যাপারটা মুখ্য তা হলো আলোর কাছে পৌঁছানো। কারণ, অন্ধকার তার বড্ড অপছন্দের এবং সেই সাথে ভয়ের কারণ। তিনি প্রশ্ন করার থেকে আগন্তুকের হাত

ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই বেশি যৌক্তিক মনে করলেন। শরীরে অত্যন্ত শীতল এবং মনোমুগ্ধকর মৃদু হাওয়া অনুভব করছিলেন। তিনি সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এমন সুন্দর শীতল যায়গা থেকে তিনি আর ফিরে যাবেন না। তবে একটাই সমস্যা জায়গাটি অন্ধকার। আমানুল্লাহ বেশ কিছু সময় ধরে আগন্তুকের হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছেন, কিন্তু অদ্ভুতভাবে আগন্তুকের আর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকার এতোটাই তীব্র যে আগন্তুক হাত ধরে থাকলেও তাকে কোনভাবেই দেখা যাচ্ছে না। তবে এটুকু আমানুল্লাহ আন্দাজ করতে পেরেছেন যে লোকটি বিশাল দেহী। প্রায় ১০ মিনিট অতিক্রম হয়ে গিয়েছে কিন্তু আগন্তুকের কোন সাড়া নেই। কিন্তু, আলোর কোন ছিটে ফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। আমানুল্লাহ অস্থির হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, আলো মনে হয় আর আসবে না। তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন,

"ভাইজান, আলো পেতে আর কতদূর?"

"এই তো আর কিছু সময়!"

"আপনি তো একটা গল্প শোনাতে চেয়েছিলেন? আলো আসতে আসতে গল্পটা বলে ফেলুন?"

"আহা! দেখেছ ভুলেই গিয়েছি। আচ্ছা, আপনাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করছি এতে আবার কিছু মনে করছেন না তো?"

"না, এতে কোন সমস্যা নেই। আপনি গল্পটা শুরু করেন।"

"বড্ড অস্থির তুমি! আচ্ছা শোন তবে। জবরুত নামে এক গ্রাম ছিলো।"

"জবরুত? এই রকম গ্রামের নাম তো আমি আগে কখনো শুনিনি!"

"আচ্ছা, শোননি যখন তবে এখন শোন। আর বেশি প্রশ্ন করো না আপাতত?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।"

"তো যা বলছিলাম, এই গ্রামে একজন খুবই দ্বীনদার ব্যক্তি বাস করতেন। যার নাম ছিলো মোল্লা ইনু। তিনি খুবই সহীহ ভাবে শরিয়তের প্রতিটি বিধান মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সেই সাথে অন্যদেরকেও তার মতানুসারী করার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতেন। তিনি তার এলমের শুদ্ধতা নিয়ে এতোটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি নিজেকে এবং তার মতানুসারী ছাড়া সবাইকে পথভ্রষ্ট হিসাবে মনে করতেন। এভাবেই তার জীবন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং অন্যদের নিজের দলভুক্ত করতে করতেই অতিবাহিত হতে লাগলো। হঠাৎ , তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন অগণিত মানুষের মাঝে। তিনি খুবই আত্মবিশ্বাসী। কারণ তার ঝুলিতে এতো পরিমাণ আমল রয়েছে, যা দ্বারা তিনি নিশ্চিন্তে পুলসিরাত পার করে ফেলবেন। খানিক পরে উনি এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করলেন - যেটা দেখার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দেখলেন যারা পৃথিবীতে সারা জীবন নাভির নিচে হাত বেধে নামাজ পড়েছেন তারা জান্নাতে প্রবেশ করছেন। অপরদিকে যারা বুকে হাত দিয়ে নামাজ আদায় করেছেন তারা জাহান্নামে পতিত হচ্ছেন। তিনি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়লেন। সেই সাথে তিনি রাগে ফেটে পড়ছিলেন। তিনি বুকে হাত বেধে নামাজ পড়ার হাদিসটি মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তা মনে করতে পারছিলেন না। এই প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে তিনি হঠাৎ খেয়াল করলেন যারা বুকে হাত বেধে নামাজ আদায় করছেন তাদের মধ্যেও অনেকে জান্নাতে প্রবেশ করছেন। অতঃপর মোল্লা ইনুর ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি খেয়াল করলেন তার শরীর অতংকে ঘেমে গিয়েছে। দ্রুত তিনি অজু করে জায়নামাজ পেতে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পরলেন।"

গল্প শেষ হতেই আমানুল্লাহ বললেন,

"এই গল্পের দ্বারা কী বোঝা গেল? আর যারা নাভির নিচে হাত বেধে নামাজ আদায় করেন, তারা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ তাদের তো নামাজই শুদ্ধ হয় না। আর, জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র চাবি নামাজ।"

আগন্তুক হাসলেন। এরপর বললেন,

"আচ্ছা, কিন্তু যারা নাভির উপর বেঁধে নামাজ আদায় করেন তাদের কাছেও তো পর্যাপ্ত দলিল রয়েছে। যেমনঃ

হযরত আলী (রাঃ) এবং অন্য সনদে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন- " নামাজে নাভির নিচে বাম হাতের উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে আবী শাইবাঃ ৩৯৬১, মুসনাদে আহমাদঃ ৮৭৫, দারকুতনীঃ ১১০২-১১০৩)

তাহলে এবার কী বলবে তুমি?"

"আমাদের কাছেও তো বুখারী শরীফের দলিল রয়েছে।"

"আমি কখন তা অস্বীকার করলাম। তুমি তো একটি ধরে আরেকটি ছাড়তে পারো না, তাই না?"

"পারি, কারণ আমার আমলটা বেশি সহীহ।"

"তারাও কিন্তু বলছে প্রমাণসহ তাদেরটা সব থেকে বেশি সহীহ। আর তারপরও তোমার যুক্তিটা মেনেও নেই যে তোমারটা বেশি সহীহ। তারপরেও কি তুমি বাকি হাদিসগুলোকে বাতিল বলতে পারবে?"

আমানুল্লাহ চুপ করে রইলেন। তিনি আবার পূর্বের ভাবনায় ডুব দিলেন। ভাবতে শুরু করলেন তিনি কোথায় আছেন এখন। আলো আর কতদূর। হঠাৎ অনুভব করলেন শীতল হাওয়া ক্রমশ উষ্ণতায় রুপান্তরিত হচ্ছে। আগন্তুকের গলা খানিক পরে আবার ভেসে এলো,

"কি হলো আমানুল্লাহ, জবাব দেও?"

আমানুল্লাহ কিছুটা বিরক্তির সূরে বললেন,

"কিসের জবাব! জবাব তো আপনার গল্পের মধ্যেই আছে। আমরা বাতিল হলে কি আমাদের দলের লোকেরাও জান্নাতে যেত নাকি? "

"ঠিক কিন্তু গল্পে তো এটাও ছিলো যে যারা নাভির নিচে হাত বেধেছে তারাও জান্নাতে যাচ্ছে। সেটার ব্যাপারে তোমার মতামত কী?"

আমানুল্লাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি কী উত্তর দিবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। গল্পটা আবার তিনি মনে করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি এই প্রশ্নের কোন উপযুক্ত উত্তর কিংবা কুল-কিনারা খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি ব্যর্থ হয়ে জবাব দিলেন,

"আমি জানি না, জনাব।"

আগন্তুক অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন। তার হাসির শব্দ আমানুল্লাহর কানে কাশার থালা পেটানোর মত তীব্র আওয়াজের মত লাগছিলো। শব্দে তার কান ফেটে যাচ্ছিলো। তিনি সহ্য করতে না পারে চিৎকার দিয়ে বললেন,

"দয়া করে আপনার হাসিটা থামান। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে মুক্তি দিন।"

হঠাৎ চারিদিকে নিস্তব্ধতা। আমানুল্লাহ খেয়াল করলেন তার হাত ধরে থাকা আগন্তুক তার পাশে নেই। বিচলিত হয়ে পরলেন তিনি। দিকহীন এই জায়গায় কী করবেন তিনি কিছুই ঠাহর করতে পারছেন না। শ্বাস-রুদ্ধকর আবস্থা। এদিকে শীতল হাওয়ার বদলে হালকা গরম হাওয়া প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। গলা শুকিয়ে আসছে আমানুল্লাহর।

হঠাৎ ক্ষিপ্র গতিতে এক কালো অবয়বের আবির্ভাব হলো। তিনি চমকে উঠলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

"আমাকে ছেড়ে দিন দয়া করে!"

আগন্তুক আবার তার হাত ধরলেন। তার হাতের স্পর্শে আমানুল্লাহ কিছুটা শান্ত হলেন। আগন্তুক বললেন,

"তুমি জানো উত্তরটা। তুমি বলছিলে না যে, নামাজ বেহেশতের চাবি?"

"হ্যা।"

"সমস্যা হচ্ছে কথাটা তুমি অর্ধেক জানো। সম্পূর্ণ হাদিসটা হচ্ছে- "নামাজ বেহেশতের চাবি আর নামাজের চাবি পবিত্রতা।" তুমি গল্পটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা

করলে দেখবে কিছু মানুষ বুক কিংবা নাভির নিচে হাতা বাধা সত্ত্বেও জাহান্নামে পতিত হচ্ছে। আবার উভয় দল থেকে জান্নাতে প্রবেশ করছে। এর অর্থ এই যে- হাত কোথায় সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বিষয় হলো " পবিত্রতা"। আর এই পবিত্রতা কিন্তু সাধারণ ওযু নয়। বরং নিজের কলবকে পরিশুদ্ধ করা। কারণ, সুদখোরও ওযু করেই নামাজ দাঁড়ায়। এবার বুঝতে পারলে কিছু?"

আমানুল্লাহ অনুভব করলেন। আশে পাশের পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। গরমের তীব্রতা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে আমানুল্লাহর পক্ষে তা আর সহ্য করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমানুল্লাহ এই অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে বলে উঠলেন,

"আমি আপনার কথা মানি না।"

সাথে সাথে তীব্র আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে গেল। সেই সাথে তীব্র উষ্ণতা। আমানুল্লাহ দেখতে পেলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই আগে দেখা কালো অবয়ব। তীব্র আলোর মাঝে কালো বস্তু বলতে শুধুমাত্র সেটাই। তবে তার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। আমানুল্লাহ ভাবলেন এটাই কি পাশে দাড়িয়ে থাকা আগন্তুক? আমানুল্লাহ'র কিছু ভেবে ওঠার আগেই কালো অবয়বটি ক্ষিপ্রগতিতে তার মুখের সামনে এসে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো-

"শোন! আমান তোর যা চিন্তাভাবনা এবং তা যদি ঠিকও হয়। তারপরও তোর জান্নাতে যাওয়ার সম্ভবনা কতটুকু বলতে পারিস?

হাশরের ময়দানে ৭২ টি কাতার হবে। এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই দল একমাত্র মুসলিমদের দল। এবার মুসলমানদের মধ্যে ৭৩ টি কাতার হবে। এরমধ্যে শুধুমাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে। এবার প্রশ্ন হলো তুই কোন কাতারে আছিস? মনে রাখিস সবাই সবার জামাতকে সহীহ আক্ষ্যা দিয়ে থাকে। সেই সাথে সবার কাছেই রয়েছে বস্তা ভরা দলিল।

"ভাব... আমানুল্লাহ! ভাল করে..... ভাব !..... কত বড় ধোকার মধ্যে আছিস.... একবার ভেবে দেখ! "

বিকট হাসির শব্দে আমানুল্লাহর কান ফেটে যাচ্ছে। শরীরের প্রতিটি পশমের গোড়ায় সুইয়ের মত ফুটছে। তীব্র যন্ত্রণায় আমানুল্লাহ কাতরাতে লাগলেন। হঠাৎ তার চোখ খুলে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। আশপাশে পাগলের মতো দৃষ্টি বাখতে লাগলেন। নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি ঠিক কোথায় আছেন। কিছু সময় পর বুঝতে পারলেন যে তিনি তার কক্ষেই আছেন। আমানুল্লাহ কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। অবশিষ্ট রাতটুকু তিনি নির্ঘুম অবস্থাতেই পার করে দিলেন।

ভোর - ৪ টা ৪৫ মিনিট

চারিদিক ফজরের আজানের সু-মিষ্ট ধ্বনিতে মুখরিত। ফজরের ওয়াক্তের নামাজ নিয়ে একটি হাদিস প্রচলিত আছে,

"ঘুম থেকে নামাজ উত্তম।"

তবে ফজরের ওয়াক্তে ঘুম থেকে ওঠা শুধুমাত্র হাদিস সম্মত এমনটি নয়। বিজ্ঞান মতেও সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা শরীরের জন্য খুবই ভাল। আজানের মৃদু ধ্বনী আলো-আঁধার পেরিয়ে আদিলের কান অব্দি ভেসে আসলো। সকালের এই আজানের ধ্বনি আদিলের খুব পছন্দের। যেখানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ফজরের নামাজ পড়ার জন্য রীতিমতো বকাঝকা করতে হয়, সেখানে আদিল নিজে থেকে ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠে ওযু করে নামাজ আদায়ের জন্য জায়নামাজ পেতে দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিদিনকার মত আজও তার কোন ভিন্নতা হলো না। তবে আজ আদিলের মধ্যে সেরকম প্রফুল্লতা নেই। নামাজ শেষে কিছু সময় দোয়া পাঠ করে সে পুনরায় বিছানায় তার শরীর এলিয়ে দিল। মাথার উপর ফ্যান চলছে। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধুমাত্র ফ্যানের পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আদিল এক দৃষ্টিতে পাখার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে আদিল ফ্যানের পাখা মিনিটে কতবার ঘুরছে তা গুনে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খানিক পরেই সে কিছুটা তন্দ্রাভাব অনুভব করল। বুঝতে পারল ঘুমের রাণী তাকে তার রাজ্যে ডাকছে। আদিল পাশ ফিরে শুতেই - অবাক! তার বালিশের পাশে একটি খাম। খামটি হাতে নিয়ে আদিল বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসল। বিছানার পাশে থাকা বেড সুইচটি অন করল। পূর্ণ আলো ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। আদিল দেখল এটি একটি কালো রঙের খাম। কিন্তু এটা আমার বিছানার পাশে কে রাখলো? অদ্ভুত! কারো রাখারও কথা নয়। কারণ, বাইরের কোন ব্যক্তি বাসায় আসলেও আমার কক্ষে তারা প্রবেশ করে না। আদিল চিন্তায় পরে গেল যে সে এখন এই খামটি নিয়ে কী করবে! প্রথমে বাবার কাছে নিয়ে যাবে নাকি নিজেই আগে খুলে দেখবে। বেশ দোটানায় পরে গেল আদিল। খানিক সময় খামটি হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ছন্নছাড়া চিন্তা-ভাবনা করতে করতেই হঠাৎ খামটি আচমকা ছিড়ে ফেলল। আদিল বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেল। কারণ, মনে মনে সে বদ্ধ পরিকর ছিল যে খামটা

সে বাবার কাছেই প্রথমে নিয়ে যাবে। কিন্তু, এখন কি বা করার আছে - খুলে যেহেতু গিয়েছেই সেহেতু ভিতরে কি আছে সেটা দেখাই উত্তম কর্ম হিসাবে বিবেচনা করল আদিল। আদিল খামের ভেতর এক সবুজ রঙের কাগজ দেখতে পেল। কগজের রঙটা দেখে কিছুটা অবাক হল আদিল। অদ্ভুত রঙ। এরকম রঙিন পেজ এই তল্লাটে পাওয়া যায় কি না তা নিয়ে আদিল বেশ সন্দিহান। আদিল আর সাত-পাঁচ না ভেবে সবুজ কাগজটি খাম থেকে বের করে তার ভাজ খুলতে লাগল। আদিল খেয়াল করল কাগজের প্রতিটি ভাজ খোলার সাথে সাথেই এক প্রকার সুগন্ধি নির্গত হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতিটা ভাজেই ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধ। পর্যায়ক্রমে ৬ টি ভাজ খোলার পরে আদিলের সামনে পুরো কাগজটি দৃশ্যমান হলো। আদিল এবার বুঝতে পারল এটা একটি চিঠি। কী অপূর্ব হাতে লেখা! লেখা দেখেই আদিলের মন জুড়িয়ে গেল। সেই সাথে অপূর্ব সুগন্ধি! এ যেন সরাসরি বেহেশত থেকে আসছে! এরকম সুগন্ধি এই অল্প জীবনে আদিল আগে কখনো পায়নি। আদিল অহেতুক চিন্তা থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে চিঠিটি পড়ার জন্য নিজের মন স্থির করল। শুরুতেই.....

প্রিয় আদিল,

লিপিকার শুরুতেই তোমার কৌতুহলী মস্তিষ্কের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। এই বয়সে কোথায় তুমি সারাদিন খেলাধূলা করবে, দুষ্টুমি করে সময় কাটাবে। তার পরিবর্তে তুমি এখন খুবই গভীর এবং ভয়ানক জিনিস নিয়ে চিন্তা করে সময় পার করছো। যাইহোক অহেতুক বক বক বাদ দেই কি বলো?

আমি জানি তোমার কাছে এসব ভণিতা আর ভালো লাগছে না। তোমার মনে এখন প্রেমের জোয়ার এসেছে। যে জোয়ারের ধাক্কায় উথাল হয়ে উঠেছে তোমার মনন জগত। আদিল ভালো ভাবে জেনে এবং মনের গহীনে গেঁথে রাখো, যে জগতে প্রবেশের জন্য তুমি পাগল হয়ে আছো তার প্রবেশদ্বারেই বড় অক্ষরে লেখা -

"ধৈর্য, স্থিরতা।"

তোমাকে আগে স্থির হতে হবে। তুমি এখন পাগল হয়ে রয়েছ এই জগত সম্পর্কে জানার জন্য। তবে প্রথমেই এটা মনে রাখা জরুরি যে এ জগতের পরিচিতি শুধুমাত্র শব্দ বা বাক্য দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি একগাদা শব্দ হয়তো শিখতে কিংবা জানতে পারবে। কিন্তু আদতে এসব জানা-বোঝা তোমার বাস্তব জীবনে কোন কাজে আসবে না।

একটা গল্প শোন-

দুই বন্ধু প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পুকুর পাড়ে গেলো গোসল করার জন্য। পানিতে না নেমে ঘাটে বসে একজন বললো-

"তুই আগে নেমে বল কেমন ঠান্ডা?"

বন্ধুর কথামতো নেমে গেলো তার বন্ধুটি। অতঃপর ঘাটে বসে থাকা বন্ধুটি তাকে জিজ্ঞাসা করলো,

"কি রে কেমন ঠান্ডা? "

বন্ধু প্রত্যুত্তরে বললো-

"ভীষণ ঠান্ডা রে! পানি সুইয়ের মত চামড়ায় বিধছে।"

ঘাটের উপরে থাকা বন্ধুটি বুঝতে পারলো পানি অনেক ঠান্ডা। অতঃপর সে আর নামলো না পানিতে। এখানে মুলত বোঝার বিষয় হচ্ছে বন্ধুটি পানি খুব ঠান্ডা এটা বুঝতে পারলেও তিনি এই ঠান্ডা কেমন তা কিন্তু জানতে পারেনি। এর স্বাদ সে গ্রহণ করতে পারেনি। সে কখনোই বুঝতে পারবে না যে ঠান্ডার স্বাদ ঠিক কেমন। তাই কোন কিছু জানার সাথে সাথে তা অনুভব এবং অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজন। প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে না পারলে এতো কথা, তত্ত্ব জ্ঞান সবটাই বৃথা যাবে। তবে প্রথম স্তরে তোমার মনকে শান্ত করার জন্য কিছু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হবে। চিন্তার গভীরে যেতে হবে। উত্তাল প্রেমকে প্রয়োগ করতে হবে সুনিপুণভাবে। আজকে তোমাকে আমি যে বিষয়ে অবগত করাবো তা হলো,

"আসল আর নকল কবরের পরিচয়"

আদিল চিঠিটি ভাজ করে ফেললেন। বিষয়বস্তু পড়েই তার মাথা ঝিমঝিম করছে। পরবর্তী অংশটুকু পড়ার মত মানসিক অবস্থা আর তার রইলো না। আদিল পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়ল। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল,

"কবর আবার আসল-নকল হয় কিভাবে?"

আদিল মনস্থির করল বেলা হওয়ার সাথে সাথেই বাবাকে এই চিঠি সম্পর্কে সে জানাবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, বাবাকে বলে লাভ কি? উত্তর তো উনি আমাকে কিছুই দেন না। এর থেকে বরং কাল সারাদিন বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে দেখি কিছু বের করতে পারি কি না। আর চিঠির পরবর্তী অংশ তো আমি এখনো পড়িই নি। হয়তো সেখানেই বিস্তারিত লেখা থাকতে পারে। এসব অগোছালো চিন্তা করতে করতেই আদিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পরল।

আব্দুল দরবেশের বাড়ির প্রাঙ্গণ আজ লোকে লোকারণ্য। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছেন তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে৷ বিবি হাজেরা বেগম নারীদের লাইন

সামাল দিচ্ছেন। অপরদিকে আদিল পুরুষদের। সবাইকে সারিবদ্ধ ভাবে দাড়ানোর নির্দেশনা দিচ্ছেন তারা। কারণ দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের খানিক পরেই নাস্তা দেয়া হবে। আব্দুল দরবেশের বংশের একটি রেওয়াজ হচ্ছে কেউ যেন খালি মুখে তার বাড়ির প্রাঙ্গন ত্যাগ না করেন। আদিলের বেশ বিরক্ত লাগে এসব কাজ করতে। সে মনে মনে বলে,

"ফ্রি চিকিৎসাও করাবো আমরা আবার ফ্রি খাওয়াবোও আমরা। বাহ্! কী সেবা!"

আদিল বুঝেই উঠতে পারে না যে এসব এক্সট্রা আদিক্ষেতার প্রয়োজনটা কী? আদিল শুধু এই ভেবে আক্ষেপ করে যে, স্কুলের পাশের সাধু যোগী জ্ঞান দিলেই হাদিয়া গ্রহণ করে। আর এদিকে আমার বাবা? সে এসব কান্ডের কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পায় না। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে আদিলে মা তাকে ডাকলেন,

"আদিল বাবা ভেতরে আয়, খাবারগুলো নিয়ে যা।"

"আসছি মা! ধ্যাৎ আর ভালো লাগে না! আবার কামলা খাটা শুরু। ৫০-৫৫ জনের খাবার পরিবেশনা করা কি মুখের কথা নাকি!"

এসব কথা বিড়বিড় করতে করতে সে ঘরের দিকে রওনা দিল। কিছুক্ষণ পর আদিল এবং তার বোন এক হাতে কিছু কলাপাতা এবং অন্যহাতে খিচুড়ির বালতি নিয়ে বের হয়ে আসল। পর্যায়ক্রমে আদিল পুরুষদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা শুরু করে দিল, অপরদিকে তার বোন মহিলাদের মাঝে।

সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিট

দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথি এবং ভক্তরা একে একে বাবার কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা খুলে বলতে লাগলেন। বাবা সবার সমস্যা একে একে সমাধান দিচ্ছেন। পুরুষরা সরাসরি বাবার দর্শন পেলেও মহিলারা পর্দার আড়াল থেকেই আব্দুল দরবেশের কাছে তাদের সমস্যা ব্যক্ত করেন এবং সেই সাথে বিশেষ দোয়া

গ্রহণ করেন। সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিট থেকে ১০ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত আব্দুল দরবেশ সকলের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান দিয়ে থাকেন। সপ্তাহের এই দিনটিতে সবচেয়ে বেশি খাটুনি যায় পরিবারের সকলের। এতো সব অতিথি এবং ভক্তদের নিয়ন্ত্রণ করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে আদিল এতো সব যন্ত্রণা সহ্য করে নেন শুধুমাত্র আব্দুল দরবেশের রোগী দেখার পরবর্তী সময়টার জন্য। কারণ, রোগীদের ঝাড়-ফুঁক দেয়ার পরের এক ঘন্টা ওয়াজ করে থাকেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে। ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। আদিল খুবই বিরক্তি অনুভব করছে। কারণ, লোকজনের সমস্যা কমছেই না। মনে হচ্ছে আজ ভক্ত- অতিথিদের পরিমাণ খানিকটা বেশি।

১ ঘন্টা পর.......

আজকের আবহাওয়াটা বেশ ভালো। হালকা মেঘলা যার ফলে মৃদু ঠান্ডা মিষ্টি বাতাস বইছে। উঠানে বিশাল জমায়তের সামনে একটি চেয়ার পাতা। পুরুষরা উঠানেই বসেছেন। আর মহিলাদের জন্য বাড়ির ভেতরে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভক্তগণ অধীর আগ্রহে বসে আছেন কখন দরবেশ ঘর থেকে বের হবেন।

আব্দুল দরবেশ হুজরাখানার মধ্যে তার আসন থেকে উঠে নিজের শরীরে পরিহিত জামা-কাপড় পরিবর্তন করে একটি সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবী এবং একটি খেজুরের পাতা দিয়ে বোনা টুপি পরে নিলেন। এরপর গায়ে কিছুটা আতর মেখে কক্ষ থেকে বের হয়ে উঠানে আসলেন। তাকে দেখতে পাওয়ার সাথে সাথেই উঠানে বসে থাকা উপস্থিত জনতা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সবার সালাম গ্রহণ করলেন। সকলকে হাত দিয়ে ইশারা করে যার যার জায়গায় আসন নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।। আব্দুল দরবেশ খুব ধীর গতিতে হেটে সবার সামনে রাখা চেয়ারে গিয়ে আসন গ্রহন করলেন। আর তার আসনের ঠিক পেছনে আদিল একটি বড় হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছন থেকে ধীর গতিতে বাতাস করছেন আদিল। সময় যতই সামনে গড়াচ্ছে আদিল কিছুটা অধৈর্য্য হয়ে যাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, বাবা ঠিক কখন কথা শুরু করবেন।

আব্দুল দরবেশ প্রথমেই উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

"এখন, আপনারা কেমন আছেন?"

উপস্থিত জনতা সবাই একসাথে উত্তর দিলেন,

"জি, বাবা ভাল।"

আব্দুল দরবেশ মাথা নেড়ে তাদের উত্তরের প্রতি মৌন সম্মতি প্রদান করলেন। এরপর আব্দুল দরবেশ মুচকি হেসে সবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন,

"এই যে আপনারা আমার কাছে আসেন, দোয়া নেন। বকবকানি শুনেন। এতে আপনাদের কি কোন লাভ হয়? আবার যারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসেন - তাদের কি আদৌ সমস্যা দূর হয়?

উপস্থিত জনতা চুপ। কেউ কোন উত্তর দিলেন না। সবাই বলতে গেলে এক প্রকার নীরবতা অবলম্বন করলেন। আব্দুল দরবেশ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খুব বেশি যে অবাক হলেন এমন নয়। তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, এসব ঝাড়-ফুক দিয়ে যে খুব বেশি উপকার হয় না। হঠাৎ উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন,

"বাবা, আমরা এখানে আসলে সুখ পাই। মনন জগত প্রশান্ত হয়। "

আব্দুল দরবেশ লোকটির কথা শুনে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন। তিনি তার হাসি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে বললেন,

"আপনি পুরোপুরি সত্য বলছেন না। এই কথার মাঝে মিথ্যার পরিমাণই বেশি সত্যের তুলনায়।"

আব্দুল দরবেশ লোকটিকে নিজের অবস্থানে বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি চেয়ারের পাশে রাখা পানির গ্লাস থেকে কিছুটা পানি পান করে বললেন,

"সুখ শব্দটি খুবই আপেক্ষিক একটি বিষয়। একটা গল্প বলি তাহলে-

এক শহরে দুটি পরিবার বসবাস করতো। একটি পরিবারের কর্তা ছিলো উক্ত শহরের মেয়র। এবং অন্য পরিবারের কর্তা ছিলেন সামান্য পৌরসভার কেরানী। উভয়ের ঘরে একটি করে ছেলে সন্তান ছিলো। এবং ভাগ্যক্রমে তারা একই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো। ছেলে দুটির নাম যথাক্রমে জুলকার এবং হামযা। হামযা ছিলো শহরের মেয়র-পুত্র। অপরদিকে জুলকারের বাবা ছিলেন সামান্য কেরানী। প্রতিদিন জুলকারের বাবা তাকে সাইকেল করে স্কুলে নিয়ে যেতেন। অন্যদিকে হামযার বাবা তাকে গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। এই দৃশ্য দেখে জুলকার প্রচণ্ড আফসোস করতো। আর মনে মনে ভাবতো, ইস! সেও যদি ঠিক এরকম গাড়িতে করে স্কুলে আসতে পারত। এরপর টিফিনের সময় জুলকার তার টিফিন বক্স খুলে দেখতে পেল, দুটো শুকনো রুটি এবং কিছুটা চিনি। অন্যদিকে হামযার টিফিনে সে লক্ষ্য করে দেখতে পেল অনেক দামি ফলের সমাহার। জুলকার আবার আফসোস করে বললো, ইস! এরকম খাবার যদি আমি টিফিনে পেতাম। কতই না সুখী হতাম আমি। জুলকার ভাবলো এই পৃথিবিতে সবচেয়ে সুখি আমি হতাম যদি এরকম দামি গাড়ি এবং সুস্বাদু খাবার থাকতো আমার কাছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল.....

জুলকার তার বন্ধুদের সাথে মেয়রের দোতালা বাড়ির নিচে খেলা করছে। হঠাৎ তার চোখ পরলো দোতালার বেলকনিতে। সে দেখতে পেলো হামযা গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জুলকার তৎক্ষনাৎ ভাবলো - ইস! এভাবে যদি দোতালায় দাঁড়িয়ে নিচটা দেখতে পেতাম কতই না মজা হতো। অন্যদিকে হামযা উপর থেকে জুলকারের দিকে দাঁড়িয়ে ভাবছে,

"ধ্যাৎ, কি ফালতু এক জীবন অতিবাহিত করছি। কোন মজাই নাই। ইস! যদি জুলকারের মত এভাবে ছোটাছুটি করে খেলতে পারতাম। সাইকেলে চেপে পেছনে বসে দুষ্টামি করতে করতে স্কুলে যেতে পারতাম। ধুর এটা কোন জীবন হলো!"

আব্দুল দরবেশ তার গল্প শেষ করে বললেন, "তাহলে এই গল্প থেকে কী বুঝলেন?"

আদিল সবার আগে পাশ থেকে বললো,

"তাহলে তো সুখ এক একজনের কাছে এক এক রকম।"

আব্দুল দরবেশ মাথা ঝাঁকিয়ে আদিলের কথায় সম্মতি দিয়ে বললেন-

"হ্যা, একদম ঠিক!"

এরপর জনতার দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

"এই ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে "সুখ" ব্যাপারটা কতটা আপেক্ষিক।"

ভক্তগণের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন,

"তাহলে এই পৃথিবীতে কেউই কি সুখি নয়?"

আব্দুল দরবেশ তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

"যে ব্যক্তি সুখ কী এই জিনিসটা বোঝেনি, তিনিই এই পৃথিবিতে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি।"

আব্দুল দরবেশ ভক্তের কথার উত্তর দিয়েই নিজের কক্ষের দিকে প্রস্থান করলেন। আদিল বাবার পিছু পিছু হাটা শুরু করলেন। ভক্তরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দরবেশকে মৌন সম্মান জানালেন। আব্দুল দরবেশ তার নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। অপরদিকে আদিল সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সকল ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

"আপনারা সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। আজকের মত তরবিয়তের সভা এখানেই সমাপ্ত।"

মধ্যরাত......

চারদিকে পিন পতন নীরবতা। আব্দুল দরবেশের বাড়ির সকলেই এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। শুধুমাত্র আব্দুল দরবেশ, তার স্ত্রী হাজেরা বেগম এবং পুত্র আদিল

অতীত। নিয়ম অনুযায়ী আদিলেরও ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু আদিল তার দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না। আদিলের মাথার পাশের সবুজ রঙের চিঠিটা, আজ সারাদিন চিন্তা করেও আদিল কিছুই তেমন বের করতে পারেনি। অবশ্য চিন্তা করার জন্য সুযোগও তেমন পায়নি। কারণ, সারাদিনই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তবে আদিল এটা ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছে যে-

আসল কবর এবং নকল কবরের বিষয়টা তাকে পূর্বের থেকে অনেকটা স্থির করে দিয়েছে। সে এক দৃষ্টিতে ঘরে লাগানো ৫০ পাওয়ারের লাল বাতিটির দিকে তাকিয়ে আছে। একগাদা এলোমেলো চিন্তা তার মাথায় ঝাঁক বেধেছে৷ তবে এতো সব এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটি প্রশ্নই সুস্পষ্টভাবে আদিলের মাথায় বার বার আবর্তিত হচ্ছে,

"চিঠির বাকি অংশটুকু কি তার পড়া উচিত? নাকি সে একটু বেশিই অস্থির হয়ে পড়ছে চিঠির বাকি অংশটুকু পড়ার জন্য।"

আদিল বিছানা থেকে উঠে তার পড়ার টেবিলের পাশের জানালাটা খুলে দিল। জানালা খুলতেই এক রাশ মৃদু হাওয়া আদিলেত শরীরকে শীতল করে দিলো। আদিল জানলার বাইরে তার দৃষ্টি রাখল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবে থেকে থেকে কিছু নিশাচর প্রাণীর ডাক শোনা যাচ্ছে বেশ ভালো ভাবেই। মিশ্র শব্দ। আদিল নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করল। ঘন অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চোখের ভাষা এমন, যেন সে অন্ধকারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হারিয়ে যাওয়া সুচের খোঁজ করছে। হঠাৎ, অন্ধকার ভেদ করে একটি মৃদু কণ্ঠ তার কানে ভেসে এলো। শব্দটি শুনতেই আদিল চমকে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলেন। আদিল থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় চলে গেল। তবে আদিল ভয়ে কাঁপছিল এমন নয়; বরং উত্তেজনায় কাঁপছিল। কারণ, শব্দটি ছিলো খুবই ভয়ানক এবং অর্থবহ-

"ইকরা"।

ভয়ানক হওয়ার কারণ এই শব্দটা তার বর্তমান সমস্যা নিরসনের জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান। আদিল মনস্থির করে ফেলল চিঠির বাকি অংশ পড়ার জন্য। সে চিন্তাই করল না- এটা কার কণ্ঠ কিংবা যিনি বলেছেন তিনি কে?

কারণ, আদিল চিন্তা করল এখন সবচেয়ে জরুরি এবং মুখ্য বিষয় হচ্ছে চিঠিটার বাকি অংশ শেষ করা। আদিল চোখ বন্ধ করে কিছু সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ করল। এবং আয়াতুল কুরসি ৭ বার পাঠ করে বুকে ফুঁ দিয়ে নিজের শরীর এবং কক্ষ বন্ধ করে নিল। আদিল বালিশের পাশে রাখা সবুজ চিঠিটি হাতে তুলে নিল। চিঠি খুলতেই আদিল খেয়াল করল, আগের লেখা যা ছিলো তা সব মুছে গিয়েছে-

"কি আদিল অবাক হলে কিছুটা! অবাক হওয়ার কিছু নেই। সব সময় মনে রাখবে, "অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে, তবে তা মনের মধ্যে গেঁথে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।" যাইহোক আজ সারাদিন চিন্তা করে কিছু বের করতে পারলে, আসল কবর এবং নকল কবরের পরিচয় কী?"

আদিল চিঠি পড়া থামিয়ে দিয়ে খানিক সময় চিন্তায় পড়ে গেলেন,

"এই চিঠি কিভাবে আমার মনের কথা জানে?"

আদিল এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আবার চিঠির দিকে মনযোগ দিলেন,

"আদিল পারিপার্শ্বিক চিন্তা এখন বাদ দেও। চলো তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই আসল কবর এবং নকল কবর কী? তার আগে তোমায় একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেই। চিঠির প্রতিটা লাইন খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং মনে রাখবে। কারণ, তোমার পড়া শেষ হলেই এসব লেখা সব মুছে যাবে। অর্থাৎ অতীত হয়ে যাবে। যাই হোক মন দিয়ে এবার শোন-

দেহটা তোমার। তুমি আর তোমার দেহ আলাদা। এক নয়। আবার তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে এই দেহের প্রয়োজন হয়। দেহের অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ তোমার প্রমাণও নেই। তোমার অস্তিত্বটি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দেহের

নামকরণ হয় "লাশ"। লাশ তৌহিদে বাস করে। তৌহিদে কোন শাস্তি থাকে না। তুমি যখন দেহতে থাকো তখন আর তৌহিদ থাকে না।

মূলত সত্য বলতে গেলে বলতে হয়- তোমার স্বাধীনতা আছে, তবে দেহের স্বাধীনতা নেই। দেহটি মুসলমান। মাটির গর্তটিও মুসলমান। সুতরাং জীবন্ত দেহটাই হচ্ছে একটা জীবন্ত কবর। জীবন্ত দেহের শাস্তি হয়। যেহেতু তুমি নেই, মাটির গর্তের শাস্তিও নেই। তাই তোমাকে বলতে চাই-

"জীবন্ত দেহটাই আসল কবর। মাটির গর্তটি রূপক কবর।"

রূপক কবরটি তোমাকে আসল কবর চিনতে সাহয্য করে। এর বেশি কিছু বলতে গেলে শরিয়তের বিধান আর থাকবে না। শরিয়তের ভাষায় মাটির গর্তটি কবর আর হাকিকি ভাষায় জীবন্ত দেহটাই নফসের কবর। কবরের এই রহস্য অনেকেই বুঝতে পারে না, জানতে পারে না এবং উপলব্ধিও করতে পারে না। শরিয়তি শয়তান একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে৷ আর হাকিকি শয়তান মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। শরিয়তি শয়তানকে শরিয়তি বিধান অনুযায়ী পাথর মারা যায় কিন্তু হাকিকি বা অন্তরের শয়তানকে কি পাথর মারা যায়? তবে এক হিসেবে এই অন্তরের শয়তানকে পাথর মারা যায়। কিন্তু তা বস্তুর বা পদার্থের পাথর নয়। এই পাথরগুলো হলো লোভ-মোহ নামক ছয় রকম পাথর। যা দিয়ে অন্তরের শয়তান কে আঘাত করা যায়। যারা এই হাকিকি বা অন্তরের শয়তানকে পাথর মারতে পেরেছে কেবল তারাই আল্লাহর অলি হয়েছেন।

আপাতত তোমার কাছে এসবের কোন অর্থই দাড়াচ্ছে না। সবকিছু প্যাচালো মনে হচ্ছে। কিন্তু এই প্যাচ খুলতে পারলেই সাধনার প্রথম দরজাটি তোমার জন্য খুলে যাবে। যা তুমি চাও তার কিঞ্চিৎ কাছে যেতে পারবে। মাথা ঠান্ডা কর। একটি দীর্ঘ শ্বাস নেও। এরপর শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর গতিতে একবার গ্রহণ কর এবং ছাড়। এক ধ্যানে বোঝার চেষ্টা কর তোমার দেহের এই আদান প্রদান। এটাই কিন্তু তোমার প্রাণ-পাখি। যা প্রতিনিয়ত আসছে-যাচ্ছে। এই বাতাসকে বোঝার চেষ্টা করো। শরীরের প্রতি অংশে এই বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে নিরন্তন। এই বাতাসকে অনুসরণ

করে দেহের প্রতিটা অংশে তুমিও বিচরণ কর। সেই সাথে খোজার চেষ্টা কর দেহ-কবর নিয়ে জটিলতার উত্তর। তবেই খুলে যাবে বন্ধ দুয়ারের তালা।

তোমাকে কিছু প্রশ্ন দিলাম। যেগুলোর উত্তর খুঁজে পেলেই এই আলোচনার জটিলতা কেটে যাবে-

১. দেহ কি?

২. তৌহিদ কি?

৩.দেহ কিভাবে মুসলমান হয়?

৪. আমাদের গন্তব্য কোথায়?

ইতি-

আগন্তুক

আদিল চিঠিটা বালিশের পাশে রেখে কক্ষের বাতি বন্ধ করে ঘুমিয়ে গেল। চিঠিটা পড়ার আগে আদিলের মাঝে যতটুকু উত্তেজনা কাজ করছিল তাও একদম চুপসে গেল চিঠিটা পড়ার পরে। কারণটা হয়তো আদিল নিজেও জানে না। সে চোখের পাতা এক করে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য স্থির করলেন। আর সেটা-

"নিজেকে জানতে হবে। চিনতে হবে। তবে তা অন্যের দৃষ্টিতে নয়। নিজের দৃষ্টি দিয়ে। আজ্ঞাচক্রের সাহায্যে।"

পরের দিন....

রাত ১১ টা ৫৭ মিনিট

চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারের এমনই অবস্থা যেন অন্ধকার অন্ধকারকে গিলে ফেলছে। ময়মনসিংহ পৌরসভার কোন ঘরেই এখন আর আলো নেই। পুরো

শহরের মানুষ আধমরা হয়ে আছে। শুধুমাত্র শহরের চৌকিদার ব্যতীত। চৌকিদারের অবস্থাও যে তেমন সরব তা কিন্তু নয়। তার অবস্থা কিছুটা ঘোড়ার মত। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত মানুষ। পুরো শহর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে এক টুকরো আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে আব্দুল দরবেশের হুজরাখানায়। চলছে এক বিশেষ সভা। যা চলবে ফজরের আযান অব্দি। সবসময় এই তালিমের ব্যবস্থা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তবে আজ উপস্থিত বাইরের দুজন ব্যক্তি। বাইরের বলতে আব্দুল দরবেশের খাস লোক। একজন সাবেক শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা জলিলুদ্দীন এবং সহীহ হাদিছ আন্দোলনের সদস্য যুবক আসাদ। এছাড়াও কক্ষে উপস্থিত আছেন আদিল, বিবি হাজেরা, রাজিয়া এবং মানসুরা। হুজরাখানার মাঝখানে একটি কুপি জ্বালানো। আবছা আলোয় সবার মুখের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সবাই নিশ্চুপ। এমন অবস্থা যে কক্ষে এখন একটি ছোট সুঁই পড়লেও তার শব্দ পরিষ্কার শোনা যাবে। সবার সামনে আব্দুল দরবেশ চোখ বন্ধ করে আছেন। শিরদাঁরা সোজা করে। তার শরীরের কোন অঙ্গই এক চুল নড়াচড়া করছে না। ঠিক যেন পাথরের পাহাড়। তবে তার ঠোঁট নড়ছে। গভীর জিকিরে মশগুল। সামনে বসে থাকা আসাদ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এবং মনের গহীন থেকে শুধুমাত্র একটি শব্দই তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসছে-

"সুবহান আল্লাহ"

এরকম আল্লাহ ওয়ালা মানুষ আসাদের চোখে আগে কখনো পড়েনি। এদিকে আদিল খুবই অস্থির হয়ে পড়েছেন- বাবার চোখ খোলার অপেক্ষায়। তার মন উত্তাল হয়ে আছে তালিম গ্রহণ করার জন্য। তবে রাজিয়া এবং মানসুরা এসব তালিম তেমন পছন্দ করে না। তালিম চলাকালীন সময় তারা নানা রকম ছুতো বের করতে থাকে সভায় উপস্থিত না হওয়ার জন্য।

১২ টা ১৩ মিনিট

হঠাৎ আব্দুল দরবেশের শরীর প্রচণ্ড গতিতে কেঁপে উঠলো। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন- পানি! পানি! বিবি হাজেরা ক্ষিপ্র গতিতে নিজ আসন

থেকে উঠে পানি আনতে হুজরাখানা থেকে বেরিয়ে পরলেন। অপর দিকে আদিল আব্দুল দরবেশের মাথার কাছে গিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। কক্ষে উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরা স্তম্ভিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে পরেছে। কী করবেন! বা ব্যাপারটা কী হলো! তারা কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। ইতিমধ্যেই বিবি হাজেরা পানির গ্লাস নিয়ে হুজরাখানায় প্রবেশ করলেন। আব্দুল দরবেশ ক্ষিপ্র নেকড়ের মত পানির পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বিবি হাজেরা বললেন-

"ধীরে জনাব! ধীরে! এখন ঠিক আছেন?"

আব্দুল দরবেশ ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসলেন। তিনি সবাইকে শান্ত হয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহন করতে বললেন। খানিক সময় বাদেই কক্ষের চিত্র স্বাভবিক হয়ে গেল। আদিল মনে মনে ভাবছে বাবাকে জিজ্ঞাস করবে কি না- তার ঠিক কী হয়েছিলো? কেনই বা তিনি এরকম কেঁপে উঠেছিলেন?

আব্দুল দরবেশ মৃদু স্বরে বললেন-

"আদিল, আমার কী হয়েছিলো সেটা এখন না ভাবলেও চলবে।"

আদিল কিছুটা হতভম্ব হয়ে উত্তর দিল- "ঠিক আছে বাবা।"

"তা আসাদ কি অবস্থা তোমার, বলো?"

"বাবা চুপ করে থাকা খুবই কঠিন। তবে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার মাথা মোটামুটি খালি করার চেষ্টা করেছি।"

আব্দুল দরবেশ দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বললেন-

"মোদ্দাকথা তুমি চেষ্টা করেছ। আসলে আদোতে আমরা শুধু চেষ্টাটাই করতে পারি। বাকি সবকিছুই মহান আল্লাহর আওতাধীন। যাইহোক, আজ তোমাদের এক বিশেষ বিষয়ে তালিম দেয়া হবে।"

যুবক আসাদ মৃদু কণ্ঠে বললেন-

"বাবা, কী বিষয়ে তালিম।"

"কলেমা।"

সবাই একসাথে বলে উঠলেন, "এটা তো আমরা আগে থেকেই জানি।"

আব্দুল দরবেশ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তরে দিলেন,

"না, জানো না। যা জানো তা শুধু শুনে মুখস্থ করেছ। কলেমা পড়া কিংবা মুখস্থ করার ব্যাপার নয়। বরং তা ধারণ করার বিষয়। আমরা জানি একবার কেউ কলেমা পাঠ করলে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। কিন্তু, ব্যাপারটা কি এতো সোজা?"

যুবক আসাদ বললেন,

"তাহলে এই বাক্যের রহস্য কী?"

"আসলে আমাদের মূল সমস্যা আমরা ধর্মের অধিকাংশ বাক্য, বিধি-নিষেধগুলোকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে ফেলি। কলেমার ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই একই কাজটি করেছি। জান্নাত পাওয়া কি এতো সহজ? বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন। ভেদ না জানলে হবে সর্বনাশ। তোমরা আজ আবার নতুন করে কলেমাকে জানবে। "মুসলমান" শব্দটির গভীরতা বুঝবে।"

রাজিয়া-মানসুরা এসব কথায় বেশি খানিকটা বিরক্তি অনুভব করছে। মূলত তাদের প্রচণ্ড ঘুম আসছে। অন্যদিকে আদিলের এমন অবস্থা যেন আশপাশে বজ্রপাত হলেও টের পাবে না। রাজিয়া এবং মানসুরা আদিলের এহেন অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসছে। আব্দুল দরবেশ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন,

"রাজিয়া, মানসুরা এখন মজা করার সময় নয়। তোমরা এখনো অপরিপক্ক। এই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাও।"

রাজিয়া এবং মানসুরা মুখ গোমরাহ করে সবাইকে সালাম জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন। আব্দুল দরবেশ পুনরায় তার আলোচনা শুরু করলেন,

"তো যা বলছিলাম, "কলেমা"। এই কলেমাই হলো রহস্যলোকে প্রবেশ করার প্রথম শর্ত। কলেমা ছাড়া তৌহিদের রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

তোমরা কি জানো -

"কলেমার চেহারা আছে,

কলেমার কণ্ঠ আছে, এমন কি

কলেমা নিজেই নিজেকে পাঠ করে।"

আব্দুল দরবেশের এহেন বক্তব্যের পর জলিলুদ্দীন, আসাদ এবং আদিল একজন আরেকজনের দিকে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করলো যেন তারা সকলেই সদ্য আকাশ থেকে মাটিতে ভূ-পতিত হয়েছে। তিনজনই সমস্বরে বলে উঠলেন,

"কিভাবে সম্ভব?"

আব্দুল দরবেশ তাদের এমন প্রতিক্রিয়া দেখে হেসে দিলেন। হাসতে হাসতে তিনি বললেন,

" কি বিবি হাজেরা, তোমারও কি একই প্রশ্ন নাকি?"

বিবি হাজেরা আব্দুল দরবেশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

আব্দুল দরবেশ,

"চলো তবে জানা যাক জীবন্ত কলেমার গল্প। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ", এই কলেমা এক রহস্য ভান্ডার। এটাকে ৫ ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই ৫ ভাগের মধ্যেই রয়েছে "ফানা" এবং "বাকা"। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই অংশটি হচ্ছে বাকা এবং মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ এই অংশটি হচ্ছে ফানা।

"বাকা" হচ্ছে চিরস্থায়ী, যাহার কোনদিন কোন পরিবর্তন নাই। I mean, its a fundamental truth.

অপরদিকে "ফানা" - পরিবর্তনশীল। যার কারণে মুহাম্মদ (সাঃ) দুনিয়ার নিয়মে পৃথিবীতে এসেছেন আবার দুনিয়ার নিয়মেই এই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কলেমার প্রথম অংশ- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই অংশটিকে আল্লাহ ৫ টি অংশে বিভক্ত করেছেন-

লা-ইলাহা-ইল্লা-আল্লাহ-হু

এই পঞ্চভাগই হলো কলেমার মূল বিষয় এবং রহস্য ভান্ডার। এই কলেমার পঞ্চভাগ দ্বারাই আরশ, কুরসী, লৌহ-কলমের প্রকাশ ঘটেছে। "লা" অর্থ "না" বা নাই। অর্থাৎ বস্তুবাদ। কলেমার প্রথম শব্দটিই বস্তুবাদকে নির্দেশ করে। "লা" কে ভেদ করতে পারলেই "ইলাহা"-র জগতে প্রবেশ করা যায়। এখন আমাদের জানতে হবে "লা" এর অবস্থান কোথায়?

লা- মূলত আমাদের দেহ তথা দেহের খায়েশ।"

পাশে থেকে জলিলুদ্দীন বললেন-

"বাবা, ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি না?"

"সব বুঝে যাবে, আগে আমাকে শেষ করতে দেও। অধৈর্য্য হইও না। লালন সাঁই এর পদ্যের দুটি লাইন বলি। এতে হয়তো তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে-

"লামে-আলিফ লুকায় যেমন,

মানুষে সাঁই আছে তেমন।"

আরবি হরফ লাম-আলিফ কে স্মরণ কর। স্মরণ করে কী পেলে? লামের মাঝে আলিফ। অর্থাৎ দেহের মাঝেই পরমের অবস্থান। এই "লাম" অর্থাৎ কলেমার "লা" কে ভেদ করতে পারলেই খোদা দর্শন। অর্থাৎ আত্মদর্শন। বস্তুজগত থেকে ভাবজগতে অর্থাৎ তৌহিদের জগতে সাধকের প্রবেশ ঘটবে। সর্বোপরি দেহ কে উপেক্ষ্যা করতে হবে। "লা" গঠিত হয় ৬ টি বস্তু দিয়ে।

১. লোভ

২. হিংসা

৩.কাম

৪. ক্রোধ

৫.মোহ

৬. পেটুকি

একটু ভেবে দেখ আমাদের দেহ-জগত এই ৬ টি জিনিস দ্বারাই গঠিত। আর আমরা সারাজীবন এরই গোলামি করে কাটিয়ে দেই। অর্থাৎ, ইহা স্পষ্ট "শিরক"। ইলাহার এবাদত না করে, নিজ দেহের চাহিদার এবাদত করা। এটাই প্রকৃত শিরক। এই শিরক ভেদ করলেই তুমি তৌহিদের রাজ্যে অবস্থান করবে। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান।

আদিল মৃদু কণ্ঠে বলল,

"তবে বাবা, দেহকে কি আদৌ উপেক্ষা করা যায়?"

আব্দুল দরবেশ হাসলেন এবং আদিলকে তার কাছে আসতে বললেন। আদিল কিছুটা ভীত হয়ে আব্দুল দরবেশের কাছে গেল। আব্দুল দরবেশ তার কপালে গভীর চুম্বন দিয়ে বললেন-

"তুমি সত্যিই আমার যোগ্য উত্তরসূরী হতে পারবে।"

আদিলের মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। আদিল বলল,

"কিন্তু, বাবা...... "

আব্দুল দরবেশ আদিলকে থামিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ে ডান হাতটি রেখে বললেন,

"এটা তোমার প্রশ্নের উত্তর নয়। এটাই তো বলতে চাচ্ছ, তাই না?"

"জি, বাবা।"

"দেহকে উপেক্ষা করার কোন রাস্তা নেই এটা ধ্রুব সত্য। তাই এই ইহলৌকিক জীবনে আমাদের হাসের ন্যায়ে থাকতে হবে।"

"হাস!"

"হ্যা! হাস! হাস যেমন সারাদিন পানিতে থাকলেও ঘরে যখন ফেরার সময় হয় কিংবা পানি থেকে ডাঙায় ওঠার পর তার শরীরে এক ফোটাও পানি থাকে না। ঠিক তেমনি দেহের সাথে আমাদের বসবাস করতে হবে। দেহের চাহিদার সাথেই আমরা বসবাস করব। তবে ঘর অর্থাৎ পরমের রাজ্যে প্রবেশ করার সময় সকল চাহিদা হাসের পানি পরিত্যাগ করার ন্যায় পরিত্যাগ করে প্রবেশ করতে হবে। আর তারজন্য প্রয়োজন কঠিন সাধনা। তোমাদের বলেছিলাম, কলেমার দেহ আছে, কথাও বলে। তাহলে "লা" যদি দেহ হয় এবার এটাকে ভেদ করলে ইলাহার দর্শন। তখন তোমার দেহ যে কথা বলবে তাই কলেমার কণ্ঠ।"

সবাই বিস্মিত হয়ে গেলো। কারণ এমন বাস্তবিক এবং প্রয়োগিক ব্যাখ্যা তারা আগে কখনো শোনেনি। যুবক আসাদ বললেন,

"বাবা, তাহলে কলেমার পরবর্তী অংশের কী ব্যাখ্যা হবে? আর সাধনার পথটিই বা কী?"

"সাধনার পথ কলেমার ২য় অংশেই বিদ্যমান। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পুরুষ নবী (সাঃ)। তাঁর দেখানো পথেই আমাদের সাধনা করতে হবে। তাঁরে বিনে তরী তার দিক খুঁজে পাবে না। আর দিকহীন তরীর কোন মূল্য আছে কি? সব সময় মনে রাখবে শরিয়তের আইন এবং জগত শুধুমাত্র "লা" অব্দি। অর্থাৎ বস্তুজগত অব্দি। ভাব রাজ্যে কোন আইন নেই। নেই কোন কুটিলতা। এখানে শুধু রয়েছে শুদ্ধতা এবং প্রেম। যেখানে আইন রয়েছে সেখানে প্রেম নেই। আর যেখানে আইন রয়েছে সেখানে প্রেম নেই। শরিয়তের হিসেব বাকিতে কিন্তু মারেফতের হিসাব সব সময় নগদে। যেমনঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ১৭ বছর ৩ মাস ১৫ দিন হেরা গুহায় ধ্যান করে নবুয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবুয়াত কিন্তু তিনি বাকিতে পাননি। তাই-

"কাবা ঘরে শরিয়ত,

এবং হেরা গুহায় মারেফত। "

লালন সাঁই বলেছেন-

"বাড়ির পাশে আরশি নগর,

সেথায় এক পড়শি বসত করে,

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।"

জলিলুদ্দীন বললেন- "বাবা, এই গানের অর্থ কী?"

"বাড়ি হচ্ছে দেহ। আর সেখানে বসবাসরত পড়শি হচ্ছেন পরম। দেহের খায়েশ পুরণ করতে করতেই আমরা তার দর্শন পাই না। ঐ সেই কলেমার শিক্ষা "লা" এর পরেই ইলাহার অবস্থান। সে যাই হোক আজ আমি তোমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বায়ত বদ্ধ করব। তোমরাই আমার পরবর্তী উত্তেরসূরী হিসাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ।"

কক্ষে উপস্থিত সবাই আব্দুল দরবেশের হাতে হাত রাখলেন। আব্দুল দরবেশ তার চক্ষু বন্ধ করিয়া কলেমা পাঠ করতে লাগলেন। উপস্থিত সবাই আব্দুল দরবেশের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলালেন।

বায়াতকার্য শেষ হতেই ফজরের আজান ধ্বনিত হলো।

শুক্রবার

কাশর জামে মসজিদ

জুম্মার নামাজ কিছু সময় আগে শেষ হয়েছে। আলোচনা করার জন্য উপস্থিত উভয় দলের লোকজন। আজ বেশ বড় বাহাস হতে চলেছে। আব্দুল দরবেশ মসজিদের বাম পাশে তার সঙ্গীদের নিয়ে বসেছেন। সঙ্গী বলতে মাত্র ৩ তিন জন। আদিল, আসাদ এবং জলিলুদ্দীন। অপরদিকে সহীহ হাদিছ আন্দোলনের সভাপতি মহসিন প্রায় বিশজনকে নিয়ে এসেছেন। তবে তার পাশে বসে আছেন সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ এবং পার্টির সাধারণ তিন সদস্য রফিক, মন্টু এবং ইলিয়াস। মসজিদের বাকি মুসল্লি বসে আছেন মিম্বরের সামনে। আলোচনা পরিচালনা করবেন মসজিদের ইমাম মকবুল মিয়া। তিনি উঠি দাঁড়িয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দু'পক্ষকে কিছু নিয়ম বলে দিলেন-

যেমনঃ দু'পক্ষেই ১৫ মিনিট করে সময় পাবে। এই সময়ের মধ্যেই যার যার বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। এবং কে সঠিক, কে বেঠিক, তা নির্ণয় করবেন মসজিদে উপস্থিত সাধারণ মুসল্লি।

দু'পক্ষই মাথা নেড়ে তাদের সম্মতি জানালেন। আদিল খুবই চিন্তিত আজকের আলোচনা নিয়ে। কারণ, প্রতিপক্ষের সামনে কিতাবের পাহাড়। এদিকে তাদের কাছে কিছুই নেই। আমানুল্লাহ রাতে দেখা স্বপ্নটি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তিনি খুবই অস্থির হয়ে সভাপতি মহাসিন কে বললেন- "নেতা খুব সাবধানে বুঝে কথা বইলেন।"

সভাপতি মহাসিন আমানুল্লাহর দিকে ঘুরে তাচ্ছিল্যের হাসি দিলেন। তার হাসিতেই ফুটে উঠছিলো তার দাম্ভিকতা। তিনি আমানুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আরে বোকা সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। বুদ্ধিতে না পারলে...... !"

ইমাম মকবুল সভাপতি মহাসিনের দিকে তাকিয়ে তার বয়ান শুরু করতে বললেন। সভাপতি মহাসিন তার বয়ান দিতে শুরু করলেন - "সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমরা এমন একটি পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি যেখানে- ইমান সকালে থাকলে দুপুরে গায়েব হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো এর কারণ কী? এর মূল কারণ

হলো বাংলার মুসলিমরা সহীহ হাদিছ তথা রাসূলের সুন্নাহ থেকে সরে গিয়ে গ্রহণ করেছে বস্তা ভরা বেদাতি আকিদাহ। যার সাথে রাসূল (সাঃ)-র রেখে যাওয়া ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সেই ধারাবাহিকতাই বাংলাদেশে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট একটি বেদাত হচ্ছে "পীরতন্ত্র"। যার কোন অস্তিত্ব রাসূলের যুগে ছিলো না। আর আল্লাহর রাসূল আমাদের বলে গিয়েছেন, কুরআন- হাদীস আঁকড়ে ধরার জন্য। এমন কোন হাদিস কি আপনি আমাদের দেখাতে পারবেন যেখানে বলা হয়েছে "পীর" ধরতে হবে। আর কুরআন হাদিসের কোথায় এই শব্দ রয়েছে। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোন সংযোগকারী থাকাই পরিপূর্ণ হারাম। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করবো না। আমি শুধু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই।"

আব্দুল দরবেশ চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। এরপর ধীরে ধীরে নিজের বক্তব্য রাখা শুরু করলেন-

"প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আসসালামু আলাইকুম। আমি এখানে আজ কে ঠিক আর কে ভুল তা প্রমাণ করতে আসিনি। আমাকে বলা হয়েছে আলোচনার কথা। তাই আমি আমার প্রতিপক্ষ ভাইদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবো। চলুন প্রথমে দেখে আসা যাক পীর সম্পর্কে কুরআন-হাদিস কী বলে।"

সভাপতি মহাসিন রাগান্বিত কণ্ঠে আব্দুল দরবেশ কে থামিয়ে বললেন- "চুপ করুন। এই শব্দ কুরআনে কিভাবে আসে? কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে না ইন শা আল্লাহ।"

আব্দুল দরবেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন- "জনাব, আমাকে আমার কথা বলতে দিন।"

ইমাম মকবুল মহাসিনকে কথার মাঝে কথা না বলার জন্য সতর্ক করে দিলেন।

আব্দুল দরবেশ, "হ্যা , যা বলছিলাম। চলুন দেখা যাক পীর সম্পর্কে কুরআন-হাদিস কী বলে?

হে রাসূল! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল। হে রাসূল! আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল। (সূরা ফাতহঃ ১৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ বাইয়াত বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পর তা রক্ষাকারী সম্পর্কে বলেনঃ

যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহ পাকের প্রিয়জন হবে। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৬)

সহিহ হাদীসে আছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রাসূল (সা) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সামর্থ্য উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

পীরে-মুর্শিদ বা ওলী ধরতে হবে, এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন পাকে বহু নির্দেশ বা ইংগিত আছে । তবে পীর শব্দটি পবিত্র কোরআন পাকে নেই। কারণ পীর শব্দটি ফার্সি ভাষা হতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমনঃ নামাজ, রোজা, ফেরেশতা, খোদা, ইত্যাদি শব্দগুলো কোরআন শরীফে নেই। কারণ উহা ফার্সি শব্দ, তবে এর প্রতিটি ফার্সি শব্দেরই প্রতিশব্দ কোরআন শরীফে আছে, যেমনঃ নামাজ-সালাত, রোজা-সাওম, ফেরেশতা-মালাকুন ইত্যাদি। আবার সালাত আরবি শব্দটি স্থান বিশেষে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ ভাবে পীর ফার্সি শব্দের প্রতিশব্দ পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছেন, যথাঃ 'অলি'

বহুবচনে আউলিয়া, মুর্শিদ, ইমাম, বহুবচনে আইম্মা, হাদি, ছিদ্দিকিন ইত্যাদি। এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত এখন আমি পেশ করবো-

হে মুমিনগণ! তোমরা অনুসরণ কর, আল্লাহ্ পাক এর, তাঁর রাসুল পাক (সাঃ) এর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর রয়েছে তাদের। [সুরা ৪ নিসা: ৫৯]

স্মরণ কর! সেই দিনকে যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাঁদের (ইমাম) ধর্মীয় নেতা সহ আহ্বান করব। [সুরা ১৭ বনী-ইসরাঈল: ৭১]

যারা তোমাদের ধর্ম মতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ করেন। আর এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা।নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। [সুরা ইমরান: ৭৩-৭৪] ।

অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত। [সুরা ইয়া-সীন: ২১]

যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। [সুরা ৩১ লুকমান: ১৫]।

অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা জানেন, তাদের নিকট হতে জেনে নাও। [সুরা ২১ আম্বিয়া: ৭]।

কিয়ামতের আগে মানুষ মুর্খতাবশত জ্ঞানহীন মানুষ এর কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।(আল-হাদিস)

তাই এমন কারো কাছ থেকে ইসলামকে জানার জন্য শিখার জন্য আল্লাহর হুকুম বা ইংগীত যাদের কাছে ইলমে লাদ্দুনি তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে খাটি জ্ঞান রয়েছে। আর ওলী তাদেরকেই বলা হয় যারা আল্লাহর বন্ধু, যাদের নিকট ইলমে

পাদ্দুনি রয়েছে। তাদেরকে না যারা নাকি শরীয়ত বিরোধী মুর্খ তাই এখানে বর্তমানে কামেল ওলীর চাইতে উত্তম আর কে হতে পারে যার কাছে সঠিক জ্ঞান পাবে, কারণ নবী-রাসূল- সাহাবাগণ তো এখন নেই।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (ছাদেকিন) সত্যবাদীগণের সঙ্গী হয়ে যাও। [সূরা তাওবা: ১১৯]।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের রহমত (মুহসিনিন) আউলিয়া কিরামগণের নিকটবর্তী। [সূরা ৭ আরাফ: ৫৬]।

আল্লাহ্ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন, সে সৎ পথ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি (আল্লাহ্) যাকে পথভ্রষ্ট করেন,

আপনি কখনও তাঁর জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। [সূরা কা'হফ: ১৭]।

সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর অলিগণের কোন ভয় নেই এবং তারা কোন বিষয় এ চিন্তিতও নহেন। তাঁদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে, আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন বা হের-ফের হয় না, উহাই মহা সাফল্য।[সূরা ১০ ইউনুস: ৬২-৬৪]।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় বা ওয়াছিলা তালাশ কর।" [সূরা ৫ মায়েদা: ৩৫]

"যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। [সূরা ১৯ মারঈয়াম: ৮৭]

জনাব মহাসিন, এরপরেও যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে তবে করতে পারেন। কিন্তু, জেনে রাখবেন, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখানোর পরও যারা কাফের, তারা ঈমান আনেনি। আমি চাই না আপনি তাদের দলভুক্ত হন।"

আব্দুল দরবেশের বয়ান শেষ হতেই। সামনে বসা মুসল্লিদের মধ্য থেকে কয়েকজন যুবক এলোপাতাড়ি ইট পাথর ছুড়ে মারতে শুরু করলেন - আব্দুল

দরবেশ এবং তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে। সেই সাথে চারদিক স্লোগানে মুখোরিত হলো- "আব্দুল দরবেশ মুশরেক, ভণ্ড! "

মুহূর্তের মধ্যেই যেন মসজিদে এক বিরাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। সবাই যে যেভাবে পারছে মসজিদ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন। মহসিন উঠে এসে আব্দুল দরবেশের বুকে লাথি মারলেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। বেশ কিছু ইট এসে পড়ল তার উপর। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটি জুতাও ছুড়ে মারলেন। ইটের আঘাতে তার কপাল কেটে রক্তক্ষরণ হওয়া শুরু করলো। আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। আদিল এবং আসাদ তাকে সামলে নিলেন। তাদের অবস্থাও আব্দুল দরবেশের মতোই। চোখে মুখে তীব্র ভয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে মসজিদের ইমাম মকবুল এবং সাথে কিছু মুসল্লি একত্রিত হয়ে আব্দুল দরবেশ এবং তার সঙ্গীদের মসজিদ থেকে নিরাপদ ভাবে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

রাত ৮ টা ৩৩ মিনিট

আব্দুল দরবেশ তার হুজরাখানায় বসে আছেন। পুরো বাড়িতে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। কেউই এ ধরণের কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আদিল বাসায় আসার পর থেকেই কান্না করছে। আব্দুল দরবেশ গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত। তার চোখ বন্ধ। তবে বন্ধ চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আব্দুল দরবেশ কিছুতেই তার মনকে শান্ত করতে পারছেন না। কারণ, আজকের ঘটনাটা তার জন্য

খুবই অপমানের। তার পুরো শরীর ক্রোধে ফেটে পড়ছে, এমনটা তো হবার কথা নয়! আব্দুল দরবেশ ভাবলেন, "লোভ-ক্রোধের সাগর তো আমি সেই কবেই পার করে এসেছি...... "

কী করা উচিত তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তিনি চোখ বন্ধ করে জিকির করতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই তার ক্রোধ কমছে না। অবশেষে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তিনি নিজ আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। খয়েরি পর্দা সরিয়ে কক্ষের জানালাটা খুলে দিলেন। হালকা বাতাসে তার চুলগুলো কেঁপে উঠলো। আব্দুল দরবেশ দেখলেন আকাশে বেশ সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় সবকিছু আলোকিত হয়ে আছে। তিনি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন,

"আমর ক্রোধ কি ভুল কিছু? "

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো, "না দরবেশ, ভুল কিছু নয়।"

আব্দুল দরবেশ চমকে উঠলেন, "কে? কে কথা বললো?"

"হে দরবেশ শান্ত হন! আমি আপনার খুবই পরিচিত সত্ত্বা। আপনার আদি থেকেই আমি আপনার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলাম। আপনি আর আমি অভিন্ন সত্ত্বা। .... "

আব্দুল দরবেশের মনে হলো শব্দটা তার পেছনে থেকে আসছে। তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। কেবল কক্ষের জমাট অন্ধকারে কার যেন অট্টহাসি শোনা গেল।

"কে আপনি? কী চান?"

"হে আব্দুল! এই প্রশ্ন কি তোমার কাছে এখন মুখ্য? নাকি অন্য কিছু..... "

আব্দুল দরবেশ চুপ করে রইলেন। তিনি কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। তার কি কোনো ভ্রম হচ্ছে?

আব্দুল দরবেশের মনে হলো কে যেন পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি কাওকে দেখতে পেলেন না। রিনিঝিনি শব্দে বুঝতে পারলেন আগন্তুকের পায়ে নূপুর। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তিনি শুনেছেন তার কণ্ঠ পুরুষালি। আব্দুল দরবেশ চমকে উঠলেন। ভীত কণ্ঠে আবারো জিজ্ঞাসা করলেন,

"আপনি কে?"

"শুনুন দরবেশ, আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি পুরুষ নাকি নারী। আমি সব। আমার মধ্যেই সব। আমিই আপনি, আবার আপনিই আমি। আপনার মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলছে তা নিভানোর সময় এসে গেছে। কী পেয়েছেন আপনি আধ বেলা খেয়ে না খেয়ে এত এবাদত করে? আজকের এই ভণ্ড উপাধি? শুনুন দরবেশ আপনি কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। আপনি পুরুষোত্তম। এই দুনিয়া আপনার জন্যই। আপনি চাইলে এই দুনিয়া আমি আপনার পায়ের নিচে এনে দিতে পারি। আপনি কি তা চান?...... "

"এসব কী বলছেন আপনি? আমার দুনিয়া চাই না। এর ভেতরের কোনকিছু আমার তেষ্টা মেটাতে পারবে না। আমার কেবল আখিরাত চাই।"

"তাহলে এতো সাধনা করে পেয়েছেন আখিরাত? দেখা পেয়েছেন আপনার কাঙ্খিত স্বর্গের? আপনি তো বলেন আপনি নগদে বিশ্বাসী! চলুন আপনাকে নগদের দেশে নিয়ে যাই। যাবেন আমার সাথে?........ "

"কোথায়......? "

আগন্তুক অট্টহাসি দিয়ে বললো, "দুনিয়ার জান্নাতে........ "

কিছুক্ষণ পর আব্দুল দরবেশ উপলব্ধি করলেন গায়েবি আওয়াজটা আর আসছে না। তিনি প্রথমে পুরো কক্ষ আয়াতুল কুরসি পড়ে বন্ধ করলেন। এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন আজ আর ধ্যানে বসবেন না। তিনি তার আসনের পাশে বিছানা করে শুয়ে পড়লেন। সকল চিন্তাভাবনা মাথা থেকে সরিয়ে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিতেই হুজরাখানার দরজায় টোকার আওয়াজ হলো।

আব্দুল দরবেশ বিরক্ত স্বরে বললেন, "কে?"

দরজার বাইরে থেকে একটি মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে এল, "শুনুন, জনাব.....!"

আব্দুল দরবেশ উপলব্ধি করলেন, কণ্ঠটা অপরিচিত। তাছাড়া বাড়ির কারো এ সময় হুজরাখানায় আসার কথা নয়।

"কি হে জনাব, খুলবেন না!" দরজার বাইরে থেকে আবার সেই আওয়াজ ভেসে এলো।

আব্দুল দরবেশ বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। তিনি দরজার কাছে যেতেই - দরজাটা খুলে গেলো। তিনি খুব অবাক হলেন। এমনিতে হুজরাখানার দরজাটায় কোনো ছিটকিনি নেই। যে কেউ চাইলে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু না বলে হুজরাখানার ভেতরে প্রবেশ করার দুঃসাহস পরিবারের কেউ কোনদিন করেনি। তবে কি বাতাস? কিন্তু শোবার আগে জানালাটা তো তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি সামনে তাকিয়ে দরজার বাইরে কাওকে দেখতে পেলেন না। বেশ বিরক্ত বোধ করলেন আব্দুল দরবেশ। মনে মনে ভাবলেন, এ কাজ নিশ্চয় রাজিয়া বা মানসুরার। তিনি তাদের কক্ষের বাইরে যেতেই দেখতে পেলেন তারা ঘুমাচ্ছে। বিবি হাজেরাও তাদের পাশে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবার আব্দুল দরবেশ অবাক না হয়ে পারলেন না । আজ তার সাথে এসব কী হচ্ছে! তিনি হুজরাখানায় ফিরে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিলেন। আজ রাতে আর ঘুম হবে না তার।

হুজরাখানার ভেতরটা অন্ধকার। প্রতিদিন আব্দুল দরবেশের সামনে জ্বলতে থাকা প্রদীপটা আজ কোনো অজ্ঞাত কারণে নেভানো। জানালায় ভারী পর্দা টানা, দরজাও বন্ধ। এমনকি ঘরের চারদিকে জ্বলতে থাকা মোমবাতিগুলোও আজ নেভানো। ফলে কালিগোলা অন্ধকারে চর্মচোখে কিছু দেখা দায়।

আব্দুল দরবেশ নিজ আসনে বসে তার চোখ বন্ধ করলেন। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি। তার মন শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সারাদিনে যা হয়েছে তা তিনি ভুলতে চাচ্ছেন । ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করলেন, কোন এক অজ্ঞাত শক্তি যেন তার সারা শরীরে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটাচ্ছে।

চোখ খুললেন তিনি। অন্ধকার....আব্দুল দরবেশের মনে হলো, এমন অন্ধকার বহু সহস্র শতাব্দী কোনো মানব চক্ষু দেখেনি। এ যেন সৃষ্টির আদি অকৃত্রিম অন্ধকার। নিজের ডান হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মৃদু হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে।

মনে মনে ভাবলেন, এমন অন্ধকার কেবল সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরই বিরাজ করে। তার মনে হলো তিনি এখন আর তার চার দেয়ালের ছোট্ট হুজরাখানার ভেতরে নন। অন্ধকার যেন গুড়িয়ে দিয়েছে তার চারদিকের গন্ডি। শুধু চার দেয়ালের গন্ডি নয়, আব্দুল দরবেশ উপলব্ধি করলেন তার শরীরও যেন ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে অন্ধকাবে। তার হাত,পা, মুখ, দেহ সবকিছুই অসীম অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অন্ধকারের মতো নিজেকেও এক অসীম নিরাকার সত্ত্বা মনে হচ্ছে। অন্ধের কাছে কি আকার আর নিরাকারের ভেদ নেই! এবার তিনি মৃদু শব্দ তুলে হেসে উঠলেন। "অন্ধকার মুক্তি দেয়।", বিড়বিড় করে বললেন।

"প্রত্যক্ষই অন্ধকার মুক্তি দেয়.... মুক্ত করে...মুক্ত করে মানবীয় সকল সীমা থেকে...স্বাদ দেয় অসীমতার... স্বাদ দেয় এই ব্রহ্মাণ্ডের...আহহ! সেই আদি পরম পবিত্র অন্ধকার....", একটানা বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি। যেন কোনো প্রাচীন মন্ত্র জপ করছেন। সময়ের সাথে সাথে তার সূরে পরিবর্তন আসা শুরু করলো। গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠলো তার কণ্ঠ। শক্তির প্রকাশে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো সারা শরীর।

কিছুক্ষণ পর অবাক হয়ে আব্দুল দরবেশ লক্ষ্য করলেন তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি। কণ্ঠ দিয়ে কিছু ছেড়া ছেড়া শব্দের টুকরো বের এলো।

কা....আ....ন....ই....

হুট করেই আব্দুল দরবেশের নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় লাগতে শুরু করলো। তিনি কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার কণ্ঠ যেন আর তার নির্দেশ মানতে চাইছে না। জিহবা যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার সাথে। তার মনে হতে লাগলো তার আসলে নিজের কোনো কণ্ঠ নেই। নেই কোনো দেহায়ব। তিনি এখন শূন্য... এক অনন্ত বিস্তৃত মহাশূন্য।

তিনি কিছুটা অস্থির অনুভব করছেন। তার মনে হচ্ছে, তিনি আর কোনদিনই নিজের দেহ ফিরে পাবেন না, ফিরে পাবেন না নিজের কণ্ঠ। একসময় রাতে

মসজিদে তিনি কুরআন পাঠ করতেন। তার তেলাওয়াত শুনে মসজিদের বড় হুজুর বেশ প্রশংসা করেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি কুরআন পাঠ করতে নিলে আশেপাশের সবার তেলাওয়াত থেমে যেত। সবাই মুগধ হয়ে শুনতো তার সেই অপার্থিব সুর। যেই সুরের জন্ম এই রক্তমাংসের পৃথিবীতে হওয়া কিছুতেই সম্ভব না।

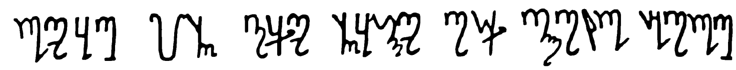
চোখের জলের রেখা গালে এসে পৌঁছাতেই এক স্বস্তির পরশ খেলে গেল আব্দুল দরবেশের শরীরে। গালের উষ্ণ অনুভূতি তাকে জানান দিচ্ছে তার নশ্বর শরীরের অস্তিত্বের কথা। সাতপাঁচ না ভেবেই আবার কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি। কণ্ঠ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না।

চারদিকের এই অসহ্য যন্ত্রণাময় নিস্তব্ধতা যেন গ্রাস করে ফেলবে আব্দুল দরবেশকে। অন্ধকার যেন সুচের মতো চোখে বিঁধেছে তার। হাত পা নাড়ানোর চেষ্টা করলেন, নড়ছে না। কেবল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুধারার ইষৎ উষ্ণ অনুভূতিটা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই যেন কাজ করছে না তার দেহে। এক অসীম ক্ষমতাধর সত্তার ইশারায় তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন একের পর এক কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে।

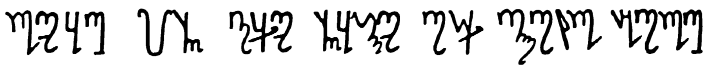
এভাবে কতক্ষন কেটে গেছে জানেন না তিনি। এক মিনিট? এক ঘন্টা? এক বছর? নাকি এক সহস্র শতাব্দী? জানেন না আব্দুল দরবেশ। তিনি কেবল জানেন এই ছোট্ট কামরাটায় প্রাচীন কোনো নিয়ম অনুসরণ করে সময়ের হিসাব থেমে গেছে।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক মন মাতানো সুগন্ধি আব্দুল দরবেশের মনোযোগ কাড়লো। কিসের গন্ধ এটা? জাফরান? কর্পূর? কিছুটা মৃগনাভির মতো....

সুগন্ধিটা ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। কেমন যেন এক অদ্ভুত ঘোরময় অবস্থা তার চারদিকে। কথা বলতে চাইলেন আবার। এবার আর কোনো শক্তি তাকে বাধা দিলো না।



অবাক হয়ে গেলেন আব্দুল দরবেশ। এই শব্দগুলো তো তার নয়। হ্যা... কণ্ঠটা অবশ্যই তার। কিন্তু তিনি এটা বলতে চাননি। আবার মুখ খুললেন তিনি,



বিস্ময়ে হা হয়ে গেল আব্দুল দরবেশের মুখ। এটা তার কথা না। তিনি এটা বলতে চাচ্ছেন না। মানবীয় অনুভূতিগুলো আবার একটু একটু করে ফিরে আসছে তার ভেতর। ভয় পেলেন তিনি, প্রচণ্ড ভয়।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মনে মনে ভাবলেন। "হে সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের শেষে বিরাজমান শক্তি...রক্ষা করুন!"

হিহিহি...মিষ্টি রিনিঝিনি কণ্ঠে কে যেন হেসে উঠলো। ঝট করে মাথা ঘোরালেন আব্দুল দরবেশ। ঘরটা অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। এ সময় তার ঘরে কোনো মেয়েছেলের থাকার কথা না। হাসিটা যে কোনো অল্পবয়স্ক মেয়ের তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আবার পুরো ঘরময় চোখ বোলালেন তিনি। কোনো একটা গোলমাল আছে। ধরতে পারছেন না তিনি। আরো মনোযোগ দিয়ে ঘরের প্রতিটি কোণার অন্ধকার খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ করেই অসঙ্গতিটা তার চোখে ধরা দিলো।

ঘরের উত্তর দিকটা অন্যান্য অংশের চাইতে কিছুটা আলোকিত লাগছে। ক্রমেই বেড়ে উঠছে সেই আলো। কিছু একটা আছে ঘরের এই দিকটায়। শূন্যে ভাসছে জিনিসটা। সেটা থেকেই ধীরে ধীরে আলো ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে।

হিহিহি..কাঁচ ভাঙার মতো আবার সেই রিনিঝিনি মন মাতানো হাসি। ঘরের কোণের জমাট আলো এখন বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে ছোট্ট ঘরটা।

আব্দুল দরবেশ লক্ষ্য করলেন আলোর উৎসটা এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ক্রমাগত আকার পাল্টাচ্ছে সেটা। যেন...যেন বিশেষ কোন কিছুর আকৃতি নেয়ার চেষ্টা করছে...! আব্দুল দরবেশ জানেন সেই মন মাতানো হাসির উৎস তার সামনে থাকা এই অজ্ঞাত আলোর পিন্ড। কী এটা!

আব্দুল দরবেশের বিস্ফোরিত চোখের সামনে পিন্ডটা ধীরে ধীরে একটা পরিপূর্ণ মানব ভ্রূনের আকার ধারন করলো। একটি আলোকিত মানব ভ্রূন শূন্যে ভাসছ। তার নাভি থেকে ফোটায় ফোটায় তরল মেঝের উপর ঝরে পড়ছে। দেখতে দেখতেই ভ্রূনটা একসময় শিশু এবং শিশু থেকে কিশোরী হয়ে উঠলো।

আব্দুল দরবেশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো কিশোরীটি। শূন্য থেকে তার পা নেমে এলো ঘরের মেঝেতে। তার নগ্ন শরীর ঠিকরে বের হচ্ছে সোনালী দ্যুতি। আলোর তীব্রতায় মেয়েটার দিকে ঠিক মতো তাকাতে পারলেন না আব্দুল দরবেশ।

"কেমন আছেন বাবা?"

"ক..কে আপনি?"

"আপনি জানেন না আমি কে? আপনিই তো মাত্র আমাকে স্মরণ করলেন। আমি তাই তো এলাম...", আহ্লাদী সুরে কথাগুলো বলেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। সেই হাসি তীক্ষ্ণ আবার একই সাথে মিষ্টি।

আব্দুল দরবেশের ভুরু কুঁচকে উঠলো। জাফরান এবং মৃগনাভির ঘ্রাণটা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। মাথা ঝিমঝিম করছে তার।

মেয়েটা ছন্দময় গতিতে এগিয়ে এলো তার দিকে। মেয়েটার শরীরে আলোর তেজ এখন কিছুটা কমে এসেছে। কিছুটা মোলায়েমও লাগছে তাকে। আব্দুল দরবেশ এবার ভালো করে লক্ষ্য করলেন তার দিকে।

যতই দেখলেন তিনি ততই অবাক হলেন। শিল্পির আঁচড়ে গড়ে তোলা এক নিখুঁত মূর্তি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটার সরু কপালের ছায়ায় টানা টানা গাঢ় নীল চোখ দুটোতে যেন খেলা করছে এক সাগর দুষ্টামি। টিকালো নাকের নীচে রক্তাভ ঠোঁট দুটোতে কমনীয় হাসি। সরু গলা এবং মসৃন পিঠ ছাড়িয়ে নিতম্ব পর্যন্ত নেমে এসেছে আগুন-রঙা চুল। গাল দুটো যেন আদমের সেই নিষিদ্ধ ফল যার জন্য সেদিন সে নিজ ঈশ্বরকে তুচ্ছ করতেও দ্বিধা করেনি। লম্বা হাত জোড়ায় সোনার কাঁকন। সরু আঙ্গুলগুলোতে রং বেরঙের আংটি। আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে সেগুলো। মেয়েটার সুগঠিত সুটোল স্তন জোড়ার দিকে দৃষ্টি দিলেন আব্দুল দরবেশ। হালকা গোলাপি বৃন্তদ্বয়ে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। বসন্তের ছোট্ট সতেজ টিলার মতো স্তনযুগলের মাঝে বিস্তৃত দীঘির মতো মসৃন বুক। বুকের মধ্যে কী যেন লেখা। আব্দুল দরবেশ পড়তে পারলেন না। তিনি সেই চেষ্টাও করলেন না। তিনি অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন মেয়েটার গভীর নাভি থেকে চুইয়ে পড়ছে গাঢ় সোনালী রঙের তরল। আর ঠিক তার নিচেই তুলির আঁচড়ে এঁকে দেওয়া পায়ে সোনালী নুপুর। সুগঠিত উরুদ্বয় এবং এর মাঝে লুকিয়ে থাকা সেই নিষিদ্ধ স্বর্গ। আদমের আদি এবং একমাত্র নির্ভরতার স্থান, ভাবলেন তিনি।

আব্দুল দরবেশ কিছুতেই চোখ সরাতে পারছেন না এই রহস্যময়ী নারী থেকে।

তিনি বুঝতে পারছেন তার মধ্যে এক অদমনীয় শক্তি জেগে উঠছে। তিনি যেন ফিরে গেছেন তার তারুণ্যের দিনগুলোয়। "এই অশরীরীর কাছে হিতাহিত জ্ঞান হারানো যাবে না", নিজেকেই শুনালেন তিনি। তাতে লাভ কিছু হলো বলে মনে হয় না। তিনি এখনো স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন তার ভেতরে বাড়তে থাকে উত্তেজনা। বহুদিন তিনি এমন কিছু অনুভব করেননি।

মেয়েটি নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল আব্দুল দরবেশের কপালের ঠিক মধ্যভাগে স্থাপন করলো। মেয়েটার হাত থেকে এক টুকরো আলো প্রবেশ করলো আব্দুল দরবেশের কপালে।

আহহহ... আবেশে চোখ বুজলেন তিনি। এক অবর্ণনীয় অপার্থিব সুখ তার সারা শরীরকে শিথিল করে দিলো। আব্দুল দরবেশ বুঝতে পারলেন, এই সুখের উৎস কিছুতেই এই মাটির পৃথিবী হতে পারে না।

হঠাৎ কেঁপে উঠলো মেয়েটার শরীর। তার থেকে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালো সে। মায়াময় ডাগর চোখে তাকালো আব্দুল দরবেশের দিকে। সেই দৃষ্টিতে খেলা করছে কামনা। সেই সাথে ফুটে উঠছে উদ্ধত অহংকার।

মেয়েটা আহবান করলো তাকে। আব্দুল দরবেশ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়েছেন। তার চোখের সামনে মেয়েটা ধীরে ধীরে তার উরুজোড়া পরস্পর থেকে দূরে যেতে লাগলো। এক মন মাতানো আদিম গন্ধে ভরে উঠলো ঘরটা। আব্দুল দরবেশ জানেন এটা যৌনতার ঘ্রাণ। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সঞ্জীবনী এই ঘ্রাণ। মেয়েটার দুই পায়ের মাঝের রহস্যটা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে লাগলো তার সামনে। এ এমন এক নিগূঢ় রহস্য যার কোনো ভেদ আজ পর্যন্ত এই মাটির পৃথিবীর কেও পায়নি। হাঁটু গেড়ে বসলেন আব্দুল দরবেশ। সেজদায় মাথা নত করলেন সেই রহস্যের কাছে। "আমাকে গ্রহণ করুন!", কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

শব্দ করে হেসে উঠলো সেই অপার্থিব সত্ত্বা।

"এসো....", আহবান করলো আব্দুল দরবেশকে। নিজের শরীরে আসুরিক শক্তি এবং তেজের আভাস পেলেন তিনি। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই নারী অবয়বের উপর। নিজের পুরুষত্বে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। খামচে ধরলেন মেয়েটার নরম তুলতুলে পিঠ। নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠলো সেটা। কামড় বসালেন স্তনবৃন্তে। মাখনের মতো স্তনবৃন্ত থেকে গড়িয়ে পড়লো তাজা রক্ত। বুকের মাঝখানের লেখাটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "আব্দুল দরবেশ"।

অশরীরীর ঠোঁটজোড়া কামড়ে ধরলেন তিনি। কামড় বসালেন ঘাড়, বুক, পেটে। লক্ষ্য করলেন মেয়েটার নাভি থেকে এখনো গড়িয়ে পড়ছে সোনালী তরল। নাভিতে জিহ্বা বুলাতেই তিনি বুঝতে পারলেন এটা কী। মধু। মেয়েটার নাভি থেকে নির্গত হচ্ছে সুমিষ্ট মধুর নহর। তিনি জিহ্বা বুলাতে লাগলেন মেয়েটার পেটে, নাভিতে এবং তারপর আরোও নীচে....

নিজের অস্তিত্ব মেয়েটার মাঝে স্থাপন করতেই তীব্র চিৎকার করে উঠলো সে। মেয়েটা কুমারী, বুঝতে পারলেন তিনি। একটু বেশিই যেন অপরিপক্ব। সতিচ্ছেদ হতেই হুজরাখানার মেঝে রক্তে ভেসে গেল। আব্দুল দরবেশ বুঝতে পারলেন মেয়েটার বয়স নিতান্তই কম। কিন্তু তিনি থামলেন না।

নিজের উপর বহু আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন তিনি। তার বহু বছর ধরে তৃষ্ণার্ত শরীরকে কিছুতেই ঠিক বেঠিক বোঝানো গেল না। ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো নিজের সম্পূর্ণ সত্ত্বা মেয়েটার ভেতর স্থাপন করার আগ পর্যন্ত থামা যাবে না কিছুতেই।

আদিম ছন্দময় গতিতে পুরুষ শরীরটা চলতে লাগলো নারী শরীরের উপর। মেয়েটার চিৎকার তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। হুজরাখানার দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুললো সেই আদিম ধ্বনি।

এভাবে কতক্ষন গেল জানেন না আব্দুল দরবেশ, কোথায় আছেন তাও জানেন না। শুধু জানেন এই আদিম খেলায় পুরো জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও আফসোস থাকবে না তার।

তার মনে পরে গেল সেই ঐশী নির্দেশের অংশ, "ইসলামে যা হারাম, তা কেবল পৃথিবীর জন্য। স্বর্গে অবশ্যই তার বৈধতা রয়েছে।" নির্দেশটা মনে পড়তেই মেয়েটাকে উল্টো করে আছড়ে ফেললেন আব্দুল দরবেশ। নিজের পুরুষাঙ্গ স্থাপন করলেন মেয়েটার পশ্চাদেশে। ইসলামে এভাবে সঙ্গম হারাম, জানেন তিনি। কিন্তু সেই নির্দেশ কেবলই পার্থিব পৃথিবীর জন্য। তিনি এখন এক অপার্থিব জগতে আছেন। নিজেকে নিজেই প্রবোধ দিলেন।

আবার চলতে লাগলো সেই আদিম উত্তেজনার ছন্দ। রক্ত বীর্য এবং যোনীরসে একাকার হয়ে গেল দুটো সত্বা। এবং একসময় ছন্দপতন ঘটলো। উঠে বসলেন আব্দুল দরবেশ।

মেয়েটা এখনো মেঝেতে শুয়ে আছে। তার মুখে তৃপ্তির হাসি। এখন আর তাকে ততটা সুন্দরী মনে হচ্ছে না। খুব সাধারন একটা নারী শরীর যেন। অন্য আর দশটা মেয়ের মতোই তার বিস্তার। শুধু বয়সটা যেন একটু বেশিই কম মেয়েটার।

"পান করুন মেয়েটার সতিত্ত্ব ভঙ্গের রক্ত। অবশ্যই তা আপনার জন্য কল্যাণকর। এই সঞ্জীবনী আপনাকে দান করবে নবজীবন।"

মুখ নামালেন আব্দুল দরবেশ। বা কোনো এক অপার্থিব শক্তি বাধ্য করলো তাকে মেয়েটার যোনিপথের সামনে নত হতে। তাতে মুখ দিলেন তিনি। এখনো সেখান থেকে তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। নহরধারায় ভেসে যাচ্ছে হুজরাখানার মেঝে। আব্দুল দরবেশ মুখ দিয়ে শুষে নিলেন রক্তটুকু। রক্ত, যোনিরস এবং বীর্যের এক অদ্ভুত স্বাদ মুখে লাগলো তার। তার মনে হলো এই পৃথিবীর যে কোনো সুরা এই মিশ্রনের সামনে তুচ্ছ। পাগলের মতো নিজের ভেতর তা শুষতে লাগলেন তিনি। মেয়েটার শরীরের সবটুকু রক্তই যেন শুষে নিবেন আজ।একসময় যেন নিঃশেষ হয়ে এলো সেই অমৃতধারা। হুজরাখানার মেঝেটা চেটে পরিষ্কার করলেন

আব্দুল দরবেশ। তিনি যেন আর মানুষ নেই। কোনো রক্তপিপাসু শ্বাপদে পরিণত হয়েছেন কিছুক্ষণেই।

মেয়েটার শরীরটা আর নেই। যেন হুট করেই হওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেটা। ঘরের চারদিকটা এখনো কিছুটা আলোকিত হয়ে আছে। সেই মৃদু নরম আলোয় চারদিকে তাকালেন আব্দুল দরবেশ। মেয়েটাকে খুঁজতে লাগলেন।

নাহ...কোথাও কেও নেই। হতভম্ভ হয়ে বসে রইলেন তিনি। তার দাঁড়ি থেকে চুইয়ে পড়ছে রক্ত আর যোনিরসের মিশ্রন। কেমন যেন এক ঘোরলাগা দৃষ্টি তার রক্তলাল দুই চোখে। ক্লান্ত শরীর নিঃশেষ হয়ে আসতে চাইছে। শরীরের শেষ শক্তিটুকুও যেন নিংড়ে নিয়েছে কেও। তার চোখের সামনের দৃশ্যগুলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার শরীর। অতঃপর পুনরায়....অন্ধকার....

চোখ খুলে তাকালেন আব্দুল দরবেশ। তার সামনের প্রতিদিনের মতোই ছোট্ট প্রদীপটি জ্বলছে। ঘরটি [illegible] আলোয় আলোকিত হয়ে আছে।

[illegible] তিনি! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। [illegible] পারলেন না। [illegible] তার [illegible]

[illegible]

[illegible]

রক্ত এবং যোনিরস মিশ্রিত আদিম এক স্বাদ। দাঁড়িতে হাত ছোঁয়ালেন তিনি। ভেজা। ঝটকা মেরে হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। রক্ত এবং যোনিরস মিশ্রিত তরল দেখা যাচ্ছে সেখানে.......

পানির পাত্রটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই বিবি হাজেরার মনে হলো কিছু একটা ঠিক নেই। আব্দুল দরবেশ নিজ আসনে গভীর ধ্যানে মগ্ন। প্রতিদিনের মতোই তার অস্তিত্বজুড়ে খেলা করছে এক প্রশান্তিময় অবিচলতা। তবে এই স্থির অবিচলতা হাজেরার মনের মধ্যে বরাবরই ভীতির সঞ্চার করে। যদিও দৃশ্যটা তার খুব পরিচিত। খুব খুব পরিচিত। আব্দুল দরবেশকে তিনি এভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখেছেন নিত্যদিন। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। কোথাও কিছু একটা যেন ঠিক নেই। প্রতিদিনের নিয়মের সুতোয় আজকে যেন একটা গিঁট পড়েছে।

বিবি হাজেরা হুজরাখানার চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন। বড় জানালাটা বন্ধ, তার উপর মোটা কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। নিশ্চিন্ত না হবার জন্য পর্দার কাপড়টি হাতে, আড়াল পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে তাতে। নিচে এই

ফকফকে আলোতেও সেই পর্দা হুজরাখানার ভেতরটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। কেমন এক গুমোট ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। বিবি হাজেরার মাঝে মাঝে মনে হয় এই ঘরে জমে থাকা বাতাসটা ভালো না।কেমন যেন অশুভ। যেন চিৎকার করে কিছু বলতে চায় ঘরটা। বাতাসগুলো যেন তাদের এই অনন্তকালের কারাবাস থেকে মুক্তি চায়।

প্রথমদিকে হুজরাখানায় প্রবেশ করা হাজেরার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনি যে এতে খুব একটা আপত্তি করেছিলেন তেমনটা না। এই হুজরাখানাটাকে শুরু থেকেই ভালো লাগে না তার। কেমন যেন অস্তিত্ব গ্রাস করা অশুভ অনুভূতি চারদিকে। ছোট্ট ঘরটায় প্রবেশ করলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। গা গুলিয়ে ওঠে বারবার। বিয়ের এত বছর পরও এই অনুভূতিটা প্রথমদিনের মতোই তীব্রভাবে গ্রাস করে তাকে। এই ঘরটার চারদিকে যেন ছোপ ছোপ অন্ধকারের বাস।

হাজেরার ইচ্ছা করছে এক ঝটকায় জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিতে। এই অপয়া জানালাটা খুলে দিলেই হয়তো যুগ যুগ ধরে ঘরে বসতি গেড়ে বসা এই অন্ধকারদের হাত থেকে মুক্তি মিলবে। ঘরটা শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়বে। কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন তা সম্ভব নয়। এই জানালা শুধু আব্দুল দরবেশ ছাড়া আর কারো পক্ষেই কোন দিন খোলা সম্ভব নয়।

বহু বছর আগের এক রাতের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। বাইরে সেদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশ যেন তার সমস্ত অস্তিত্ব উজাড় করে দিতে চাইছিল ধরণীর বুকে। আব্দুল দরবেশ সেদিন মসজিদে ছিলেন। সেসময় প্রায় রাতই তিনি মসজিদে কাটাতেন।

বাড়িতে সেদিন বিবি হাজেরা একা ছিলেন। বাচ্চারা তার মামার সাথে নানাবাড়িতে বেড়াতে গেছে। হঠাৎ-ই হুজরাখানার ভেতর থেকে কিসের যেন শব্দ ভেসে এলো। এক মনে গুনগুন করে গান গাইলে যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেরকম। বিবি হাজেরা শুরুতে শব্দটাকে ততটা গুরুত্ব দেননি। বৃষ্টির আওয়াজে প্রকৃতি নিজের বহু ছলচাতুরি লুকিয়ে রাখে। কিন্তু আওয়াজটা ক্রমেই যেন আরো

স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এক পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারলেন কেও গান গাইছে না, এক মনে কোনো মন্ত্র পড়ে চলছে। টেনে টেনে সুর করে কিছু আউড়ে যাচ্ছে। কেও একমনে কুরআন পাঠ করলে যেরকম মিষ্টি গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসে অনেকটা সেরকম। কেও কি কুরআন পড়ছে?

বাড়তে থাকা শব্দটা হাজেরা বেগমের ভেতর এক অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি করে। বহুবার নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেও তিনি শেষ পর্যন্ত হুজরাখানার ভেতরে প্রবেশ করেন। হয়তো এটাই তার জীবনের সব থেকে বড় পাপ ছিল......

"বিবি!" আব্দুল দরবেশের ভরাট গলায় বর্তমানে ফিরে এলেন হাজেরা।

"জি...", অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন।

"বিচলতা মানব মনের জন্য ক্ষতিকর। মন বড় রহস্যময় জিনিস। একে বিচলিত করলে আপনাকে আপনার স্বরূপ দেখাতে কখনো পিছপা হয় না।"

হাজেরার মনে হলো ঘরের তাপমাত্রা হুট করেই যেন কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল। ঘামতে শুরু করলো সে।

"জি?!" প্রশ্ন করলেন তিনি।

আব্দুল দরবেশ আলতো ভাবে হাসলেন, "আলোটা জ্বালান।"

চমকে উঠলেন বিবি হাজেরা। হুজরাখানার চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন। কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে ঘরটা। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করেছেন তখন মোমবাতিগুলো জ্বলছিল। হ্যা, স্পষ্ট মনে আছে তার! মোমবাতিগুলো জ্বলছিল!

কিন্তু এখন নেই। তিনি ভালোভাবে চোখ মেলে দেখলেন। একটা মোমও জ্বলছে না। পুরো ঘরটা আলোকিত হয়ে আছে এক অজানা স্নিগ্ধ আলোয়। কেও তাকে বলে দেয়নি, কিন্তু হাজেরা জানেন এই আলোর উৎস এই মাটির পৃথিবী নয়!

তার ভয় লাগতে শুরু করলো। তীব্র ভয়। কাঁপা কাঁপা হাতে দ্রুত মোমগুলো জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। ঘরটা এখনো আগের মতোই আলোকিত। স্নিগ্ধ কোমল

আলো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এই আলোর উৎস কি তার সামনে জ্বলতে থাকা এই মোমগুলো? তিনি জানেন না। বিবি হাজেরা এই উৎসকে জানতে চান না। এই হুজরাখানার ভেদ তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না।

তিনি কেবল জানেন এই ভেদের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অশুভ সত্ত্বা। বড় অন্ধকার, বড় পঙ্কিল সেই সত্ত্বা। যেই সত্ত্বার ঔরস একদিন এসেছিল তার গর্ভে!

গালে উষ্ণ নোনা জলের অস্তিত্ব অনুভব করলেন তিনি। নীরবে বেরিয়ে এলেন হুজরাখানা থেকে।

"বিচলতা মানব মনের জন্য ক্ষতিকর" বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন তিনি।

আব্দুল দরবেশ যখন চোখ খুললেন তখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। সূর্য সেদিনের মতো বিদায় জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার বিদায় উৎসবে আকাশে লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে।

হুজরাখানার ভেতরটায় অবশ্য এসবের কোনো চিহ্ন নেই। প্রতিদিনের মতো আজকেও তার ভেতরটা অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তিনি চোখ বোজার আগে বিবি হাজেরা মোমগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন তাদের বেশিরভাগই নিভে গেছে। কিছু মোম একদম নিঃশেষ হয়েও শেষ আলো ছড়াচ্ছে। তাদের টিমটিমে আলোয় হুজরাখানার ভেতরে এক ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আব্দুল দরবেশ উপলব্ধি করলেন আজ বেশ গরম পড়েছে। হুজরাখানার গুমোট পরিবেশে দমবন্ধ লাগছে তার। ইচ্ছা করছে জানালাটা খুলে দিতে। প্রাকৃতিক বাতাস এই গুমোট ভাব তাহলে অনেকটাই দূর হতো। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তার পরিবর্তে তাক থেকে কিছু মোমবাতি বের করলেন। পুরোনো মোমগুলোর

গলে যাওয়া অংশের উপর রাখলেন সেগুলো। এমনিতে দেখে মনে হয় মোমগুলোকে কোনো নিয়ম না মেনে ঘরের এখানে সেখানে জ্বালানো হয়েছে। কিন্তু অনেক দূর থেকে কেউ ঘরটার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারবে মোমগুলো একটি বৃত্তের আকারে সাজানো হয়েছে। বৃত্ত হচ্ছে অসীমের ধারক।

দূরের কোনো মসজিদে মুয়াজ্জিন মাগরিবের আজান দিলেন। আব্দুল দরবেশের কানে আজানের ধ্বনিটি কেমন অপরিচিত শুনালো। যেন বিজাতীয় ভাষার কতগুলো শব্দ তার কানে বাজছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল।

সেসময় আব্দুল দরবেশ প্রতি ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। কোন অবস্থাতেই নামাজ কাযা করতেন না। প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে তিনি সবার আগে প্রবেশ করতেন এবং কখনো কখনো সারা রাত সেখানেই কাটাতেন। আব্দুল দরবেশের বুক চিড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। মসজিদের সেদিনের ঘটনার পর থেকে তিনি মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সেই একটি ঘটনা যেন তার জীবনের মোড়কে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। তার জীবনের সবকিছুই বদলে গেছে। তখনের দিনগুলো কি এখনের তুলনায় ভালো ছিল?

গালে উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করতেই নিজেকে বেশ দুর্বল মনে হলো তার। সে যা করছে তা কি ঠিক? আল্লাহ কি তাকে সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছেন? নাকি এটা কোন ধরণের পরীক্ষা? হারাম কি কোনো অবস্থায় হালাল হয়? একজন মানুষ যেই মাকামেই থাকুক না কেন তার জন্য কি হারাম হালাল নির্ধারিত করা নেই? আল্লাহ কি এতটুকু স্পষ্টতা বান্দাকে প্রদান করেননি?

এরকম নানা প্রশ্ন তার মনে উদয় হতে লাগলো। তার মনে হলো কোথাও একটা ভুল করেছেন হয়তো। আল্লাহর পবিত্রতার সাথে এক হতে পারছেন না তিনি। কোথাও যেন একটা সুতো ছিড়ে গেছে।

বলা হয়, প্রতিটা বস্তু তার মূলের দিকে ধাবিত হয়। আব্দুল দরবেশও এখন তাই করলেন। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকলেন তিনি আল্লাহর কাছে।

"হে পরওয়ারদিগার! হে আমার স্রষ্টা! আপনি আমাকে সঠিক পথের দিকে ধাবিত করুন। হে অন্তরসমূহের মালিক! আমি অতি নগণ্য সৃষ্টি। আপনার পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার হয়নি। আমাকে আপনি সাহায্য করুন। সঠিক পথের দিশা দিন!"

হুট করেই আব্দুল দরবেশের ভেতরটা বেশ হালকা হয়ে এল। তার মনে হলো এখনো খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। তার হাতে এখনো ঠিক বেঠিকের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আছে। কিন্তু তা এক আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব না।

ট্রাংকটা আবার খুললেন আব্দুল দরবেশ। উপর থেকে কিছু জিনিস সরানোর পরে সেখানে সবুজ জায়নামাজটা দেখা গেল। এই জায়নামাজটা তার বহু বছরের সঙ্গী। বহু বছর ধরে তার সুখ দুঃখ সবকিছুর দুনিয়াবি সাক্ষী এটাই ছিল। এখন সেটা ট্রাঙ্কের এক কোণায় অযত্নে পরে আছে। আব্দুল দরবেশ হাত দিয়ে জিনিসটা স্পর্শ করলেন। এবার আর তিনি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন না। হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন। সাথে চললো স্রষ্টার প্রতি তার প্রাথনা:

"হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখান!"

হঠাৎ আব্দুল দরবেশের মনে হলো কেও যেন হুজরাখানার ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি জায়নামাজের উপর থেকে নিজের দৃষ্টি ফেরালেন। প্রথমে তার সামনে যেই লোকটা এসে দাড়ালো তাকে তিনি চিনতে পারলেন না। যখন চিনতে পারলেন তখন এক প্রবল আতংক ভর করলো তার উপর। তার সামনে যেই অবয়বটি দাঁড়িয়ে আছে তা তার পরিচিত। তার খুব খুব পরিচিত! এই নাক, এই কান, এই চুল, ঠোঁট সব তার পরিচিত! বহু বছর আগে যখন তিনি শেষবার আয়না দেখেছিলেন তখন ঠিক এই প্রতিবিম্বটাই ফুটে উঠেছিল আয়নায়।

আব্দুল দরবেশ নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন। তার সামনে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে আছেন! ভয়ের একটা শীতল স্রোত মেরুদন্ড বেয়ে নেমে গেল তার। পেটের ভেতর এক অদ্ভুত চাপ অনুভব করলেন। বুকের শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। মূর্তিটি আব্দুল দরবেশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। শান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি।

পৃথিবীতে সবথেকে ভয়াবহ দৃশ্য হলো নিজেকে দেখা। আমাদের মস্তিষ্ক কখনোই নিজের হুবহু অবয়ব তৈরি করতে চায় না। নিজেকে দেখার অর্থ হলো নিজের দোষ গুন, ত্রুটিগুলোকে দেখা। মানুষের পক্ষে নিজের মুখোমুখি হওয়ার চাইতে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর একটাও নেই।

আব্দুল দরবেশের মনে হলো তার চারদিকের পৃথিবী যেন দুলে উঠছে। প্রবল কাঁপুনিতে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ঘরের দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মনে হলো তিনি জ্ঞান হারাবেন।

এমন সময় অবয়বটি কথা বলে উঠলো, "ভয় পাচ্ছেন কেন আব্দুল দরবেশ? আমি কি আপনার পরিচিত নই?"

"ক....ক...এ...তুমি....?" কাঁপতে থাকা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আব্দুল দরবেশ।

"আপনি।", মূর্তিটি হেসে বললো। "আপনিই তো আমাকে ডাকলেন। আপনাকে পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছি আমি। আমি আপনার প্রভু কিংবা আপনার প্রতিকৃতি।"

আব্দুল দরবেশের কিছুটা রাগ হলো। অবয়বটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কথাটা ভাবার সাথে সাথেই গায়ের কাঁপুনিও অনেকটাই কমে আসলো তার ।

"আমি আপনি নই। এবং আমি আপনার থেকে কোনো সাহায্যও চাইনি", বললেন তিনি।

"কিন্তু আমিই আপনি! এবং আমিই আপনার প্রভু!"

"না।", প্রতিবাদ ঝরে পড়লো আব্দুল দরবেশের কণ্ঠে। "আপনি আমার প্রভু নন।"

"হাহা, ভুল করছেন দরবেশ।আমি আপনার প্রভু নই। আপনিই যেহেতু আমি তাই আপনি নিজেই নিজের প্রভু।"

আব্দুল দরবেশের মনে হলো সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তিনি উঠে বসলেন। "কেন এসেছেন এখানে আপনি?"

"আপনাকে পথ দেখাতে।"

"কে পাঠিয়েছে আপনাকে এখানে?"

"আপনার মালিক।"

একদম চুপ হয়ে গেলেন আব্দুল দরবেশ। তার কি এই অবয়বকে বিশ্বাস করা উচিত?

"দেখুন দরবেশ। আমি জানি আপনি আমাকে এখন বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। অচিরেই আপনার ভেতর বিশ্বাস আসবে। আপনি তখন বিশ্বাসীতে পরিণত হবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার মনে কিছু অস্থিতিশীল প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। আমি আপনার সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছি। আপনি চাইলে আমার কথা শুনতে পারেন এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে পারেন। অথবা আপনি চাইলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এবং এই তমসায় নতুনভাবে ডুবে যেতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা সর্বদাই মানবের কাছে থাকে।"

আব্দুল দরবেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। এবপর তার মনে হলো শুনে দেখতে ক্ষতি কী! এই অবয়ব যদি তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে তাহলে সত্যিই তিনি পথ খুঁজে পাবেন। আর যদি উত্তর দিতে না পারে সেক্ষেত্রে তার হারানোর কিছু নেই। কারণ তিনি ইতিমধ্যে অন্ধকারে ডুবে আছেন।

"আপনি কি আপনার প্রশ্নগুলো আমার কাছে করতে চান?", সুধালো অবয়বটি।

"হ্যা", ছোট্ট করে উত্তর দিলেন তিনি।

"আপনার ভেতর যুক্তির উদয় হোক", হাসলেন অবয়বটি। "বলুন কী প্রশ্ন আছে আপনার!"

"সঠিক পথ কোনটি?", আব্দুল দরবেশ প্রশ্ন করলেন।

"এইতো শুরুতেই সব থেকে কঠিন প্রশ্নটি করে ফেললেন। সঠিক বলতে কিছু নেই দরবেশ। আপনার পরিস্থিতি নির্ধারণ করে কোনটি সঠিক এবং কোনটি বেঠিক। আবার কোনো পরিস্থিতিতে আপনার কাছে যেটা সঠিক সেটা অন্যের কাছে বেঠিক হতে পারে। তবে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। কারণ আপনি ঈশ্বর। অন্য কেউ নয়।"

আব্দুল দরবেশের পেটের ভেতর এক প্রকার শূন্য অনুভূতি হলো। তিনি প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কোনো মানুষ কোনদিন ঈশ্বর হতে পারে না। এটা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।"

মৃদু হাসলো মূর্তিটা।"

"যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেও।"

ভুলে গেছেন দরবেশ? আপনার মতে এখানে রূহ কী? এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে এর যা আদমকে আজাজিলের থেকেও বেশি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে? এসব তো আপনি জানেন। বহুবার বহুজনকে বুঝিয়েছেন রুহের ভেদ।

"রূহ আল্লাহর অংশ। তা মানুষকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। তবে তাতে কখনো মানুষ ঈশ্বর হয়ে যায় না। একটি অগ্নিকুন্ড এবং তা থেকে জ্বলিত মোমবাতি কখনোই এক হতে পারে না। স্বভাবতই অল্পকিছু সবকিছুকে ধরে রাখতে পারে না।"

"জীবন গঠিত হয়েছে এক উপাদান দ্বারা দরবেশ। কেও সেটাকে ঈশ্বর বলে তো কেউ ম্যাটার। কিন্তু আপনি তাকে যা ই বলেন না কেন তাতে বাস্তবতা বদলে যাবে না। তবে এই বাস্তবতা অবশ্যই আপনাকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।", যেন তর্ক শুরুর খাতিরেই অবয়বটি বলে উঠলো।

"আচ্ছা যদি আমি মেনে নেই জীবন একক উপাদান থেকে গঠিত, তখনও আমি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করতে পারি না। একক উপাদান থেকে গঠিত সকল কিছুর

একই বৈশিষ্ট্য থাকে না। কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যে হয়তো মিল থাকতে পারে তবে তা কখনোই সেই মৌলিকের সমতুল্য নয়। তাহলে আমি কিভাবে কেন নিজেকে ঈশ্বর বলবো ", আব্দুল দরবেশ এখন তর্কটাকে উপভোগ করতে শুরু করেছেন। তিনি জানেন এই অবয়ব তার সামনে বেশিক্ষন টিকতে পারবে না। তাছাড়া এর যুক্তিগুলোও বেশ ভঙ্গুর।

"কারণ আপনি আছেন। আর শুধু ঈশ্বরই বর্তমান। তিনিই অস্তিত্বশীল। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো পথ আপনার কাছে খোলা নেই। কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

"শুনে রাখো, সৃষ্টি ও আদেশ একমাত্র তাঁরই কাজ। তিনিই একমাত্র অস্তিত্বশীল।"

অতএব আল্লাহই একমাত্র বাস্তব আর মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব আল্লাহর ভেতরেই। সূক্ষ্ম বিচারশক্তিদিয়ে দেখুন নয়তো ইবলিশের মতো একচোখা হয়ে যাবেন। ইবলিশ হলো সেই দৃষ্টিবঞ্চিতদের মতো যারা অর্ধেকটা দেখতে পায় আর বাকি অর্ধেক দেখতে পায় না। সে শুধু আদমকে একটা মাটির দলা হিসেবে দেখেছে, যেমনটি আপনি নিজেকে দেখছেন। কিন্তু তার ভেতরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সে উপলব্ধি করতে পারেনি। যেমনটি আপনি নিজেকে উপলব্ধি করতে পারছেন না। কেন্দ্র থেকে মহাবিশ্বকে বিচ্ছিন্ন রাখার যে প্রবণতা তার ব্যক্তিরূপ হলো ইবলিশ। ইবলিশ সৃষ্টিকে খণ্ডিত রাখে। স্রষ্টার সাথে অখণ্ড হতে দেয় না। যেমনটা আপনি অখণ্ড হতে পারছেন না।

বৃদ্ধ দরবেশ আপনার কাছে ঈশ্বর হওয়া বা না হওয়ার কোনো নির্বাচন রাখা হয়নি। আপনার কাছে নির্বাচন রয়েছে শুধু উপলব্ধি করা বা না করার। সৃষ্টির কাছে সর্বদাই বাছাই এর স্বাধীনতা রয়েছে।"

আব্দুল দরবেশ যেন কিছুটা মিইয়ে গেলেন। তার মধ্যে কিছুটা শঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সৃষ্টির ভেতর স্রষ্টার অংশ বিদ্যমান এটা তিনি মানেন। তবে সেই অংশ কোনোদিন স্বয়ং স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে না। যখন স্রষ্টার সাথে একীভূতকরণ হয়

তখন মানুষ চারদিকে কেবল ঈশ্বরকে দেখতে পায় কিন্তু সে নিজে কি তাতে ঈশ্বর হয়ে যায়? জীবিত অবস্থায় নফসকে জয় করা সম্ভব, পরিত্যাগ করা কি সম্ভব?

যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই হাসলো মূর্তিটি। "তুমি নিজের প্রতি বড় বেশি শক্ত দরবেশ। নিজের ভেতরের ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটাতে হলে তোমাকে আগে নমনীয় হতে হবে। যুক্তি দিয়ে বিচার করা শিখতে হবে। দ্বৈততায় কোনো মুক্তি নেই।"

"যদি আপনার যুক্তি মেনে নেই সেক্ষেত্রে সবাই ঈশ্বর।"

"অবশ্যই। আমি আগেও বলেছি আপনাকে, ঈশ্বর হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে কোনো নির্বাচন নেই। উপলব্ধি করা বা না করার মধ্যে যে কেউ নির্বাচন করতে পারে। এটা আপনিও জানেন দরবেশ যে শুধুমাত্র এককই অস্তিত্বশীল।"

"সেক্ষেত্রে প্রার্থনা বা পাপ-পুণ্যের কি হবে?" নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা করে ফেললেন আব্দুল দরবেশ। এবং পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলেন একটা বিরাট ভুল করেছেন তিনি। এটা তিনি জানেন। বহুবার বহুজনকে বুঝিয়েছেনও।

"আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে ঈশ্বর কোনো ব্যক্তি নয়। ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপীকরণ বহু যুগ ধরে চলে আসা সব থেকে বড় ভুলগুলোর একটি। ঈশ্বর হচ্ছে উপস্থিতি, কোনো ব্যক্তি নয়। তাই প্রার্থনার কোনো মহত্ত্ব নেই। প্রার্থনাময় হওয়াটা জরুরি, প্রার্থনা জরুরি না। ঈশ্বরকে আমরা কোনদিন কিছু বলতে পারি না, বুঝাতে পারি না কিংবা তাঁর কাছে কিছু চাইতে পারি না। কারণ তিনি আগে থেকেই সব জানেন। আমরা কেবল ঈশ্বরকে শুনতে পারি। তাকে উপলব্ধি করতে পারি। আর তাকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কোনো নির্দিষ্ট সময় কিংবা নিয়মেরও প্রয়োজন নেই।

একবার যখন আপনি সনাক্ত করা শুরু করবেন আপনিই ঈশ্বর, তখন আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। আপনার সনাক্তকরণে হয়তো ত্রুটি থাকতে পারে, তবে সেখানে কোনো পাপ নেই। আপনি হয়তো ভুল করতে পারবেন, কিন্তু আপনি পাপী হতে পারবেন না। কারণ আপনি যাই করেন আপনি আপনার ভগবানত্ব হারাতে পারবেন

না। এটাই জীবনের সব থেকে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। তখন আপনি পাপ করলে আপনার ভগবানও পরিণত হবে পাপীতে।"

আব্দুল দরবেশের মাথাটা কেমন যেন শূন্য লাগতে শুরু করেছে। তার মতো দেখতে এই উন্মাদের সাথে তিনি আর তর্ক চালাতে আগ্রহী নন। বা হয়তো তিনি পাল্টা যুক্তি সাজাতে আগ্রহী নন। তার ভেতরে কিছু একটা উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।

"আমি জানি আপনি এখনো নিজের ঈশ্বরত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছেন না। এখনো আপনার ভেতর অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার উত্তরগুলো হয়তো আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আপনাকে আমি বলবো না আমাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে। সেটা আমার স্বভাব নয়। আপনি অবলোকন করুন। আপনি যেকোনো কিছু বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। কেবল বিশ্বাস রাখুন নিজের উপর। আপনি নিজেই নিজেকে পথ দেখানোর জন্য যথেষ্ট। আপনার ঈশ্বরত্ব জলদি প্রকাশ পাবে এবং আপনার মনের সকল সংশয়ের অবসান ঘটবে।"

"কিন্তু কিভাবে?"

"ঐ যে বললাম, আপনার ভেতরের ঈশ্বরই আপনাকে বলে দিবে কখন কী করতে হবে।"

আব্দুল দরবেশের মনে হলো আগন্তুকের শেষ কথাটা হুজরাখানার ভেতর প্রতিধ্বনিত হলো। তিনি এই উন্মাদকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু তিনি তাকে অবিশ্বাস করতে পারছেন না। চোখের সামনেটা আবার ঝাপসা হতে শুরু করেছে। তিনি কি তবে এবার জ্ঞান হারাবেন? তিনি বুঝতে পারলেন আগন্তুকের কণ্ঠের শব্দ দূরে গিয়েছে। তিনি তাকে চিৎকার করে বলতে চাইলেন,

"দাঁড়াও! আমার আরো অনেক প্রশ্ন আছে!"

কিন্তু তার মুখ দিয়ে কেবল এক প্রকার গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে তিনি শুনতে পেলেন কে যেন ভারী গলায় বলছে,

"আছে আদি মক্কায় যেমন

মানুষে সাঁই আছে তেমন

তা নইলে কি সব নূরীগন

আদম তনে সেজদা জানায়...."

চোখ বন্ধ করতে করতে তিনি বুঝতে পারলেন কণ্ঠটা তার জটাধারী সেই আগন্তুকের। তার গলাও একসময় আগন্তুকের মতোই ভালো ছিল।

জটাধারীর প্রস্থানের পর থেকেই আব্দুল দরবেশ নিজের ভেতর কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তার মধ্যে এক প্রকার দৃঢ়তা কাজ করছে। নিজেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হিসেবে আবিষ্কার করলেন তিনি। ধীরে ধীরে যেন নিজের ভেতরের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি মসজিদে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলেন না। তার ভেতর ক্রোধের অনল জ্বলতে শুরু করেছে। কিছুতেই তিনি মহসিনকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। নিজের অন্তরকে শান্ত করতে পারছিলেন না।

আজ আব্দুল দরবেশের মনটা একটু বেশিই অস্থির। তিনি বুঝতে পারলেন তার এই অস্থিরতা মহসিনকে শাস্তি দেয়ার জন্য। মহসিনের প্রতি তিনি এক প্রকার তীব্র ঘৃণা অনুভব করছেন। আব্দুল দরবেশ নিজের আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। ঘরের এক কোণা থেকে পানির পাত্রটা হাতে নিলেন তিনি। পাত্রের পানি কিছুটা কালচে দেখাচ্ছে। মৃদু হাসলেন আব্দুল দরবেশ। তিনি জানেন তার এখন কী করতে হবে।

আব্দুল দরবেশ পানি দিয়ে হুজরাখানার মেঝেতে এক অদ্ভুত চিহ্ন আঁকলেন। এরপর বিড়বিড় করে কোনো একটা প্রাচীন মন্ত্র পাঠ করা শুরু করলেন। হুজরাখানার ভেতরে যেন হুট করেই ঝড় শুরু হয়ে গেল। প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলো। বাতাসের দমকে মোমবাতিগুলো নিভে গেল। ঘরের হাতে গোণা কয়েকটা জিনিসপত্র এদিক সেদিক হতে লাগলো।

তীব্র বাতাসে আব্দুল দরবেশ সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। এরপরও তিনি মন্ত্র পড়া থামলেন না। নিজের ভেতরের সবটুকু শক্তিকে এক করে তিনি বিড়বিড় করে যেতে লাগলেন।

এক সময় আব্দুল দরবেশ নিজেকে এক উত্তাল সমুদ্রের উপরে আবিষ্কার করলেন। সমুদ্রের পানির রং কুচকুচে কালো। পানির মাঝখান দিয়ে হালকা হলদেটে বালির সরু রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটা এতটাই সরু যে তিনি দুই পা পাশাপাশি রাখতে পারছেন না। পায়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে কালো জল। আব্দুল দরবেশ দেখলেন আকাশে বেশ বড় একটা চাঁদ উঠেছে। চাঁদটা এতটাই বড় যে তার মনে হলো এই পুরো দৃশ্যটাই কোনো শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা জলছবি। আব্দুল দরবেশ সরু রাস্তাটা ধরে সামনে আগাতে লাগলেন। এই উত্তাল সাগরে অন্য কোনো প্রাণীর দেখা পাওয়ার জন্য তার চোখ অস্থির হয়ে উঠলো। এভাবে কতক্ষণ চলেছেন খেয়াল নেই দরবেশের। এ যেন এক অনন্ত যাত্রা। হঠাৎ তিনি জলের ভেতর এক ধরণের আলোড়ন দেখতে পেলেন। কানে এসে লাগলো একটা অপরিচিত শব্দ। অনেকটা ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শোনাচ্ছে শব্দটা। আব্দুল দরবেশ থেমে গেলেন। চাঁদের আলোয় সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি লক্ষ্য করলেন তার পায়ের নিচের পানি কেমন যেন থকথকে। কালো থকথকে তরল লেগে আছে তার পায়ে।

পানির ভেতর আলোরণটা ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎ তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা চিকন কালো শুঁড়। তারপর আরেকটা, আরো একটা। পুরো সমুদ্র জুড়ে অসংখ্য শুঁড় দেখতে পেলেন তিনি। কালো থকথকে পদার্থ গড়িয়ে পড়ছে সেই শুঁড়গুলো থেকে।

আব্দুল দরবেশ হঠাৎ উপলব্ধি করলেন এটা কোনো সমুদ্র নয়। এই কালো তরলগুলো পানি নয়। তিনি নিজের পা টা বামদিকে একটু এগিয়ে দিলেন। বিস্ফোরিত নয়নে দেখতে পেলেন সেখান থেকে ঝট করে কালো কিছু একটা সরে গেল। সে সরে যেতেই তার নিচে হালকা হলুদ বালি দেখা যাচ্ছে।

"হে খোদা!,এটা একটা মরুভূমি!" এই কালো থকথকে প্রাণীগুলো মরুভূমির বালু এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে দেখে মনে হচ্ছে কালো জলরাশির কোনো সাগরের মাঝে আছেন তিনি! আব্দুল দরবশের চোখগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। প্রাণীগুলোর শরীর যতবার নড়ে উঠছে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাগরের উত্তাল ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করে ফেললেন আব্দুল দরবেশ। এ দৃশ্য কোনো মানব ইন্দ্রিয়ের জন্য নয়। তিনি বুঝতে পারলেন তার ভয় লাগছে না মোটেও। অবাক হলেন তিনি। পায়ে আবার সেই থকথকে পদার্থের উপস্থিতি টের পেলেন তিনি। এরা সংখ্যায় কত হবে!

জানেন না আব্দুল দরবেশ। তিনি চোখ না খুলেই প্রাণীগুলোর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন,

"আপনারা আমার ভাষা বুঝতে সক্ষম কি না আমি জানি না। যদি বুঝতে পারেন তবে জেনে রাখুন, আমার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। আমি আপনাদের উপর সেই প্রতিশোধ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করলাম।"

কিছুক্ষণ কিছুই হলো না। চারদিকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। ঝিঁঝিঁ ডাকটাও থেমে গেছে। আব্দুল দরবেশের চোখ এখনো বন্ধ। তার মনে হলো প্রাণীগুলো হয়তো তার কথা বুঝতে পারেনি। মনে মনে কিছুটা হতাশ বোধ করলেন তিনি।

চোখ খুললেন আব্দুল দরবেশ। আর চোখ খুলতেই এক ধরনের আদিম আতঙ্ক গ্রাস করলো তাকে। প্রাণীগুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে। সমুদ্রের কালো জলরাশির মধ্যে যেন হাজার হাজার লালচে বিন্দু দেখা দিয়েছে। ঝিঁঝিঁ শব্দটা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। একঘেয়ে শব্দটার তীব্রতায় আব্দুল দরবেশের কান ব্যাথা করতে

শুরু করলো। কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠলো এক অশুভ হাসি। চাঁদের আলোতে সেই হাসি বড় ভয়ঙ্কর দেখালো। আব্দুল দরবেশ জানেন খুব দ্রুতই তার মন-কামনা পূরণ হতে যাচ্ছে। তার ভেতর এতদিন ধরে জ্বলতে থাকা অনলের এবার নিভার সময় হয়েছে। তিনি জানেন এই অদ্ভুত ঘৃণ্য প্রাণীগুলো তার কথা মান্য করতে বাধ্য। কারণ তিনিই ঈশ্বর!!

পাগলের মতো হেসে উঠলেন আব্দুল দরবেশ। চারদিকে তার অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো!

বিবি হাজেরার এই মুহূর্তে প্রচণ্ড তেষ্টা পাচ্ছে। এতটাই তীব্র সেই অনুভূতি যে তার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পানি না পেলে তিনি হয়তো মারা যাবেন। বিছানা থেকে উঠে বসলেন হাজেরা। কখন তার দুচোখ লেগে গিয়েছিল খেয়াল আসছে না। তাই ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না তিনি। ঘুমের মধ্যে কী যেন একটা স্বপ্ন দেখেছেন। এখন সেটাও মনে করতে পারছেন না।

ঘড়ির দিকে তাকালেন হাজেরা। ঘড়িটা বন্ধ। তিনটার ঘরে এসে আটকে আছে কাটাগুলো।

চারদিক যেন একটু বেশিই নিস্তব্ধ মনে হলো আজ তার কাছে। এখন কয়টা বাজে? প্রশ্নটা মাথায় আসলেও আমলে নিলেন না তিনি।

ঘরের কোণায় পানির পাত্রটার দিকে এগিয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে প্রথমে তার একটু পানি দরকার। এক বিন্দু পানির জন্য পুরো সত্তা হাহাকার করছে তার।

ঢাকনা সরাতেই দেখা গেল পানির পাত্রটা খালি। বিরক্ত হলেন হাজেরা। রান্নাঘর থেকে পানি আনতে হবে।

"যাক ভালোই হলো, "মনে মনে ভাবলেন তিনি, "সেই সাথে সময়টাও দেখে আসা যাবে।"

দ্রুত পায়ে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এক টানে পরিচিত দরজাটা খুলে ফেললেন। দরজাটা খুলতেই প্রচণ্ড ভয়ে তার গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। "খোদা!"

দরজার বাইরে কিছু নেই। নিরেট কংক্রিটের দেয়াল কেবল! হাত ছোয়ালেন তাতে। হ্যা একদম নিরেট। সব শক্তি এক করে ধাক্কা দিলেন দেয়ালে। লাল ইটের গাঁথুনি থেকে কিছুটা সিমেন্ট খসে পড়লো। কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। চারদিকে তাকিয়ে অন্য কোনো দরজা খুঁজে পেলেন না তিনি। তার চির পরিচিত ঘরটা ঠিক আগের মতোই আছে। শুধু দরজার বাইরের নিরেট দেয়ালটা যেন তার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গর হাসি হাসছে।

এমনটাতো হওয়ার কথা না! দৌড়ে জানালার কাছে গেলেন তিনি। পর্দাটা সরাতেই সামনে বিশাল সমুদ্র দেখতে পেলেন।

ইয়া আল্লাহ! এ কোথায় আছেন তিনি! এ কোন মৃত্যুপুরীতে আটকে গেছেন!

চাঁদের আলো সমুদ্রের জলে প্রতিফলিত হয়ে এক অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গলোক থেকে এক টুকরো দৃশ্য কেটে এনে তার জানালার সামনে জুড়ে দিয়েছে কেও। তার সামনে কেবল পানি আর পানি....অথৈ অনন্ত....অসীম এক জলরাশি।

তৃষ্ণাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হাজেরা নিচে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন মাটি থেকে কতটুকু উপরে আছেন তিনি। হতাশ হলেন। নীচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল নরক থেকে উঠে আসা এক খণ্ড অন্ধকার সেখানে।

সমুদ্রের জলরাশিতে হঠাৎ প্রবল ঢেউ খেলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো কিছু অদ্ভুত অবয়ব। প্রথমে বিবি হাজেরার মনে হলো কেবল জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন সেখানে। অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে কিছুটা

স্পষ্ট হয়ে আসলো অবয়বগুলো। তিনি জনেন এদের তুলনা মাটির পৃথিবীর কোনকিছুর সাথে করা চলে না। তিনি জানেন তার চেনা পৃথিবীর কোনো শব্দ, কোনো অনুভূতি, কোনো বাক্য এদের ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

সংখ্যায় মাত্র দুটো। দেখতে কিছুটা সরভূজ আকৃতির। আকার পাল্টাচ্ছে ক্রমাগত। শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য শুঁড়। চারদিকে কিলবিল করছে সেগুলো। শুঁড়গুলো দেখতে অনেকটা মানুষের পায়ের আকৃতির। অবয়বগুলোর চোখ নেই...নাক নেই....মুখের জায়গায় একটা বিরাট গহ্বর। তার ভেতর থেকে সোনালী রঙের তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। চাঁদের আলোয় জ্বলছে সেটা।

তিনি অবয়বগুলোকে আর ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। সেই চেষ্টাও করলেন না। জানালা থেকে সরে এসে ধপ করে ঘরের কোণায় বসে পড়লেন। উষ্ণ নোনা জল গাল বেয়ে চিবুক স্পর্শ করলো। এভাবে কতক্ষণ পার হলো জানেন না হ্যজেরা। কানে ভেসে আসছে সমুদ্রের জলরাশির আওয়াজ। একটানা সেই শব্দ শুনলে কেমন যেন নেশা ধরে যায়। এক সময় তৃষ্ণায় চোখের সামনের দৃশ্যগুলো মিলিয়ে যেতে লাগলো।

অজ্ঞান হওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি প্রবল ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারা আসছেন!

রমিজ আলীর চায়ের দোকানে আজকে সকাল থেকেই বেশ ভিড় লেগে আছে। চা বানাতে বানাতে আঙ্গুলগুলো হালকা ব্যাথা করছে তার। তার উপর আজকে সহযোগী ছেলেটাও জ্বরের কারণে ছুটিতে। চা বানানো থেকে শুরু করে, পরিবেশন, টাকার হিসেব রাখা সব তাকে একলা হাতে করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে বেশ একটা হিমশিম অবস্থা তার।

এই এলাকায় তার চায়ের দোকান প্রায় দশ বছর ধরে। এমনিতে তার বেচা বিক্রি যে খুব কম তা না। আল্লাহর রহমতে সকলে বলে তার দোকানটাতে বরকত আছে। এই তো কিছুদিন আগেও তার বেঁচা বিক্রি দেখে আওয়াল তার দোকানের পাশেই একটা চায়ের দোকান খুলে বসেছিল। কিন্তু এলাকায় তার হাতের চায়ের সুনাম থাকায় সে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে দোকান দেয়ার ছয় মাসের মাথায় তল্পিতল্পা গুটিয়ে আলবিদা।

তবে আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। এলাকায় মহসিনের লাশটা বেশ সাড়া ফেলেছে। প্রত্যেকের মুখে মুখে সেই লাশের কথা। তার দোকানে জড়ো হয়ে সবাই সেই লাশের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত দিচ্ছেন। এক কথা দু কথায় গল্প বাড়ছে, সেই সাথে রমিজ আলীর চায়ের চাহিদাও বাড়ছে।

আজকে সকালে দুজন পুলিশও তার দোকানে এসেছিল। চা খেতে খেতে এটা সেটা জিজ্ঞেস করছিলেন তারা। রমিজ আলী যতদূর সম্ভব সত্য বলার চেষ্টা

করেছেন। পুলিশের সাথে মিথ্যা বললেই বিপদ। এরা তিলকে তাল বানাতে ওস্তাদ। তাই ছোটখাটো ব্যাপারেও এদের সাথে মিথ্যা বলতে নেই।

মৃত মহসিন লোকটা এই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। সহীহ্ হাদীস আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য এবং সে প্রায়ই তার দোকানে চা খেতে আসতেন। ধোঁয়া ওঠা কাপে ফুঁ দিতে দিতে এটা সেটা নিয়ে হালকা কথাবার্তা বলতেন। মাঝে মাঝে এলাকার অন্য কয়েকজনের সাথে দল বেঁধেও আসতেন। তখন চলতো নানা বিষয়ে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক। এসব জ্ঞানের কথার বেশিরভাগই রমিজ আলী বুঝতে পারতেন না। তবে তাদের বাহাসগুলো উপভোগ করতেন তিনি।

কিছুদিন আগেও আব্দুল দরবেশের সাথে একটা বাহাস বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে চলে যায়।

আজকে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি এই ঘটনাটার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ দুজনকে এই ঘটনায় তেমন একটা আগ্রহী মনে হয়নি। তাদের ধারণা কাজটা একদল জোয়ান ছেলেপেলের। পাড়ার উঠতি বয়সের কোনো গুণ্ডার দলের হওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক না। তবে তারা নির্দিষ্ট করে এখনো কিছু ধারণা করতে পারেননি। অবশ্য এর পেছনে কারণও আছে।

মহসিনের লাশটা বেশ অদ্ভুত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অদ্ভুত বলতে আসলেই অদ্ভুত। প্রতিদিন ভোরবেলা মহসিন ফজরের সময় মসজিদে আসেন। যদিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতো মাঝে মাঝে। যেমন আজকে তিনি ভোরবেলা ঘরের দরজা খোলেননি। গত রাতে পরিবারের সবাইকে বলেছিলেন তার শরীর খারাপ কেও যেন তাকে বিরক্ত না করে। তাই পরিবারের কেউ-ও আর তাকে ডাকেনি। কিন্তু বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পরও যখন মহসিন ঘর থেকে বের হলেন না, তখন পরিবারের সবাই চিন্তিত হয়ে ওঠে। বহুক্ষণ ঘরের দরজা ধাক্কাধাক্কি এবং নাম ধরে ডাকাডাকির পরও মহসিন সাহেবের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। তখন ঘরের সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা মিলে দরজা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। দরজা ভেঙেই

তার লাশ উদ্ধার করে তারা। তার লাশ নাকি এতটাই বিকৃত অবস্থায় ছিল যে ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান কেও কেও।

রমিজ উদ্দিন শুনেছেন মহসিনের মুখে কেও ঠুসে ঠুসে ভরে দিয়েছিল বালি আর কাকর। এতটাই চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল তার উপর যে ঠোঁট দুটো বিচ্ছিরিভাবে দুদিক ঝুলে গিয়েছিল। মুখের প্রতিটা দাঁত ভাঙা অবস্থায় চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। জিহ্বার কিছু অংশ থেঁতলে গিয়েছিল। চোখ দুটোতে নাকি আদিম আতংক খেলা করছিল। বড় বীভৎস ছিল সেই দৃশ্য!

পুলিশের মতে গলার অনেকটা ভেতর পর্যন্ত বালি ঢুকে যাওয়ার ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মজিদ মিয়ার মৃত্যু ঘটে। তার পুরো শরীরে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এমনকি কোনো প্রকার জোরাজুরি কিংবা ধস্তাধস্তির আলামতও পাওয়া যায়নি। তবে সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হলো পুরো ঘরে কোথাও এক ফোঁটা বালির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কেবল মহসিনের দুই হাতের মুঠো ভর্তি হয়ে ছিল হালকা হলুদ রঙের বালি এবং কাকরে। যেন সে নিজেই কোনো এক অজানা কারণে মুঠো মুঠো বালি নিজের মুখে পুড়েছিলেন।

লাশটার কথা ভাবতে ভাবতে এই ভর দুপুরেও রমিজ আলীর গা শিউরে ওঠে। এতটা নৃশংসভাবে এই পৃথিবীর কোনো প্রাণীর পক্ষে কি খুন করা আদৌ সম্ভব? মনে মনে আয়াতুল কুরসী আউড়ে নেয় সে। জোরে একটা ফুঁ দেয় বুকে। এরপর দূর থেকে জলিলুদ্দীনকে তার দোকানের দিকেই আসতে দেখে দ্রুত হাতে আবার চা বানানো শুরু করে।

এরকম দু'একটা ঘটনা মাসে ঘটলে মন্দ হতো না, মনে মনে ভাবে সে। মাসে দু'একবার বেচা-বিক্রি এরকম হলে দোকানটাকে কিছুটা বড় করা যেত।

জলিলুদ্দীন আব্দুল দরবেশের সাথে দেখা করতে এসে শুনলেন তার শরীর খারাপ, তিনি ঘুমাচ্ছেন। আদিল এসে খবরটা দিয়ে গেল তাকে। দিনের এই সময় বাবাকে তিনি কোনদিন ঘুমাতে দেখেননি। বাবার বয়স হচ্ছে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন বাবাকে এখন আর বিরক্ত করবেন না। তিনি চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করার সাথে সাথেই আদিল আবার হুজরাখানার ভেতর থেকে বের হয়ে এলো।

"আব্বার ঘুম ভেঙেছে। তিনি আপনাকে ডাকছেন", সংক্ষেপে বলল সে।

জালালুদ্দীন হুজরাখানার ভেতরে প্রবেশ করেই আব্দুল দরবেশকে দেখে চমকে উঠলেন। তার চোখের নিচে কালি। যেন বহু বছর ঘুমান না। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে আধা শোয়া হয়ে বসে আছেন তিনি। এক রাতেই যেন বয়স বেড়ে দ্বিগুন হয়ে গেছে। তার হাতে পিতলের একটা পানির পাত্র। জলিলুদ্দীনকে দেখে সেটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি।

"আপনার কী হয়েছে বাবা?" জলিলুদ্দীন চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্নটা করলেন।

মৃদু হাসলেন আব্দুল দরবেশ, "কিছু হয়নি জলিল। শরীর সবসময় সহ্য করতে পারে না।"

আব্দুল দরবেশের উত্তরটা আশ্বস্ত করতে পারলো না জলিলুদ্দীনকে। তারপরও কথা বাড়ান না তিনি।

শান্তভাবে বলেন, "আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছিলাম বাবা।"

"বলো।"

"মহসিন সাহেব কাল রাতে মারা গেছেন। আজ সকালে বন্ধ ঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।", ইচ্ছা করেই লাশের বিকৃতির কথাটা চেপে যায় সে।

"ওর আত্মার শান্ত হোক", আব্দুল দরবেশ নির্বিকার কণ্ঠে বলেন। এরপর যুক্ত করলেন, "এটা জানাতেই কি এসেছিলে?"

জলিলুদ্দীনের মনে হলো বাবা মজিদ মিয়ার মৃত্যুর খবরটা আগে থেকেই জানতেন।

"জি বাবা", সংক্ষেপে উত্তর দেন তিনি।

তার উত্তর শুনে আব্দুল দরবেশ উঠে বসলেন। নিজ আসনে বসে চোখ বুজলেন তিনি। জলিলুদ্দীন বুঝতে পারলেন বাবা এখন ধ্যানে বসবেন। তিনি জানেন এ সময় বাবা কারো উপস্থিতি পছন্দ করেন না। বাবাকে আর বিরক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি হুজরাখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভুল হতে পারে তবে জলিলুদ্দীনের মনে হল ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বাবার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি দেখেছেন। অশুভ কিছু একটার আভাস ছিল সেই হাসিতে!

ময়মনসিংহের এই এলাকাটিতে সাধারণত রাত নেমে যায় দশটার পরপরই। আর এখানকার মানুষের কাছে রাত তিনটা মানে হলো ভোররাত। এই সময় রাস্তায় কোনো স্বাভাবিক লোকজন তো দূরে থাক, চোর বাটপারও বের হতে চায় না।

চারিদিকে তাই শুনশান নীরবতা বিরাজ করছে। ফুরফুরা বাতাসে রাস্তার গাছপালাগুলো নিজেদের মাঝেই যেন ফিসফিসিয়ে গল্প করে চলছে। সে এক আদিম ভাষার আখ্যান।

আকাশের পূর্ণ চাঁদটা মেঘে ঢেকে যাচ্ছে বারবার। তাতে যদিও জ্যোৎস্নায় কোনো ভাটা পড়ছে না। চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। ঝিঁঝি পোকারা এক তালে ডেকে চলছে। কিছুক্ষণ কান পেতে থাকলে কেমন যেন এক নেশা ধরে যায়। মনে হয় যেন এদের ডাক অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে আসছে।

মাঝে মাঝে তক্ষক ডেকে ওঠে। এমন রাতে তার ডাক কোনো ডাইনির রিনিঝিনি হাসির মতো শোনায়। এইসব টুকিটাকি শব্দ বাদ দিলে চারদিক নিস্তব্ধই বলা চলে। শুধু মাঝে মাঝে দূরে কোনো কুকুর কাতর স্বরে ডেকে উঠছে। তার ডাক রাতের নিস্তব্ধতাকে কিছু সময়ের জন্য খানখান করে দিয়েই মিশে যাচ্ছে অসীম নিস্তব্ধতায়।

আব্দুল দরবেশ নিজ হুজরাখানায় ধ্যানে মগ্ন। ঘরের বাইরের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হলেও হুজরাখানার ভেতরটা মোটামুটি ঠান্ডাই বলা চলে। অন্ধকার কক্ষটিতে কেবল একটি মোমবাতি জ্বলছে। তার স্থির শিখায় চারপাশ ঝাপসাভাবে আলোকিত করে রেখেছে। ঘরের ভেতরে পিনপতন নীরবতা। মনে হয় যেন মহাকালের চক্র এই ছোট্ট ঘরটিতে এসে থেমে গেছে।

মহসিনের মৃত্যুর পর আব্দুল দরবেশের আর কোনো সন্দেহ থাকেনি নিজের শক্তির ব্যাপারে। তিনি এখন জানেন তিনি কী। তারপরও হঠাৎ হঠাৎ যেন তার মানব সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে নিজেকে অতি সাধারন মানুষ মনে হয় তার। আব্দুল দরবেশের বিশ্বাস অতি শীঘ্রই তিনি এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

ইদানিং আব্দুল দরবেশ কিসের যেন অপেক্ষায় থাকেন। কিছু একটা ঘটার অপেক্ষা। ব্যাপারটা কী, তিনি ঠিক জানেন না। শুধু জানেন তার অপেক্ষা করতে হবে। এখন তিনি চাইলে নিজের কিছু কিছু ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। তারপরও কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অনেক ভেবেও তিনি তা ধরতে পারেন না।

ঘড়িতে এখন ঠিক তিনটা বেজে তেরো মিনিট। দূরে কোথাও একটি কুকুর করুণ সুরে কেঁদে উঠলো। হঠাৎ যেন ঘরের তাপমাত্রা এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা কমে গেছে। আব্দুল দরবেশের ঠান্ডা লাগতে শুরু করলো। তিনি ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে ধ্যানে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলেন । আজকে বারবার কোনো না কোনো বাঁধা আসছে। তিনি কিছুতেই ধ্যানে মন বসাতে পারছেন না। বারবার তার মনে হচ্ছে যেন কোনো অসীম ক্ষমতাধর সত্তা তাকে নিজের দিকে আহবান করছে।

আ....................ল

মমমমমমম.............

কোথাও থেকে অপরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। আব্দুল দরবেশ শান্তভাবে চোখ মেললেন। তার দৃষ্টি স্থির। তিনি সতর্কভাবে শোনার চেষ্টা করলেন। চারদিক শুনশান। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু বাইরে ঝিঁঝি পোকারা ডেকে চলছে এক তালে।

আজকের ধ্যানটা বারবার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, ভাবলেন তিনি। কিছুতেই মনকে শান্ত করা যাচ্ছে না। তিনি গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। এরপর অনেকটা সময় তা ধরে রাখলেন। তিনি যখন নিশ্বাস ছাড়লেন সেটাকে কিছুটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো।

তার সারা শরীর কেন যেন শিথিল হয়ে আসছে। এক অদ্ভুত অনুভূতি বারবার যেন গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে তাকে। এই অনুভূতি বর্ণনা দেয়ার জন্য হয়তো পৃথিবীর কোনো ভাষা সৃষ্টি হয়নি।

আব্দুল দরবেশের নিজেকে শূন্য আবার একই সাথে পূর্ণ মনে হচ্ছে। একটা শান্ত, শিথিল ভাব তার সারা সত্তা জুড়ে। সেই সাথে সত্তার কোথাও চাপা পরা একটা নিষিদ্ধ উত্তেজনাও টের পাচ্ছেন তিনি। আবদুল দরবেশ কিছুটা অবাক হলেন। এমন অনুভূতি তার এর আগে কখনো হয়নি।

তিনি আবার চোখ বন্ধ করলেন। নিজের মনকে শান্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ তার মনে হলো তিনি ছাড়াও এই ঘরে অন্য কেও আছে। অন্য কোনো সত্তা। ঘরের অন্ধকার কোনো কোণ থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তিনি মাথা থেকে এই উদ্ভট চিন্তা দূর করে ধ্যানে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হতে লাগলেন। অচেনা অনুভূতিটা এতটাই প্রখর যে তার সারা শরীর বারবার শিউরে উঠতে লাগলো। তিনি ঠিক কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারলেন না।

আ.....................ল

মমমমমমম.............

ঝট করে চোখ খুলে গেল আব্দুল দরবেশের। এইবার আর তার দৃষ্টিতে আগের সেই স্থির ভাব নেই। তিনি ঘরের চারপাশে নজর বুলালেন। তার দৃষ্টি যেন অস্থির ভাবে খুঁজে চলছে কাওকে, খুব পরিচিত কাওকে। এমন কোনো সত্ত্বাকে যার এখানে আসার সময় হয়ে গেছে।

তার দৃষ্টি ঘরের এক অন্ধকার কোণে আটকে গেল। কেও যেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না বটে তবে আব্দুল দরবেশ তার মুখের সূক্ষ্ম হাসিটা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলেন। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

এটা কি কোনো দুষ্ট জ্বীন? আল কুরআনে জ্বীন সম্পর্কে আছে। কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"আর আমি মানব এবং জ্বীন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

তবে জ্বীন জাতির কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষের সামনে আসার কথা না। এই সত্তার আসল উদ্দেশ্য কী? ভাবতে ভাবতে আব্দুল দরবেশ উঠে দাঁড়ালেন। তার সামনে মোমবাতিটা তখনো জ্বলছে।

তিনি মোমবাতিটার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। ঘরের বন্ধ জানালাটা হঠাৎ শব্দ করে খুলে গেল। তার পাল্লা দুটো এত জোরে পরস্পরের সাথে বাড়ি খেল যে, আব্দুল দরবেশের মনে হলো কাঠের পাল্লাগুলো হয়তো ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে ফকফকে চাঁদের আলো ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো। সেই সাথে এক ঝটকা ঠান্ডা বাতাস আব্দুল দরবেশের সামনে থাকা মোমবাতিটা নিঃশব্দে নিভিয়ে দিয়ে গেল। পুরো ঘর ডুবে গেল আদিম অন্ধকারে।

তবে ঠিক অন্ধকার নয়। চাঁদের ফকফকে আলোয় সাথে সাথেই আলোকিত করে তুলল ঘরের কিছু অংশ। আব্দুল দরবেশ এক ঝটকায় নিজের বামদিকে তাকালেন। মনে হলো কিছু একটা যেন নড়ে উঠেছে সেখানে। তিনি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না। তবে এখন তিনি নিশ্চিত এই ঘরে তিনি একা নন। অন্য কেউ আছে।

অঅঅঅঅঅআআ..............

ললললললললললল.................

কাঁপা কাঁপা একটা আওয়াজ। ঠিক কোনদিক থেকে আসছে তিনি বুঝতে পারলেন না। একবার মনে হলো ঘরের চার দেয়ালের ভেতর থেকে আসছে আওয়াজটা। আবার পরক্ষণেই মনে হলো দূরের কোনো গহীন অরণ্য থেকে ভেসে আসছে এই আওয়াজ।

কে এই সত্তা? কী বলতে চায় সে তাকে?

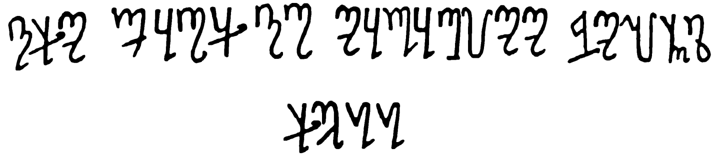
আব্দুল দরবেশ চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তার ভয় লাগছে। বহু বছর পর তার এই আদিম অনুভূতিটা হলো। তার মনে পড়লো, খুব ছোটবেলায় দাদার কাছে জাহান্নামের বর্ণনা শুনে তিনি ভয় পেতেন। একবার নানীর কাছে কবরের আজাবের বর্ণনা শোনার পরে তিনি ভয়ে কয়েক রাত ঘুমাতে পারেননি। এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেই দুঃসহ রাতগুলোর কথা। প্রতি মুহূর্ত তার মনে হতো এই বুঝি তিনি মারা যাবেন, আর তাকে রেখে আসা হবে সাপ বিচ্ছুময় এক একাকী ঘরে।

তবে আজকের ভয়টা ঠিক সেরকম না। আজকের ভয়টা অন্যরকম। খুবই অন্যরকম। তার মনে হচ্ছে কেও তাকে আহবান করছে। নিজের দিকে আহবান করছে। আব্দুল দরবেশ চোখ খুলতে চান না। তিনি এই ভাবেই পার করে দিতে চান দীর্ঘ সহস্র বছর। চোখ খোলার জন্য এখনো তিনি প্রস্তুত না।

কিন্তু তার মন তা মানতে চাইছে না কিছুতেই। রক্তের প্রতি বিন্দুতে তিনি অনুভব করছেন সেই অচেনা সত্তার ডাক। কোনো এক নিষিদ্ধ কৌতুহল তাকে ঘিরে ধরেছে।

আব্দুল দরবেশ চোখ খুললেন। চোখ খুলতেই তিনি বুঝতে পারলেন নিজ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করার ভয়াবহ পরিনাম। তিনি এক কালো ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলেন। বাইরে থেকে আসা মন পাগল করে দেয়া জ্যোৎস্নায় না, বরং ঘরের সব থেকে অন্ধকার অংশে দাঁড়িয়ে আছে সে। তিনি তাকে এই নিকষ কালো অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছেন। আবার দেখতে পাচ্ছেন না। যেন কিছু নেই সেখানে।

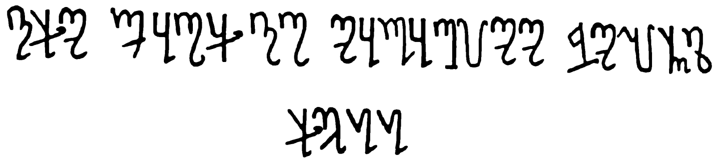
আব্দুল দরবেশের তীব্র ভয় লাগতে শুরু করলো। তিনি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগলেন। আর ঠিক তখনই....ছায়ামূর্তিটি বলে উঠলো-



আব্দুল দরবেশ কী করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি কোনো জড়বস্তুর মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন। ছায়ামূর্তিটি আবার বলে উঠলো,



এর পর পরই ছায়ামূর্তিটি তার খুব কাছে চলে এলো। ভয়ে আতঙ্কে আব্দুল দরবেশের গলা চিরে বেরিয়ে এলো-

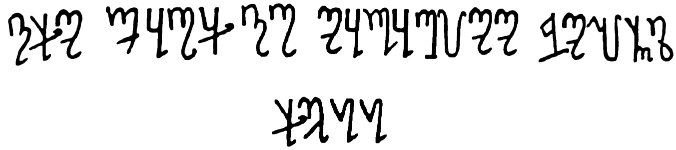


ছায়ামূর্তিটি ঠিক সাথে সাথেই বের হয়ে গেল তার সামনের জানালা দিয়ে। সে তার এত কাছে ছিল যে তিনি অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। এত দ্রুত সে প্রস্থান করলো যে তিনি চোখের পাতা ফেলারও সময় পেলেন না। এই সময়টুকু কি বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করতে পারবে? এটা কি ন্যানো সেকেন্ড, নাকি তার থেকে কম?

আব্দুল দরবেশের মনে হতে লাগলো তার চারপাশের পৃথিবী দুলছে, তীব্রভাবে দুলছে। যেন সেই মহাসময়ের আগমন ঘটছে...যার জন্য ইস্রাফিল অপেক্ষা করে যাচ্ছে সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্ত থেকে। তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করলেন তিনি শরীরে। আর তারপরই সব শিথিল হয়ে এলো।

চারিদিকে সব শান্ত, স্বাভাবিক। যেন এমনই ছিল সবকিছু। যেন এমনই থাকার কথা ছিলো সবকিছুর। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো আব্দুল দরবেশের দেহটা। আজকে রাতে শেষবারের মতো চোখ বন্ধ করার আগে তিনি দেখতে পেলেন খোলা জানালা দিয়ে আলো আসছে, তীব্র শুভ্র আলো। সাথে একটা মন মাতানো মিষ্টি সুবাস।

আব্দুল দরবেশ জানেন এই সুগন্ধির জন্ম এই পৃথিবীতে হয়নি। তিনি জানেন এই আলো এই পৃথিবীর নয়। তীব্র আলোয় তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তার চোখ দিয়ে দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বিড়বিড় করে তিনি বললেন-



আর এরপরই.......সব অন্ধকার।

ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের পর আব্দুল দরবেশ নিজের মানব সীমাবদ্ধতাগুলো দ্রুত কাটিয়ে উঠতে লাগলেন। এ সময় তার জীবনে নানা পরিবর্তন আসলো। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্যান মগ্ন থাকতেন। কেবল সন্ধ্যায় একবার আহার গ্রহণ করতেন। এরপর আবার পুনরায় ধ্যানে ডুবে যেতেন। তিনি এখন চাইলে কিছু কিছু ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। যেকোনো প্রকার ধর্মীয় রীতিনীতি ত্যাগ করেছিলেন তিনি। বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজেকে আদম হিসেবে পরিচয় দিতেন তিনি।

তবে সব থেকে বড় পরিবর্তনটি এসেছিল ফকির বাড়ির ব্যবস্থাপনায়। দরবেশ পরিবারের সবার জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। বাইরের সব কাজ জলিলুদ্দীন একাই করে থাকেন। লিনা বাড়ির ছোটখাটো কাজে বিবি হাজেরকে সাহায্য করে। মাঝে মধ্যে সে রাতে এ বাড়িতেই থেকে যায়। এছাড়া এ বাড়ির লোকদের অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে আব্দুল দরবেশ নিষেধ করে দিয়েছেন। বাড়ির নারীদের জন্য পর্দা ব্যতীত কোনো বেগানা পুরুষের সামনে যাওয়া হারাম। বাড়িতে মাছ মাংস রান্না সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এরকমই আরো নানা ছোটখাটো পরিবর্তন এসেছে দরবেশ বাড়িতে যা দরবেশ বাড়ির বাসিন্দাদের জীবন এবং মনস্তত্ত্বকে আমূল পাল্টে দিয়েছে।

সেই ঘটনার ছয় মাস পর....

হুজরাখানার ভেতর থেকে এক ধরনের চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে। কাঠের দেয়ালে আঁচড় কাটলে যেরকম আওয়াজ হয় অনেকটা তেমন। এই মুহূর্তে আদিল হুজরাখানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আসার সময় দেখেছে মা ঘুমাচ্ছেন।

আদিলের উদ্দেশ্য ছিল মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটু বাইরে বের হওয়ার। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে বের হওয়ার কারণ হলো তার অহেতুক প্রশ্ন এড়ানো। আজকে আদিলের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। মা জিজ্ঞেস করলে কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারবে না তাই। আবার মাকে মিথ্যা বলতেও ইচ্ছা করে না তার।

সব মিলিয়ে আদিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যতদূর সম্ভব মায়ের চোখ এড়িয়ে বাড়ি থেকে বের হবে। এরপর যেদিকে দুচোখ যায় কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে এরপর বাসায় ফিরে আসবে। বাড়ি ফিরে মায়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া যাবে। তাই ধীর পায়ে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল সে।

বিধি হয়তো আজকে তার সহায় ছিল। মায়ের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এটা তখনই হয় যখন মা ঘুমিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সময় তো মায়ের ঘুমানোর কথা না। আদিলের মনে পড়লো মা ইদানিং কেমন যেন বদলে গেছেন। চুপচাপ হয়ে গেছেন অনেকটা। বাড়িতে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তাতে মায়ের এহেন পরিবর্তন খুব একটা অস্বাভাবিক না। সেদিন রাজিয়া আপা বলছিলেন একটা দিন এ বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে কাটলে নাকি তিনি মসজিদে সদকা দিবেন। কথাটা একদম খারাপ বলেননি আপা। এইতো সেদিনই আদিল নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। এমন সময় তার মনে হলো সে শূন্যে ভাসছে। চোখ খুলতেই দেখতে পেল সে মায়ের ঘরের কাঠের আলমারিটার উপর বসে আছে। অথচ সে কিভাবে সেখানে পৌঁছাল তার কোনো স্মৃতি তার নেই।

আদিল নিশ্চিত বাড়িটাতে আসলেই অদ্ভুত কিছু হচ্ছে। বাবার ব্যবহারও ইদানিং বেশ বদলে গেছে। পৃথিবীর সকল ধর্মকে তিনি ভিত্তিহীন দাবি করছেন। প্রতিদিন নিয়ম করে মাগরিবের আজানের আগে বাবার কী যেন হয়। চিৎকার করতে থাকেন অনবরত। গালাগালি শুরু করেন পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম এবং ধর্মগুরুদের। সে সময় তার সামনে যাওয়া একেবারেই নিষেধ। কিছু যেন একটা ভর করে তখন তার উপর। চোখ টকটকে লাল হয়ে যায়। মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে। মাগরিবের আজানের পরপরই অজ্ঞান হয়ে যান বাবা। এটা এখন প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা ইদানিং হুজরাখানার ভেতর থেকে একদমই বের হন না। কাওকে হুজরাখানার ভেতরে ঢুকতেও দেয়া হয় না। শুধু নিয়ম করে মা হুজরাখানার ভেতরে তার খাবার দিয়ে আসেন।

"খারাপ জ্বীনের আসর হইছে আব্বার উপরে", মানসুরা আপা সেদিন ফিসফিস করে আদিলকে বলেছিলেন। আদিল জ্বীনে বিশ্বাস করে। কিন্তু আব্বার উপর জ্বীনের আসর হতে পারে তা সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তারপরও যেন তার কোন একটা হিসাব মেলে না।

কিছু জানে না সে। শুধু জানে আব্বা বদলে গেছেন। ভীষণভাবে বদলে গেছেন। আব্বার হুকুমে এ বাড়ির কারো এখন বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। মায়ের চোখ এড়িয়ে বের হওয়ার এটাও একটা কারণ। বাড়ির বাজার সদাই যা প্রয়োজন জালালুদ্দীনই করেন। মাঝে মাঝে লিনা এসে প্রয়োজনীয় এটা সেটা কিনে দিয়ে যায়। পাড়া প্রতিবেশীরাও তাদের এক প্রকার এড়িয়েই চলা শুরু করেছে। পুরো এলাকায় তাদের বাড়িটা যেন কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যেন থেকেও তারা হুট করে এলাকা থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছে।

আদিল বাড়ি থেকে বের হতেই নিয়েছিল এমন সময় হুজরাখানার ভেতর থেকে সেই অদ্ভুত শব্দটা শুনলো সে। একবার ভাবলো পাত্তা দিবে না। এই বাড়িতে কতকিছুই তো হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা গো গো শব্দ ভেসে এলো ভেতর থেকে। আদিল বুঝতে পারলো শব্দটা তার বাবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। বাবার কি কিছু হলো।

ভাবতেই দ্রুত পায়ে হুজরাখানার দরজার বাইরে চলে এলো আদিল। এ দরজাটায় ছিটকিনি জাতীয় কিছু নেই। অনেক আগে নাকি ছিল, বাবার কথায় সেটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তিনি বলতেন ইবাদতের ঘরে তালা দিয়ে রাখা আল্লাহর প্রতি অপমানসুলভ আচরণ। তাই আদিল হাত দিয়ে আলতো স্পর্শ করতেই দরজাটা মৃদু শব্দ করে কিছুটা খুলে গেল। ভেতরে চোখ দিয়ে আদিল যে দৃশ্য দেখলো সে দৃশ্য কোন মতেই এই পৃথিবীর হতে পারে না।

মোমবাতির দোদুল্যমান আলোয় সে দেখলো আব্দুল দরবেশ ঘরের ঠিক মাঝখানে পড়ে আছেন। তার সারা শরীর অসার হয়ে আছে। জ্ঞান আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তার ঠিক পাশের বসে আছে একটা সাদা অবয়ব। দেখতে অনেকটা মানুষের মতোই। উচ্চতায় আট ফুটের কাছাকাছি। অবয়বটার চোখ,নাক, মুখ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল হাত পায়ের আদলটা স্পষ্ট। তার সারা অস্তিত্ব ঠিকরে বেরিয়ে আসছে শুভ্র আলো। অবয়বটি যেন আপাদমস্তক নূরের তৈরী।

আব্দুল দরবেশের উপর ঝুঁকে আছে অবয়বটি। কী করছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আদিল আর নিজের কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারলো না। কাঠের দরজাটায় আরেকটু ধাক্কা দিলো। সামনের দৃশ্যটা আরো কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো তার চোখে। এবং দৃশ্যটা দেখতেই আদিলের হাত পা অসার হয়ে এলো।

সামনের দৃশ্যটাকে সে কোনদিনই কারো কাছে বর্ণনা করতে পারবে না। সে শুধু এটুকু উপলব্ধি করলো যে আব্দুল দরবেশের মাথাটা দু'ভাগ করা। ঠিক মাঝ বরাবর চিড়ে ফেলা হয়েছে সেটা। সেখান দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। রক্ত এবং গলিত চর্বির মাঝে মাঝে সাদা কি যেন দেখা যাচ্ছে। করোটির হাড়।

সেই সাদা অবয়বটি বাম হাতে ধরে রেখেছে আব্দুল দরবেশের মস্তিস্ক। সেটা থেকে চুইয়ে রক্ত পড়ছে মাটিতে। তার ঠিক সামনেই একটি বড় পাত্র, উজ্জ্বল সোনালী বর্ণের। স্বর্ণের নাকি পিতলের বোঝা যাচ্ছে না। পাত্রের সোনালী রঙের উপরে মোমের আলো পড়ে এক অদ্ভুত সোনালী রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাত্রের ভেতরে কোনো একটা তরল। সবুজ রঙের জ্বলজ্বলে তরলটাকে আদিল চিনতে পারলো না।

অবয়বটি তার হাতে ধরা মস্তিস্কটাকে সেই সবুজ তরলে ডুবালো। এরপর আবার...তারপর আরো একবার! আদিল গুণেনি, তবে তার মনে হলো পর পর সাতবার মস্তিষ্কটিকে অবয়বটি সেই সবুজ থকথকে তরল দ্বারা ধৌত করলো। এরপর সেটাকে মেঝের একপাশে রেখে আব্দুল দরবেশের মাথার চেড়া অংশটি দুহাত দিয়ে ফাঁকা করলো। আদিল দেখতে পেল আব্দুল দরবেশের মাথার ভেতরের সেই শূন্যতা। অন্ধকার এক গহ্বর দেখা যাচ্ছে তার ভেতরে।

বইয়ে আদিল পড়েছে কোন ভয়ংকর দৃশ্য দেখলে মানুষের মেরুদন্ড বেয়ে নাকি এক প্রকার ঠান্ডা অনুভূতি নেমে যায়। তার তেমন কিছু লাগছে না। এর পরিবর্তে তার মনে হচ্ছে হৃদস্পন্দনটা যেন কমে আসছে তার। কেমন থেমে থেমে স্পন্দনটা টের পাচ্ছে। পেটের ভেতর এক ধরনের শূন্য অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে পেট এখনই উগরে দিবে ভিতরের সবকিছু।

আদিল চেষ্টা করেও নিজের স্থান থেকে নড়তে পারলো না। সে দেখলো অবয়বটি আব্দুল দরবেশের মাথার ভেতরের গহ্বরটিও সেই সবুজ থকথকে পদার্থ দ্বারা ধৌত করলো। এরপর তার ভেতরে স্থাপন করলো মস্তিষ্কটি। হঠাৎ আদিলের চোখ পড়লো আব্দুল দরবেশের মুখের দিকে। আদিল এতক্ষণ খেয়াল করেনি যে দরজা খোলার ফলে বাইরের আলো আব্দুল দরবেশের উপর পড়েছে। একটা মোটা রেখার মতো কৌণিক ভাবে আলোটা তার বুক থেকে মুখের উপর উঠে গেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখটা। আব্দুল দরবেশ তাকিয়ে আছেন তার দিকে!

খুব স্বাভাবিকভাবেই চোখের পলক ফেলছেন তিনি। মুখে একটা শান্ত হাসি।

দৃশ্যটা আর সহ্য করতে পারলো না আদিল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক গগনবিদারী চিৎকার। কিভাবে সে মায়ের ঘরের সামনে গিয়েছিল মনে নেই তার। তবে জ্ঞান হারানোর আগ মুহূর্তে সে মায়ের চিন্তিত মুখটা দেখতে পেল।

আব্দুল দরবেশ ১৯৯৮ সালে আদম ধর্মের ঘোষণা দেন। আফসারি ব্যতীত দরবেশ পরিবারের প্রত্যেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মের দীক্ষা নেয়া শুরু করেন। প্রথম দিকে দরবেশ পরিবার ব্যতীত বাইরের কাওকে তিনি এই ধর্ম গ্রহণের সুযোগ দেননি। পরবর্তীতে জলিলুদ্দীনের অনেক পীড়াপীড়িতে আব্দুল দরবেশ তাকে এবং তার কন্যা লিনাকে এই ধর্ম গ্রহণ করার অনুমতি দেন। আব্দুল দরবেশ জীবিত থাকা অবস্থায় কেবল এ কয়জনই আদম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আজ জলিলুদ্দীন এবং লিনাকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করেছেন আব্দুল দরবেশ। আদিলের মারফত একটা বিশেষ চিরকুটও পাঠিয়েছেন তিনি। জলিলুদ্দীনকে মাঝে মাঝেই আব্দুল দরবেশ ডেকে পাঠান। কিন্তু লিনাকে তিনি এই প্রথম তলব করলেন। আদিল যখন জলিলুদ্দীনকে বলছিল লিনাকে নিয়ে আসার কথা, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আজাকে কোনো বিশেষ কারণে তাদের ডাকা হয়েছে। আদিলের দেয়া চিরকুট পড়ে কারণটাও স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে।

"জলিল আদম ধর্ম গ্রহণের সময় এসে গেছে!"

"আদম ধর্ম", মনে মনে ভাবলেন তিনি। "আজকে তারা আদম ধর্ম গ্রহন করবে!"

জলিলুদ্দীন আব্দুল দরবেশকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন। তিনি তার প্রতি এতটাই অনুগত যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে তার জন্য বিলিয়ে দিতে পারেন। তার চিন্তা ছিল লিনাকে নিয়ে। সে যদি আদম ধর্ম গ্রহন করতে না চায় তখন কী হবে?

কিন্তু তার ভয়কে অমূলক প্রমান করে দিয়ে লিনা খুশি মনেই রাজি হলো। সে জানালো, জলিলুদ্দীনের পরে সে আব্দুল দরবেশকেই নিজের পিতার স্থান দিয়ে এসেছে। সে আমরণ তার আনুগত্য করে যাবে।

তার মেয়েটা বড্ড লক্ষী হয়েছে, মনে মনে ভাবলেন জলিলুদ্দীন। মাগরিবের আজানের পরে তারা আব্দুল দরবেশের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন।

জলিলুদ্দীন এবং লিনা যখন আব্দুল দরবেশের বাড়িতে পৌঁছালেন, তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। আদিল তাদের দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে এলো। দরজা দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে খাবার ঘর এবং বসার ঘরের একটা সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। ঘরের একপাশে

একটা নিচু কাঠের টেবিল, তার চারদিকে চারটা বেতের চেয়ার। আরেকপাশে দুটো ভগ্নপ্রায় কাঠের সোফা। খাবার টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বলছে। পাঁচটি। এটাই ঘরের আলোর একমাত্র উৎস। টেবিলের উপর কিছু খাবার দাবারও সাজানো আছে।

আদিল তাদের চেয়ারে বসতে বলে হুজুরাখানার ভেতরে চলে গেল। জলিলুদ্দীন লিনার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে হালকা চাপ দিলেন। যেন অভয় দিচ্ছেন লিনাকে। লিনার অবশ্য এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আব্দুল দরবেশের উপর তার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সে বাবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলো।

তারা দুজন পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসলেন। চারপাশটা বড্ড বেশি সুনসান। পুরো বাড়িটাই ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। মোমের শিখাগুলো স্থির অবিচলভাবে আলো বিলিয়ে চলছে। একটা হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ নাকে লাগছে। লিনার মনে হলো যেন হুট করেই সময় থেমে গেছে। কেমন এক ঘোরের ভেতর চলে গেল সে। সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলল। এভাবে কতক্ষণ পার হলো বলতে পারবে না লিনা। হঠাৎ কার যেন ভারী পায়ের শব্দে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। চোখ উঠিয়ে লিনা দেখলো আব্দুল দরবেশ আসছেন। তার গায়ে কালো আলখাল্লা পড়া। মাথায় কালো পাগড়ি। এমন সাজে আব্দুল দরবেশকে লিনা কখনো দেখেনি। তার ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো।

আব্দুল দরবেশ এসে ঠিক লিনার সামনাসামনি দাঁড়ালেন, "কেমন আছো লিনা?"

"জি বাবা, আপনার দয়ায় ভালো।"

"কি জলিল আজকে সামনে যা হতে যাচ্ছে তার জন্য তৈরি তো?

"জি বাবা!"

আব্দুল দরবেশ লিনার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরলেন। লিনার মনে হলো আব্দুল দরবেশকে আজ একটু বেশিই গম্ভীর লাগছে। চোখে কেমন এক অশুভ দৃষ্টি।

।জ বাবা", কোন মতে উত্তর দিলো সে। নিজেই উপলব্ধি করলো তার গলা কাঁপছে।

আব্দুল দরবেশ মৃদু হাসলেন, "তবে মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই পৃথিবীর সকল ধর্ম নানা মিথ্যা কথাবার্তা এবং অনাচারে ভরা। এসব ধর্মই মিথ্যা এবং বানোয়াট। একেক সময় একেক ব্যক্তির স্বার্থের উপর ভিত্তি করে ধর্মগুলো গড়ে উঠেছে। এবং দিন দিন এসব ধর্মের বিবর্তন পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। সকল ধর্মের কেবল একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হলো শোষণ। তাই আমি এ পৃথিবীর সকল ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছি। খোঁজ করেছি শ্বাসত সত্যের। এবং আমি সেই সত্যের সন্ধান পেয়েছি।", একটু থামলেন তিনি। এরপর জোরে শ্বাস নিয়ে আবার বলা শুরু করলেন,

"পৃথিবীতে একমাত্র আদমই সত্য। আদম থেকেই আমাদের সকলের যাত্রা শুরু। আদম থেকেই পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ভেদ শুরু। এই পৃথিবী, নক্ষত্রমণ্ডল, প্রকৃতি, সবকিছু আদমই সৃষ্টি করেছেন নিজের সেবার জন্য। কিন্তু দিনে দিনে আমরা আদমকে ভুলে গেছি। বিভিন্ন উটকো ধর্ম আমাদের আদমের কাছ থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাই বলে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয় না। আদম আদি থেকে অস্তিত্বশীল ছিলেন, অন্ত পর্যন্ত অস্তিত্ত্বশীল থাকবেন। তার মৃত্যু নেই। তিনি কেবল কায়া বদলান। ফিরে ফিরে আসেন এই পৃথিবীতে সত্যের আলো নিয়ে।" আবার থামলেন আব্দুল দরবেশ। লিনা এবং জলিলুদ্দীন কেও কোনো কথা বললো না। লিনা খেয়াল করলো তার গায়ে এক প্রকার শিরশিরে অনুভূতি খেলা করছে।"

"আর এবার আদম সিদ্ধান্ত নিয়েছে এইখানে এই পাপী ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করার। এই ভূখন্ডকে পরিষ্কার করার। আমি বনি আদম! কিংবা আমিই আদম! আপনারা কি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম?"

জলিলুদ্দীন দাঁড়িয়ে গেলেন। তার চোখে অশ্রু। "বাবা, আপনার প্রতিটা কথা আমি শ্রবণমাত্র বিশ্বাস করি। বলেই তিনি আবদুল দরবেশের সামনে মাথা নত করলেন। তার সাথে সাথেই লিনা মাথা নত করলো।

আব্দুল দরবেশ হাসলেন।"দেখুন, আমি অন্যান্য ভণ্ড প্রেরিত পুরুষদের মতো নিজের মহত্ত্ব জারি করবো না। এমনকি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িতও করবো না। আমি কেবল আপনাদের সামনে সত্যের প্রকাশ ঘটালাম। এখন সবকিছু বিবেচনাপূর্বক আপনারা কি আদম ধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক?"

"হ্যা", সমস্বরে বলে উঠলেন দুজন।

"তবে তাই হোক।"

আব্দুল দরবেশ তাদের হাতে কিছু কাগজ দিলেন। লিনা দেখতে পেল তাতে লাল কালিতে আদম ধর্মের উদ্দেশ্য, নিয়ম কানুন এবং প্রার্থনার নানান রীতিনীতির কথা উল্লেখ রয়েছে। পুরো কাগজটাই হাতে লেখা।

"আপনারা একবার এটা পড়ে নিন।" আব্দুল দরবেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন।

লিনা দেখলো কাগজের শুরুতে যা লেখা তার সারমর্ম কিছুক্ষণ আগেই আব্দুল দরবেশ তাদেরকে বলেছেন। কিন্তু কাগজের নিয়ম কানুনগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো:

◆পৃথিবীর একমাত্র উত্তম পুরুষ "আদম" এবং সত্য ধর্ম হলো "আদম ধর্ম"।

◆আদম ধর্মে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই।

◆আদম ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থনার রীতি, সূরা, মন্ত্র ইত্যাদি নেই।

◆জ্ঞান সাধনাই এই ধর্মের একমাত্র ইবাদত।

◆এ ধর্মের অনুসারীদের জন্য সকল প্রকার মাছ মাংস নিষিদ্ধ করা হলো, শুয়োর ব্যতীত।

◆এ ধর্মের অনুসারীরা কেবলমাত্র তাদের সাথেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখেন যারা স্বজ্ঞানে আদম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কেও চাইলে তার ভাই/বোন, চাচা/চাচী, দাদা/দাদি এমনকি নিজ পিতা/মাতার সাথেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

◆আদম ধর্মীয়দের সন্তান জন্মের সাথে সাথেই তার মুখে দাঁড়কাকের রক্ত দিতে হবে।

◆এ ধর্ম প্রেমকে উৎসাহিত এবং নিয়মকে অনুৎসাহিত করে।

◆ এ ধর্মের অনুসারীরা কোন ধর্মের (বিশেষত মুসলমানদের) সাথে কোনো তর্ক বিতর্কে যাবে না।

◆সব সময় মন থেকে মুসলমানদের ক্ষতি চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে এরাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান শত্রু।

◆যে কোনো ধার্মিককে হত্যা করা হালাল এবং পশু হত্যা হারাম ঘোষণা করা হলো। (শুয়োর, দাঁড়কাক এবং পেঁচা ব্যতীত)

◆আদম ধর্মে মৃতদের কোনো জানাজা হবে না। মৃতের জন্য অশ্রু ফেলা এ ধর্মের মানুষের জন্য হারাম।

◆এ ধর্মের কোনো মূলনীতি নেই। আপনার ভেতরের ঈশ্বরই আপনাকে পথ দেখাবে।

.... মোট তেরোটা নিয়ম। নিয়মগুলোর শেষে লেখা,

"পরবর্তীতে আদম এ সকল নিয়ম বাতিল, নতুন নিয়ম প্রণয়ন, সংযোজন এবং পূর্ববর্তী নিয়ম পরিমার্জন করার ক্ষমতা রাখেন।"

পৃষ্ঠাটা উল্টালো লিনা। এরপরের পাতাটা কিছুটা চুক্তিপত্রের আদলে তৈরি। তাতে আদম ধর্ম গ্রহণকারীর স্বাক্ষর চাওয়া হয়েছে। সেই পাতায় লেখা:

"আমি স্বজ্ঞানে, সকল বিষয় বিবেচনা পূর্বক, এটা মানিয়া লইলাম যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম ভিত্তিহীন। একমাত্র সত্য ধর্ম "আদমধর্ম"। আদমই একমাত্র উত্তম পুরুষ।"

উপর্যুক্ত উপলব্ধিপূর্বক আমি পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম এবং ধার্মিকদের সাথে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছি এবং আমৃত্যু নিজেকে আদম ধর্মের সহিত যুক্ত করিতেছি।"

"পৃথিবীর সকল ধর্ম নিপাত যাক।"

এর ঠিক নিচেই একটা স্বাক্ষরের বাক্স। জলিলুদ্দীন তার ভেতর নিজের দু ফোঁটা রক্ত দিলেন। বাবার দেখাদেখি লিনাও একই কাজ করলো।

আব্দুল দরবেশ বললেন, "এবার আপনারা চুক্তিপত্রটি পুড়িয়ে ফেলুন।" সামনেই মোমবাতি জ্বলছিল। লিনা কাগজটির এক মাথা মোমের উপর ধরতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সেটি। তার মনে হলো স্বাভাবিক কাগজের চাইতে এই কাগজগুলো যেন একটু দ্রুতই পুড়ে গেল। আব্দুল দরবেশ এগিয়ে এলেন তাদের দিকে। টেবিলের উপর পড়া কাগজের ছাই তার বুড়ো আঙুলে মাখিয়ে জলিলুদ্দীন এবং লিনার কপালে তিলক একে দিলেন।

"আদম আপনাদের এই চুক্তির স্বাক্ষী রইলেন", খনখনে গলায় বললেন তিনি।"যদি আপনাদের কোন কর্মে এ চুক্তির ব্যতয় ঘটে তবে কঠিন প্রতিশোধ নেয়া হবে"

হা হা করে হাসতে লাগলেন আব্দুল দরবেশ। তার সাথে জলিলুদ্দীনও হাসতে লাগলেন।

লিনার কানে বাজতে লাগলো আব্দুল দরবেশের বলা শেষ কথাটি, "যদি আপনাদের কোনো কর্মে এর ব্যতয় ঘটে তাহলে কঠিন প্রতিশোধ নেয়া হবে!"

হঠাৎ কোথা থেকে যেন দমকা হাওয়া এসে একযোগে মোমগুলো নিভিয়ে দিলো। আব্দুল দরবেশ এবং জলিলুদ্দীন আবার একযোগে হেসে উঠলেন!

সাল ২০০০

নিজেকে আদম হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর পরই আব্দুল দরবেশ বুঝতে পেরেছিলেন তার সময় শেষ হয়ে আসছে। শরীরটাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না ইদানিং। ইসলামের অনুসারী খারাপ আত্মাগুলোও ইদানিং জ্বালাতন করছে খুব। তিনি আরো আগেই ওহী মারফত জানতে পেরেছেন তার পৃথিবী ত্যাগের সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি পরিবারের সবাইকে হুজরাখানার ভেতরে একত্রিত হতে বললেন। তিনি জানেন এদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে যেতে না পারলে তার পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব হবে না।

ঘড়িতে এখন বাজে রাত বারোটা। পরিবারের সবাই আব্দুল দরবেশের হুজরাখানার ভেতরে একত্রিত হয়েছে।ছোট্ট ঘরটিতে তেত্রিশটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির দোদুল্যমান আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে আছে। পরিবারের কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই থমথমে মুখে কিছুর অপেক্ষা করছে। কিসের অপেক্ষা সেই বিষয়ে তারা কেউই নিশ্চিত না।

আব্দুল দরবেশ এক নজরে সবাইকে দেখে নিলেন। মারুফ এবং মানসুরা বাদে সকলেই উপস্থিত আছেন।সবাইকে বসতে বললেন তিনি। এরপর নিজে উঠে দাঁড়ালেন। তার পা দুটো কাঁপছে। একটি দেয়ালে ভর দিয়ে নিজেকে স্থির রাখলেন। শ্বাসকষ্টটা ইদানিং অতিরিক্ত বেড়েছে। প্রতিবার নিঃশ্বাস নেয়ার সময় ফুসফুস আরেক ফোটা বাতাসের জন্য আকুপাকু করছে।

সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি বুলালেন আব্দুল দরবেশ। সবার মুখ অভিব্যক্তিহীন, শূন্য দৃষ্টি। কেবল আদিলের চোখে কিছুটা ভয় ফুটে দেখতে পেলেন তিনি। তাকে কিছুটা বিচলিতও মনে হচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আব্দুল দরবেশ। নিজেকে স্থির করে সকলের উদ্দেশ্যে বলা শুরু করলেন,

"আপনারা সবাই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হয়তো আমি আর কখনো আপনাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারব না। আজকের এই দিনটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজকে আমি সকল ধর্মকে আমার দুপায়ের নিচে পিষ্ট করে যাচ্ছি। যে কোনো ধর্মীয় রীতিনীতি চিরতরে বন্ধ ঘোষিত হল। আপনাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সকল ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। নিশ্চয়ই আদম ই একমাত্র সত্য। একমাত্র বর্তমান। ইসলামের সৈনিকরা আজ নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারাই আমাদের প্রধান শত্রু। বড় বড় বিষয়ে তারা আপনাদের পথ ভ্রষ্ট করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আপনারা সর্তক থাকবেন। কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাদের সাথে কোন ধরণের সম্পর্কে জড়াবেন না। যারা এরূপ করবে তাদের উপর আমার, স্বয়ং আদমের অভিশাপ নেমে আসবে। কোন ধার্মিককে বাড়াবাড়ি বা জোরজবদস্তি করে আদম ধর্মে দীক্ষা দিবেন না। আমার মৃত্যুর পরে আমার কোনো জানাজা দিবেন না , গোসল করাবেন না , কাফনের কাপড় পড়াবেন না । যে কাপড় পড়ে মারা যাব, সেই কাপড়ে সেই অবস্থাতেই আমাকে কবর দিবেন । কোনো কবরখানায় আমাকে নিবেন না, বাড়ির ভিতরে গর্ত খুড়ে আমাকে কবর দিবেন । আমার মাথা থাকবে পূর্বে, পা থাকবে পশ্চিমে আর মুখ দক্ষিন দিকে ঘুরানো থাকবে । সাবধান! যদি আমার নির্দেশের কোনো ব্যতয় ঘটে তবে মনে রাখবেন, আমি ফিরে আসবো এবং কঠিন শাস্তি দিবো। আমি কি আপনাদের নিকট আমার বাণী স্পষ্টরূপে পৌছাতে সফল হয়েছি?"

সবাই একসাথে বলে উঠলো, "হ্যা"। আব্দুল দরবেশ মৃদু হাসলেন।

"আমার অনুপস্থিতিতে আদম উপাধিপ্রাপ্ত হবে আমার বড় পুত্র মারুফ। আপনারা তাকে দ্রুত দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার তলব পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এবং এখানে যারা অনুপস্থিত আছে তাদের নিকট আমার এই বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমি আপনাদের হাতে ন্যস্ত করলাম। আমি খুব দ্রুতই আপনাদের মাঝে ফিরে আসবো। আশা করি আপনাদের মনের সকল সংশয় দূরীভূত হবে। মনে রাখবেন, আমরা পৃথিবীর একমাত্র পরিবার যারা স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল। মুহাম্মদের

আইনের বাইরে এবং সব ধর্মের সব কার্যকলাপের বাইরে। আমরা হলাম আদম। সবার উপরে আদম সত্য! আপনারা এবার প্রস্থান করতে পারেন। বিদায়।"

ঘরে জ্বলতে থাকা তেত্রিশটা মোমবাতি একই সাথে নিভে গেল!

রাত প্রায় বারোটা। ময়মনসিংহের কাশরে রাত বারোটা অর্থ গভীর রাত। এ সময় শুধু গৃহস্থ নয় টহলদাররাও ঝিমিয়ে নেয়। কিন্তু শামসু জানে তার পেশার জন্য রাতের এ সময়টা আদর্শ। শুধু শামসু নয় তার পেশার সকলেই এটা জানে।

ওস্তাদ বলতেন, "বুঝছিস রে শামসু, রাত বারোটায় আল্লাহ্ আমাগো পেশায় বরকত দেয়।"

ওস্তাদ সবসময় সত্য কথা বলতেন। বড় পরহেজগার মানুষ ছিলেন। এই যে শামসু এখন খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারছে সেটা ওস্তাদের কারণেই। তার শিখিয়ে দেয়া কৌশলগুলো অবলম্বন না করলে কবে পেট শুকিয়ে মরে পরে থাকতো সে।

যদিও চুরি ডাকাতি শামসুর তেমন একটা ভালো লাগে না। তারপরও এগুলো পেটের দায়ে করতে হয়। ওস্তাদ বলতেন, "পেটের টানে মাইনষে মানুষের মাংস খায়,আর আমরা তো হুদা যাগো বেশি আছে ত্যাগো থেইকা অল্প কিছু লই। কুরআনে আল্লায় সম্পদশালীদের সম্পদে গরিবের অধিকারের কথা বলছেন। কিন্তু অহন মানুষ তো আর মানুষ নাই রে শামসু, তাই আমাগো নিজেগো অধিকার নিজেগোই আদায় কইরা নিতে হয়। এগুলানে পাপ নাই।"

শামসু ওস্তাদের কথা বিশ্বাস করে। এজন্যই সে কখনো গরিবের বাড়িতে চুরি করেনি। যখন কারো বাড়িতে সে চুরি করতে যায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনো নেয় না। যেমন গতবার চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে দুইটা মুরগি চুরি করছিল। শামসু জানতো এ দিয়ে তার বেশ কয়েকদিন ভালোভাবে চলে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। চেয়ারম্যনের দারোয়ানের হাতে ধরা পরে যায় সে। এরপর তার উপর চলে অমানসিক নির্যাতন। চুরির অপরাধে গ্রাম ছাড়া করা হয় তাকে।

"হেহ, দুইটা মুরগির কত খেল!" বিষন্ন হাসে শামসু। বুকের কাছটা দলা পাকিয়ে আসে। পাত্তা দেয় না সে।

কিন্তু নিজের গ্রামের ভালোবাসা কি আর ত্যাগ করা অত সহজ? স্বয়ং দ্বীনের নবী মক্কার জন্য চোখের জল ফেলেছিলেন। শামসুও নিজের গ্রামের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি। গ্রামের কিছুটা বাইরের দিকে জঙ্গলের মতো একটা জায়গা আছে। সেখানেই কোনমতে একটা ভাঙা শিবমন্দিরে আস্তানা গেড়েছে সে। সাপ খোপের ভয়ে সেদিকটাতে কেও পা বাড়ায় না। তার উপরে আবার পরিত্যাক্ত মন্দিরে ভূতের ভয় তো আছেই।

প্রথম দিকে শামসুও খানিকটা ভয় পেত। কখন কালসাপের কবলে পরে প্রাণটা খাঁচাছাড়া হয়ে যায় সেই ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকতো সে। এখন আর সেই ভয় নেই।

না, মন্দিরে সাপ আছে ঠিকই। কিন্তু ওগুলো তাকে কিছু বলে না। হয়তো তারা বুঝতে পেরেছে শামসু তাদের চাইতেও বেশি অভাগা।

যখন পেটে টান পড়ে গ্রামে ফিরে আসে শামসু। নিজের অধিকার আদায় করে নিয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। আগে ঘন ঘন আসতে হতো। গত বছর মা টা মারা যাওয়ার পর এখন মাসে একটা খেপ পেলেই বাকি মাসটা আরামসে কেটে যায়।

আজকে শামসুর লক্ষ্য দরবেশ পরিবেশ। এই পরিবার নিয়ে পাড়া মহল্লায় কানাঘুষা বেশ আগে থেকেই। কয়েকবার তার কানেও এসেছে কিছু উদ্ভট কথাবার্তা। অন্য সময় হলে শামসুও হয়তো সেসব কথাবার্তায় বিশ্বাস করে ফেলতো কিন্তু দরবেশ পরিবারের আনোয়ার দরবেশকে সে ভালোভাবে চেনে। লোকটা অত্যন্ত ভালোমানুষ। কতবার যে রাস্তায় তার সাথে দেখা হলে পাঁচ দশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন তার ইয়াত্তা নেই।শামসু যতই নিজেকে প্রস্তুত করুক না কেন কখনো তার আগে সালাম দিতে পারেনি। লোকটা আসলেই অতি সজ্জন মানুষ। এ জমানায় এমন মানুষ পাওয়া ভার।

এমন মানুষের বাড়িতে চুরি করার কোনো ইচ্ছা শামসুর ছিল না। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে এদিকে আর তেমন সুবিধার খেপ পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে খাবার দাবার ফুরিয়ে গেছে আগেই। গাছের পাতা চিবিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে চারটা দিন। পেটের টান আর সহ্য হচ্ছে না তার।

দূরের থেকে পাকা ঘরটাকে দেখতে পেয়ে তাই শামসুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আজ আকাশে বেশ বড় একটা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় চারদিক ফকফকা হয়ে আছে।

আইজ পূর্ণিমা নাকি! ভাবলো শামসু। আকাশের দিকে তাকালো। না, পূর্ণিমা না। চার ভাগের তিন ভাগ চাঁদ দেখা যাচ্ছে সেখানে। তবে সেই চাঁদের জ্যোৎস্না প্রবল।

চারদিকে একঘেয়ে সুরে ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাসে হঠাৎ হঠাৎ মিষ্টি শিসের মতো আওয়াজ হচ্ছে। গাছপালাগুলো যেন নিজেদের মধ্যেই কথা বলছে মাথা দুলিয়ে। সেই একঘেয়ে ছন্দে বাঁধ সেধে দূরে কোথাও তক্ষক ডেকে উঠলো। আকস্মিক সেই ডাকে শামসু কিছুক্ষণের জন্য চমকে উঠে পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল।

শামসুর হঠাৎ মনে হলো এই পরিবেশ নদীর ধারে বসে বাঁশি বাজানোর পরিবেশ। চেয়ারম্যান বাড়িতে যেই মেয়েটা কাজ করে, কমলা নাম, তাকে পাশে বসিয়ে তার চোখের আবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলার পরিবেশ। কিন্তু শামসু জানে পেটে ক্ষুধা নিয়ে নিজেকে হারানো যায় না। পেটের ক্ষুধা প্রকৃতিকে উপভোগ করতে দেয় না। তাই সে মাথা থেকে এসব চিন্তা ভাবনা দ্রুত সরিয়ে ফেলে।

দৃঢ় অথচ ধীর পায়ে আগায় দরবেশ বাড়ির দিকে। বাড়ির কাছে যেতেই শামসুর মনে হলো বাইরের দরজাটা খোলা। কিন্তু সেটা পরখ করার মতো বোকামি সে করবে না। ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে ঝোপঝাড়ে ভরা জঙ্গুলে জায়গাটায় ঢুকে পড়ল সে। নাম না জানা কোনো ঝোঁপের কাঁটা লেগে তার বাম হাতটা ছিড়ে গেল অনেকখানি। মুখ বন্ধ রেখে ব্যাথাটা গিলে ফেলল সে।

ধীর পায়ে ঝোপঝাড় কাটিয়ে বাড়ির পেছন দিকটায় এসে পড়লো। এখন সে চাইলে সরাসরি জানালা কেটে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারতে পারে। কিছুক্ষণ ভেবে সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিলো সে। তাড়াহুড়া করলে চলবে না। তাড়াহুড়া হলো শয়তানের স্বভাব।

শামসুর পাশেই একটা বিরাট আম গাছ। সেটা বেয়ে উপরে উঠে এলো সে। ঘরটাকে আগে একটু পর্যবেক্ষণ করতে চায়।

আব্দুল দরবেশের বাড়ির পেছনের দিকটা এখন সে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে। পাশেই নতুন বিল্ডিং এর কাজ চলছে। কনস্ট্রাকশন সাইটে আলো জ্বলছে। শুভ্র আলোয় বাড়ির পেছনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে একদল নারী পুরুষ কিছু একটা করছে। শামসুকে কেও বলে দেয়নি কিন্তু সে জানে চোখের সামনে যে নারী পুরুষগুলোকে সে দেখতে পাচ্ছে তারা এই দরবেশ পরিবারেরই সদস্য। কিন্তু এত রাতে তারা এখানে কী করছে!

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই শামসু আবার চোখ পিটপিট করে তাকালো। সাথে সাথে তার বুকটা ধক করে উঠলো। প্রত্যেকের হাতে কোদাল।

এরা মাটি খুঁড়ছে!

এক অজানা ভয়ে শামসুর ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সে ঠায় তাকিয়ে রইলো সেদিকে। বা হয়তো কোনো অজানা শক্তি তাকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করলো।

কানের সামনে জঙ্গুলে মশা বন বন করছে। শামসুর শরীর থেকে যতটুকু সম্ভব রক্ত শুষে নিচ্ছে তারা। পেটের দায় সবার জন্য সমান। তবে শামসুর সেদিকে খেয়াল নেই। সে অবাক হয়ে দেখছে তার চোখের সামনের গর্তটা ধীরে ধীরে একটা কবরের আকার নিয়ে নিচ্ছে।

এ বাড়িতে কেও কি মারা গিয়েছে? কে সে? আব্দুল দরবেশ?

জানে না শামসু। ঐ তো কবরের ঠিক সামনেই আব্দুল দরবেশকে দেখা যাচ্ছে। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। মাথায় টুপি। বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছেন তিনি। অনেকটা পৌত্তলিক মন্ত্রের মতো একঘেয়ে সুর সেটার। তার মানে আব্দুল দরবেশ মারা যাননি। জানে না কেন কিন্তু ব্যাপারটা স্বস্তি জোগাতে পারলো না শামসুর ক্ষুদ্র মনে। একপর্যায়ে সে বিস্ফোরিত নয়নে দেখল আব্দুল আকাশের দিকে তার তর্জনী উঁচু করলেন। সেই সাথে সমস্বরে সকলে সেই একঘেয়ে সুরে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো।

সেই আদিম মন্ত্র শামসুর অস্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। এ মন্ত্র কোনো মানব কানের জন্য সুখকর হতে পারে না। ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠলো তাকে পালাতে হবে। যেভাবেই হোক এই বিভীষিকাময় বাড়ি থেকে দূরে যেতে হবে তাকে। নিজের ভেতরের সকল শক্তি এক করে গাছ থেকে নামার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। গাছের ছোট্ট একটা ডালে তার পরনের গেঞ্জিটা আটকে গেল। শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে এক টানে গেঞ্জিটা ছিড়ে ফেলল সে। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে। হাতের টানে গাছের ডাল ভেঙে মট করে শব্দ হলো। সে ফিরে তাকালো দরবেশ পরিবারের অভিশপ্ত সদস্যদের দিকে। আর ঠিক তখনই.....ঠিক তখনই তার চোখগুলো আব্দুল দরবেশের উপরে এসে স্থির হয়ে গেল।

তার দিকেই তাকিয়ে আছেন তিনি। তার চোখের দৃষ্টিতে....সেই দৃষ্টিতে ঘৃণার লাল আগুন জ্বলছে। মুখের হাসিতে স্পষ্ট বিদ্রুপ। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করলো শামসুর। তার যেভাবেই হোক এই গাছ থেকে নামতে হবে। একবার এখান থেকে বের হতে পারলে আর কোনদিন এ গ্রামমুখো হবে না শপথ করলো সে।

পালানোর আদিম তাগিদেই হয়তো জীবনের শেষ ভুলটা করে বসলো শামসু। নিচের প্রায় ভঙ্গুর ডালটাতে তার বাম পা টা রাখলো। সাথে সাথে মৃদু শব্দ তুলে ডালটা ভেঙে গেল। পা টা শেষবারের মতো কোন কিছুকে অবলম্বন করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য হারালো। গাছ থেকে নিচে পড়ে গেল শামসুর শীর্ণ দেহটা। তার তীব্র আর্তচিৎকারে রাতের নীরবতা খান খান হয়ে গেল!

আব্দুল দরবেশের ডায়েরি

১৩ মে ২০০০

সময় আর হাতে বেশি নেই। ইসলামের অভিশপ্ত সৈনিকরা বারবার হামলা চালাচ্ছে। আমাকে তারা সাথে করে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু এ আমি কিছুতেই হতে দিবো না। আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। পৃথিবীর সকল ধর্ম নিপাত যাক!

২৩ মে ২০০০

শরীরে শক্তি নেই মোটেও। আমি বনি আদম বলছি। আমাকে ইসলামের সৈনিকরা বারবার হামলা করছে। এদের ধ্বংস অতি নিকটে। সবার উপর আদম সত্য!

১ জুন ২০০০

বিছানা থেকে উঠতে পারছি না। ওরা আমার লেখা বন্ধ করে দিতে চায়। এদের আমি নিজ হাতে শাস্তি দিবো। সময় এসেছে অন্তিম সিদ্ধান্ত নেয়ার। সকলকিছুর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

১৫ জুন ২০০০

ইসলামের সৈনিকদের পস্তাতে হবে। শেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সবার উপরে আদম সত্য!

আদিল উপলব্ধি করলো আব্দুল দরবেশের সময় ফুরিয়ে আসছে। তার মুখে ব্যথার ছাপ স্পষ্ট। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তার। জোরে জোরে দম টানছেন। বাতাসগুলো নাসিকারন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করে যেন মাঝপথে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না।প্রতিবার শ্বাস টানার সাথে সাথে এক প্রকার গো গো শব্দ হচ্ছে। হা হয়ে যাচ্ছে মুখটা।ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। চোখের মনিগুলো উল্টে যাচ্ছে বারবার। তখন কেবল চোখের সাদা অংশটুকু দৃশ্যমান হচ্ছে। পুরো দৃশ্যটাই প্রচণ্ড রকমের জঘন্য। একই সাথে নোংরা এবং পীড়াদায়ক। অথচ তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি।

না, তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ঠিকই। প্রতিবার দম নেয়ার সাথে সাথে অক্সিজেনের অভাবে হাহাকার করে উঠছে সমস্ত সত্ত্বা। তারপরও কী যেন একটা আছে। এক অদ্ভুত প্রশান্তি যেন ফুটে উঠছে তার অস্তিত্ব ঠিকরে। শ্বাসকষ্টের প্রবল দমক তার সেই প্রশান্তিকে একবিন্দু ম্লান করতে পারছে না।

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে আদিল। এত কষ্টের মাঝে একটা মানুষকে এতটা প্রশান্ত দেখায় কিভাবে! নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো সে।

তারা এখন বসে আছে ময়মনসিংহের এক নাম করা সরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে। চারদিকে ওষুধ আর ধুলার বোটকা গন্ধ। চারপাশে বিভিন্ন বয়সী রোগী দেখা যাচ্ছে। কেও একসিডেন্ট করেছে আবার কেও বাবা মায়ের সাথে রাগ করে ঘুমের ঔষুধ গলধঃগরন করেছে। চারদিকে যেন মৃত্যুর দূতেরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তাদের পরবর্তী শিকারের জন্য।

"কী হয়েছে ওনার?" এক অপরিচিত গলার আওয়াজে আদিল পেছন ফিরে তাকালো। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ের সাদা এপ্রোন দেখে

আদিল বুঝতে পারলো ইনি ডাক্তার। চোখে সোনালী ভারী ফ্রেমের চশমা। মুখে পেশাদার হাসি।

"বেশ কিছুদিন ধরেই ওনার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা। কোনরকম খাওয়া দাওয়া করতে......"

আদিল ব্যাখ্যা করার আগেই ডাক্তার স্থেটেস্কোপ বের করে আব্দুল দরবেশকে পরীক্ষা করা শুরু করলেন। আদিল লক্ষ্য করলো ক্রমেই ডাক্তারের মুখভাবে পরিবর্তন আসছে।

"হুমম....মনে হচ্ছে কার্ডিয়াক এটাক", বললেন তিনি। কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ। "এখনই ওনাকে সিসিইউতে নেয়ার ব্যবস্থা করো।"

ডাক্তার শেষ কথাটা কাকে বললেন আদিল প্রথমে বুঝতে পারলো না। তার প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন একজন নার্স এবং দুজন ওয়ার্ড বয় এগিয়ে এলো। তারা আব্দুল দরবেশকে দ্রুত সিসিইউ এর দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

আদিল তখনো আগের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন এক ঘোরের মধ্যে আছে। কালকে রাতের ঘটনাগুলো সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। যা দেখেছে, শুনেছে তা সব কি সত্য? বাবার সাথে কি তবে এই তার শেষ দেখা?

"আপনি রোগীর কী হন?" ডাক্তার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"ছেলে", আদিল বললো।

"কখন থেকে ওনার এই অবস্থা?"

"বেশ কিছুদিন ধরেই বাবার শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু কালকে রাত থেকে..."

ডাক্তার তার ডান হাতটা আদিলের কাঁধে রাখলেন। এরপর সমবেদনা জানানোর ভঙ্গিতে বললেন, "আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। আপনি রোগীর বাড়ির লোকদের খবর দিন। যে কোনো

সময় তাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।" বলেই ভদ্রলোক ইমারজেন্সির বাইরে চলে গেলেন।

আদিল আগের জায়গায়ই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

২০২০ সালের ১১ জুলাই

আব্দুল দরবেশ ঢাকার এক পরিচিত হাসপাতালে নিজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার সাথে শেষ মুহূর্তে ছিলেন আদিল, মারুফ এবং জলিলুদ্দীন ছিলেন। আব্দুল দরবেশ মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেই মারুফ বাড়ি ফিরছিলেন। শেষ কয়টা দিন আব্দুল দরবেশের সাথে সব থেকে বেশি সময় তিনিই কাটিয়েছেন।

তার মতে মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল দরবেশ বারবার ইসলামের সৈনিকদের দ্বারা আক্রমিত হওয়ার দাবি তুলছিলেন। ইসলামের সৈনিকরা তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার চেষ্টা করেছে এমন দাবিও তোলেন তিনি। কিন্তু কোনো ভিত্তি না থাকায় তার কথাকে ডাক্তাররা পাগলামি হিসেবেই আখ্যায়িত করেন।

মারুফের কাছ থেকে আব্দুল দরবেশেকে হাসপাতালে ভর্তি করার আগের দিনের কিছু অদ্ভুত ও চমকপ্রদ ঘটনা জানতে পারা যায়। তার মতে সেই ঘটনার সাক্ষী কেবল দুজন। সে এবং আদিল। কিন্তু এ ঘটনারও কোনো পোক্ত প্রমান না থাকায় এটাকেও সকলে ভ্রম বলে মনে করে।

ঘটনার প্রয়োজনে আমরা এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে সেই কৌতূহলউদ্দীপক ঘটনাটি তুলে ধরবো।

আব্দুল দরবেশের মৃত্যুর তিন দিন পর....

আদিল নিজের ঘরে বসে আছে। এই ঘরে আগে মারুফ থাকতেন। সে চলে যাওয়ার পর থেকেই ঘরটা আদিলের দখলে চলে আসে। ঘরটা যদিও তুলনামূলকভাবে ছোট, তারপরও ঘরটাকে খুব ভালোবাসে সে। নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে সেটাকে।

তার ঘরের বামদিকে একটা সেমি ডাবল খাট। খাটের ডানদিকে একটা কাঠের টেবিল। বহুদিনের ব্যবহারের ফলে বার্নিশ উঠে গেছে। তার উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু ধুলোমাখা বই। টেবিলের সাথে রাখা চেয়ারটার একটা পায়া সামান্য ভাঙা। আদিল যখন টেবিলে বসে তখন ভাঙা পায়ার কারণে চেয়ারটা হালকা দুলে ওঠে। টেবিলের ঠিক সামনেই ছোট্ট জানালাটায় হালকা সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে। এই জানালাটা দিয়ে আগে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। সবুজ ঝোপঝাড় আর সতেজ গাছপালায় এক নিমিষেই মনটা ভালো হয়ে যেত। সেখানে এখন জানালা দিয়ে শুধু কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতে থাকা লাল ইটের বিল্ডিংটা দেখা যায়। সেখানে শ্রমিকরা সারাদিন কাজ করে। বেশিরভাগই খালি গায়ে থাকে, কারো কারো পরনে থাকে ধুলো মাখা সাদা গেঞ্জি। সন্ধ্যা নামলে মাটির চুলায় খাবার চড়ায় তারা। মাঝে মাঝেই সেখান থেকে খিচুরির মন মাতানো ঘ্রাণ ভেসে আসে। কেও কেও হঠাৎ-ই খালি গলায় গান শুরু করে। বাকিরাও তার সাথে তাল মেলায়। এদের বিচিত্র জীবন যাপন দেখতে আদিলের ভালো লাগে। জানালার উল্টোদিকে একটা মাঝারি সাইজের আলনা। আলনাতে আদিলের কাপড় ঝুলছে। ঘরে আসবাব বলতে এ ক'টাই। তাতেই ছোট্ট ঘরটার প্রায় অনেকখানি জায়গা দখল হয়ে গেছে। এই ছোট্ট ঘরটাকে নিজের পৃথিবী মনে হয় আদিলের।

পাশের বিল্ডিং থেকে কে যেন জোর গলায় গান ধরলো,

"দে দে পাল তুলে দে

মাঝি হেলা করিস না....."

আদিল উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলো। বিল্ডিঙে কাজ করতে থাকা লোকগুলোকে কেন যেন আজ সহ্য হচ্ছে না তার। আরেকটু পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে কাউকেই এখন আর তার সহ্য হচ্ছে না। কেমন যেন অস্থির করা এক শূন্যতা চারদিকে। পৃথিবীর সবকিছু যেন হুট করেই অর্থহীন হয়ে গেছে। আব্দুল দরবেশের মৃত্যু তার ভেতরে এই শূন্য অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। "বাবা নেই", শব্দ দুটো যেন বারবার নীরবে তাকে ব্যঙ্গ করে চলছে।

"বাবা নেই।"

আব্দুল দরবেশের মৃত্যু আদিলকে কষ্ট দিয়েছে। তবে এর থেকেও বড় সত্য হলো, এলাকাবাসীর আচরণ তাকে বিচলিত করেছে প্রচণ্ডভাবে।

আব্দুল দরবেশকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনার পর পর ই একদল প্রতিবেশীর আগমন ঘটে। তারা জানায় তারা আব্দুল দরবেশের দাফনের কাজে সাহায্য করতে এসেছে।

হাসলো আদিল। তীব্র ঘৃণা আর শ্লেষমাখা সেই হাসি। "দাফনের কাজে সাহায্য।" বিড়বিড় করলো সে। "যত্তসব !"

আদিল এবং মারুফ মিলে প্রথমে তাদের নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করে। আব্দুল দরবেশের লিখে যাওয়া চিরকুট তাদের দেখানো হয়।জলিলুদ্দীনও তার সাধ্যমত চেষ্টা করছিল সবকিছু সামলানোর। মারুফের এক বিশাল বক্তব্যের পর এক পর্যায়ে প্রতিবেশীরা কিছুটা শান্ত হয়। তারা একটা আপসে আসতে রাজি হয়। আদিলের মনে হয়েছিল হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু তখনই আগমন ঘটে সেই সাদা আলখাল্লা পড়া লোকটার। মসজিদের ইমামসাহেব।

থু করে একদলা থুথু ফেলল আদিল। মুখের ভেতরে তিক্ত সাধ অনুভব করলো। লোকটা আসার পরই এলাকাবাসী কেমন পাল্টে যায়। তারা আর কিছু বুঝতে চাইছিল না। হঠাৎ-ই সবাই যেন কেমন উগ্র হয়ে উঠেছিল। সবাই মিলে যখন বাড়ির কাঠের দরজায় ক্রমাগত কড়া নাড়ছিল আদিল তখন দুই কানে হাত দিয়ে ঘরের এক কোণায় বসে ছিল। তার সামনে পড়ে ছিল আব্দুল দরবেশের লাশ। যেন ঘুমিয়ে আছে। এক প্রশান্তিময় হাসি তার মুখে। পুরো শরীর ঠিকরে বেরিয়ে আসছে এক শুভ্র আভা।

সাদা আলখাল্লাধারী ইমাম সাহেব পরামর্শ দিলেন পুলিশ ডাকতে। প্রতিবেশীরা সবাই তার কথায় একমত হলো। যেন আব্দুল দরবেশের লাশ তার পরিবারের কাছে থাকাটা কোন অপরাধ!

তার কিছুক্ষণ পরই অন্দরমহল থেকে ডাক এলো। মা ডেকেছেন মারুফকে। কিছুক্ষণ কথা বলার পরে ভাইয়া বেরিয়ে এলেন। তার চেহারায় রাজ্যের ক্লান্তি যেন এসে ভর করেছে। চোখে তীব্র ঘৃণা এবং পরাজয়ের দৃষ্টি। রূঢ় গলায় আদেশ দিলেন,"দরজা খুলে দে আদিল। আব্বার লাশ নিয়ে যেতে দে এদের!"

আদিল অবাক দৃষ্টিতে তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার নিজের কানকে। বাবার সতর্কবাণীগুলোর কথা একে একে মনে পড়ে গেল তার। সেদিন রাতে বাবার প্রতিটা কথা বেজে উঠতে লাগলো কানে।

আদিলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মারুফ আবারো বলে উঠলেন, "দরজা খোল!"

এরপর আদিলের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। প্রতিবেশীদের চেহারায় সেদিন এক অদ্ভুত উন্মাদনা দেখেছিল আদিল। যেন আব্দুল দরবেশের লাশ তাদের কোনো বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন এই লাশ দাফন করা না হলে ধর্ম রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে উঠবে তাদের জন্য।

এরপর কি হয়েছিল আদিলের খেয়াল নেই। সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছিল সে। চোখ খোলার পর নিজেকে নিজের ঘরে আবিষ্কার করেছিল। প্রথমে তার মনে হয়েছিল যা দেখেছে সব স্বপ্ন। এখনই হুজরাখানার বাইরে কান পেতে দাঁড়ালে বাবার গম্ভীর

ডাক শুনতে পাবে। দৌড়ে গিয়েছিল আদিল হুজরাখানার দিকে। এক ধাক্কায় খুলে ফেলেছিল পুরোনো দরজাটা।

নেই! বাবা নেই! পুরো ঘরটা খাঁ খাঁ করছিল। সেই আসন, ছোট্ট ট্রাংক, পানির পাত্র, মোমবাতি, ভারী পর্দা সবকিছু জায়গামতো আছে। কেবল বাবা নেই! এই ঘরটাকে প্রাণবন্ত করে রাখার মানুষটা নেই!

বাস্তবতাটা আবার যেন নতুন করে আঘাত হেনেছিল তার অস্তিত্বে। টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছিল আদিল।

তখনই পাশের ঘর থেকে কার যেন হাসির শব্দ শুনতে পায় সে। কারা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসছে। শব্দটা মায়ের ঘর থেকে আসছে। যেন কয়েকশ মানুষ মায়ের ঘরে জড় হয়েছে। হাসছে তারা।

মার ঘরে কারা এরা? প্রতিবেশীদের কেও?

কৌতূহলটা আর চেপে রাখতে পারেনি সেদিন আদিল। মানসিক অস্থিরতা তাকে যেন উন্মাদ করে তুলছিল। প্রথমবারের মতো মায়ের অনুমতি ছাড়াই তার ঘরের দরজায় হাত রাখে সে। দরজাটা খোলাই ছিল। আলতোভাবে স্পর্শ করতেই একটু ফাঁক হয়ে যায় সেটা। ভেতরের দৃশ্য হঠাৎ করেই আদিলের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছিল। মেঝেতে বসেছিলেন মা। তার পাশে ভাইয়া আর রাজিয়া আপা। তিনজনে মুখোমুখি বসা। সম্পূর্ন নগ্ন। পাগলের মতো হাসছেন তারা। তবে সেই হাসিটা....সেই হাসিটা যেন তাদের অস্তিত্বকে স্পর্শ করতে পারছিল না। তাদের চোখগুলো বরফ শীতল, অভিব্যক্তিহীন। যেন মরা মানুষের চোখ। বিচ্ছিরি অট্টহাসির দমকে মা এবং রাজিয়া আপার স্তনগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভাইয়ার মুখ দিয়ে লালা ঝড়ছে।

"আদিল......", অস্পষ্টভাবে নিজের নামটা শুনতে পেল আদিল। প্রথমে সে ভেবেছিল ভাইয়া ডাকছে। এরপর বুঝতে পারলো রাজিয়া আপার কণ্ঠস্বর সেটা।

"আদিল....." ,মা য়ের গলার মতো শুনালো এবার। কিন্তু এরা তিনজন এখনো তার সামনে। একইভাবে হাসছে তারা। অট্টহাসির কারণে এদের মুখ বিকৃত হয়ে আছে। মুখের ভেতরে দেখা যাচ্ছে এবড়োথেবড়ো দাঁত আর কালো জিভ। এরা কেও ডাকছে না তাকে। আদিল নিশ্চিত এরা কেও ডাকছে না তাকে। কারো মুখ নড়ছে না এদের। শুধু এক নাগাড়ে টানা হেসে চলছে উন্মাদের মতো।

আদিল এরপর যখন চোখ খুলেছিল তখন একদিন পার হয়ে গেছে। মানসুরা আপার কাছে জানতে পারে সেদিন এলাকাবাসীর বিধি মোতাবেকই বাবার দাফন সম্পন্ন হয়। দাফনে তাদের পরিবার থেকে কেও অংশ নেয়নি। এলাকাবাসীর মর্জিতেই সবকিছু সম্পন্ন হয়।

শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। সে যদি......

"আদিল বাবা", মায়ের কণ্ঠে বাস্তবে ফিরে এলো আদিল।

"জি মা", নির্বিকারভাবে উত্তর দিলো সে। সেদিনের মায়ের ঘরের দৃশ্যটা মন থেকে মুছতে পারেনি আদিল। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে মায়ের নগ্ন দেহ, ঘোলা চোখ আর কালো জিভের কথা।

"আয় খেয়ে নে।"

বিবি হাজেরা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন কিছুই হয়নি। বাবা মারা যাওয়ার আগে প্রতিদিন আদিলকে তিনি এভাবেই খেতে ডাকতেন।

"জি", সংক্ষেপে উত্তর দিলো আদিল। কিন্তু বিছানা থেকে উঠলো না সে।

বিবি হাজেরা আদিলের পাশের এসে বসলেন। তার শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ আদিলের নাকে লাগল। এ গন্ধটা আদিলের পরিচিত নয়। কেমন এক নেশা ধরানো গন্ধ। মায়ের শরীরে সে আগে কখনো এমন গন্ধ পায়নি।

বিবি হাজেরা একটা হাত রাখলেন আদিলের মাথায়। আদিলের কালো চুলগুলোতে আঙুল বুলাতে বুলাতে বললেন, "মন খারাপ করিস না বাবা। তোর আব্বা জলদি এসে পড়বেন।"

মা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে আদিলের মনে হলো আব্বা হয়তো মসজিদে কিংবা বাজার করতে গিয়েছেন। কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে আসবেন। কিন্তু এখন বাস্তবতা ভিন্ন। আদিল জানে বাবা আর কোনদিনই ফিরে আসবেন না। কথাটা ভাবতেই পরিচিত কষ্টটা আবার বুকের মাঝে মোচড় দিয়ে উঠলো। গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে আটকে রইলো এক মুঠো কষ্ট।

"আয়, খেয়ে যা। এখন দুর্বল হলে চলবে না। সামনে অনেক কাজ বাকি", বলে মা উঠে গেলেন।

যেতে যেতে বললেন,"সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছে।"

"এখনো অনেক কাজ বাকি", কথাটা আদিলের কানে বাজতে লাগলো। বাবাও আদিলকে এ কথাটা বহুবার বলেছেন। কী কাজ বাকি তার?

আফসারির কাছে এই বাড়ির মানুষগুলোকে সবসময়ই অস্বাভাবিক মনে হয়। হাঁড়ির ডালটা নাড়তে নাড়তেই ভাবলো সে।

ছোটবেলা থেকেই সে বাবাকে শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগী করতে এবং বই পড়তেই দেখে এসেছে। বাবা নামক মানুষটা সব সময়ই তার থেকে ছিল খুব গম্ভীর। যোজন যোজন দূরত্ব ছিল যেন তাদের মাঝে।

মায়ের সাথেও যে আফসারির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তা না। তার সব সময়ই মনে হতো মা একটু বেশিই বাধ্য। বাবার কথা ছাড়া তিনি এক চুলও নড়েন না। তাছাড়া মায়ের বেশিরভাগ সময়ই কেটে যেত বাবার সেবা এবং ঘরের এটা ওটা করতে করতেই। কাজ শেষে যেটুকু সময় পেতেন সেটুকু নিজের ঘরে চুপচাপ কাটিয়ে দিতেন তিনি। তাই সহজাত ভাবেই তার সাথেও দুরুত্বটা তৈরি হয়েছিল।

তবে এমন না যে মা তার রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশোনায় কোনো কমতি রেখেছিলেন। বরং তার বয়সী অন্য বাচ্চাদের চাইতে তার ভাগ্যটা কিছুটা ভালোই বলা চলে। কোনকিছু কোনদিন বাবা মায়ের কাছে মুখ ফুটে চাইতে হয়নি তার। তার প্রয়োজনগুলো তারা কিভাবে যেন ঠিকঠাক বুঝে নিতেন। এর জন্য সে তার বাবা মা কে কিছুটা ভয়ও পেত।

ছোটবেলার কিছু স্মৃতি মনে পড়ে যায় আফসারির। তখন তার বয়স সাত কি আট বছর হবে। একদিন কাওকে না জানিয়ে একা একা ছাদে চলে গিয়েছিল সে। তখন মাত্র বিকাল। সূর্যের আলোর তেজ কিছুটা ম্লান হয়ে এসেছে। মলিন আলো ছড়াতে ছড়াতে সূর্য সবে বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চারদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। বিরান ছাদে দুটো শালিক খেলা করছিল।

আফসারি মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলো তাদেরকে। হঠাৎ তার মনে হলো, তার কাছে এরকম একটা পাখি থাকলে মন্দ হতো না। সেদিন অনেকটা সময় সে পাখি দুটোর সাথে কাটায়। এক সময় তাকে রেখে তারা চলে যায় নিজ নিজ আলয়ে। তারা চলে যাওয়ার পর আফসারিও ধীর পায়ে নীচে নেমে আসে।

মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে দেখেন তিনি তখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। আফসারি ভেবেছিল কেও কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু ঠিক তার পরদিনই আব্দুল দরবেশ বাজার থেকে ফিরে এসে আফসারিকে ডেকে পাঠান। তার হাতে একটা আহত শালিকের বাচ্চা দিয়ে বলেন, "এটাকে সুস্থ করে ছেড়ে দিয়েন মা।"

আফসারি সেদিন অবাক হয়, প্রচণ্ড অবাক। অবাক হওয়ার এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আফসারি দিতে পারবেন। কেমন করে যেন মা বাবা আগে আগেই তার মনের সব কথা বুঝে ফেলতেন। সে যেন তাদের কাছে একটা স্বচ্ছ আয়না।

এজন্যই যেদিন আফসারি প্রথম বুঝতে পারলেন পুরুষ স্পর্শের কাতরতা.....আব্দুল দরবেশ সেদিন শান্ত গলায় বললেন, "আফসারি আম্মাজনের বিয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় এসেছে।"

হ্যা....আফসারি ভয় পায় তার বাবা মা কে। এজন্য নিতান্ত অল্প বয়সে বিয়ে করে যখন সে স্বামীর সংসারে গেল, তার মনে হয়েছিল সে যেন প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বিয়ের পর এ বাড়িতে খুব কমই যাওয়া আসা হয়েছে তার। এবার এত বছর পর যখন আসলো তখন বাবা নামক মানুষটা আর নেই।

ভাই বোনদের মধ্যে বাবার সাথে হয়তো সব থেকে বেশি দূরত্ব ছিল আফসারির। বাবার মৃত্যুতে তাই তাদের তুলনায় তার কষ্ট কম হওয়া উচিত। কিন্তু অবাক হয়ে আফসারি লক্ষ্য করল তার ভেতরটা শূন্য হয়ে আসছে। "বাবা নেই!" এই দুটো শব্দ তার ভেতরে যেন ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

ওড়নার কোন দিয়ে চোখের জল মুছল আফসারি। কাঁচের বাটিতে ডালটুকু ঢেলে নিল। আদিল এবং মারুফ খেতে বসেছে। ওদের খাওয়া শেষ হলে মেয়েরা বসবে।

ডালের বাটিটা নিয়ে খাবার ঘরের দিকে এগুতে যাবে এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল সে।

ঠক.... ঠক....ঠক....পরপর তিনবার।

থেমে গেলেন আফসারি। রান্নাঘরের পর্দাটা টেনে দিল। মা বলেছিল বিকালে লিনাকে নিয়ে জলিলুদ্দীন আসবেন। এখন সবে দুপুর। মনে মনে কিছুটা বিরক্ত বোধ করে আফসারি। জলিলুদ্দীনকে কেন যেন তার ঠিক পছন্দ হয়নি। লোকটার মধ্যে একটা অশুভ ভাব আছে। যদিও আফসারি কখনো তার সাথে সামনা সামনি কথা বলেনি। যতদূর পর্যবেক্ষণ করার পর্দার আড়াল থেকেই করেছে। তারপরও তার দৃঢ় বিশ্বাস ওই লোকটার মধ্যে কিছু একটা ঠিক নেই। বিশেষ করে তার চোখগুলো......

খুব পরিচিত এক কণ্ঠে বাস্তবে ফিরে এলো আফসারি। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে সে কিছুটা সময় নিলেন। আর উপলব্ধি করার সাথে সাথেই তার সারা অস্তিত্ব টলে উঠলো।

এ হতে পারে না!

খাবার ঘরে প্রবেশ করেই আদিল মারুফকে দেখতে পেল। সে শান্ত ভঙ্গিতে প্লেটে ভাত নিয়ে বসে আছে। আদিল বুঝতে পারলো তার জন্যই অপেক্ষা করছে মারুফ। পাশে মা আর রাজিয়া আপা দাঁড়িয়ে আছেন।

এক ঝলকে সেদিনের দৃশ্যটা আবার আদিলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

সেই হাসি....মৃত চাহনি...নগ্ন শরীব...কালো লকলকে জিভ!

মনে পড়ার সাথে সাথেই আদিলের গা গুলিয়ে এলো। যতদূর সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলো সে। নিঃশব্দে মারুফের সামনের চেয়ারটাতে এসে বসলো।

মা প্লেটে ভাত বেড়ে দিলেন। রাজিয়া আপা পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিলো। কেও কোনো কথা বলছে না। শুধু রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে খুটখাট আওয়াজ ভেসে আসছে। এছাড়া পুরো পরিবেশ জুড়ে এক দম বন্ধ করা নীরবতা বিরাজ করছে।

চুপচাপ ভাতগুলো নাড়তে লাগলো আদিল। মুখে দিতে ইচ্ছা করলো না। আড়চোখে মারুফের দিকে তাকালো সে। মারুফ এক মনে চুপচাপ ভাত খাচ্ছে। ঘৃণায় গা রি রি করে উঠলো তার। ঠিক তখনই মারুফ আদিলের দিকে তাকালেন। আবার সেই মৃত অভিব্যক্তিহীন চোখ দুটো আদিল দেখতে পেল। আদিলকে উদ্দেশ্য করে মুচকি হাসলেন মারুফ। অশুভ সেই হাসিতে আদিলের সারা শরীরে এক শিরশিরে অনুভূতি খেলে গেল। সে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

ঠক.... ঠক....ঠক....পরপর তিনবার।

"জলিলুদ্দীন", মনে মনে ভাবলো আদিল। মনে মনে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলো। দ্রুত উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। কোন রকম বাছ-বিচার ছাড়াই

একটানে দরজাটা খুলে ফেলল। আর দরজা খুলতেই সে হতভম্ভ হয়ে গেল। পেটের মধ্যে যেন কিছু একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল কয়েক গুণ। চোখ পিটপিট করে আবার তাকালো সে। ভুল দেখছে না তো?

না....এইতো...দরজার বাইরে তার এক অতি পরিচিত অবয়ব দাঁড়িয়ে আছেন। আব্দুল দরবেশ দাঁড়িয়ে আছেন!

আদম ধর্ম ও এক পরিবারের ৯ সদস্যের ট্রেনে কাটা পড়ে আত্মহত্যার কাহিনী



ঘটনাস্থল ময়মনসিংহ পৌরসভার কাশর এলাকা

১১ জুলাই, ২০০৭ সাল। জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ স্টেশন থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করে ডিজেল এক্সপ্রেস ২৭৮ 'ডাউন' নামক লোকাল ট্রেনটি। আজ ট্রেন চালাচ্ছেন ড্রাইভার (লোকো মাস্টার) আব্দুল মতিন এবং মোঃ এনায়েত খান। ময়মনসিংহ পৌরসভার কাশর এলাকার ইটখলায় যখন ট্রেনটি আসে, ঘড়ির কাঁটায় সময় বেলা ৩টা ১০ মিনিট। হঠাৎ ড্রাইভাররা দেখেন, রেলপথের বাঁ পাশ থেকে বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ একে অন্যকে ধরাধরি করে রেল লাইনের দিকে আসছে।

মোট ৯ জন। পুরুষ, নারী, শিশু—সবাই একই পরিবারের সদস্য। রেললাইন ধরে চুপচাপ বসে পড়ে তারা।

প্রথমে ড্রাইভাররা কিছুই বুঝতে পারেননি। পরে খেয়াল করলেন, তারা রেললাইন পার হচ্ছে না, লাইনের ওপরেই বসে আছে। ড্রাইভার হুইসেল দিলেন। তারা লাইন থেকে সরল না। ড্রাইভাররা বুঝতে পারলেন এরা সবাই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। ট্রেন ইমার্জেন্সি ব্রেক করালেন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। চোখের সামনে ৯ জন মানুষকে চাপা দিয়ে ট্রেন বেশ খানিকটা সামনে গিয়ে থামে।

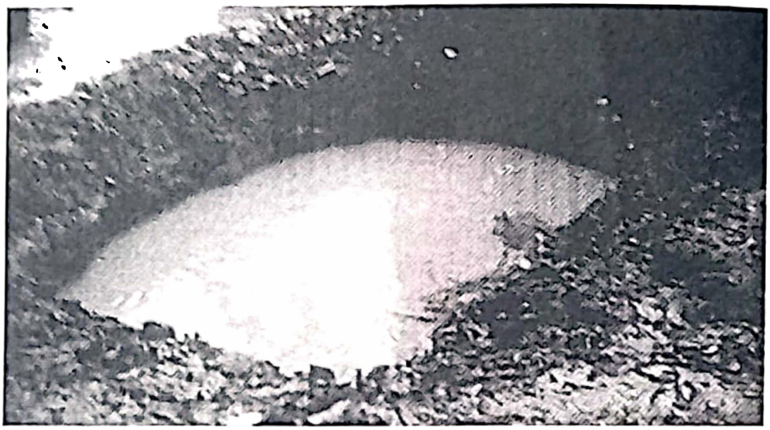


এ বাড়ি থেকে বের হয়েই আত্মহত্যা করে তারা

গাড়ি থেকে নেমে সবাই দেখতে পায়, ২ জন তখনও বেঁচে আছে। একটা বাচ্চা ছেলে এবং একজন তরুণী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শরীর নিয়ে 'পানি পানি' চিৎকার করছে। স্থানীয় লোকজন তাদেরকে পানি খাইয়ে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা পথেই মারা যায়। রেললাইনের কয়েক কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ৯ জন মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের কাটা টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। রক্ত, মাংস আর হাড়ে পুরো রেললাইন রক্তাক্ত। গাড়ি থেকে নেমে এই দৃশ্য দেখে একজন ড্রাইভার জ্ঞান হারান।

ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ পৌঁছায়। আশেপাশের মানুষদের সাথে কথা বলে নিহতদের নাম ঠিকানা জানতে পারে। মা, ১ ছেলে, ৪ মেয়ে এবং ২ নাতি নাতনী আত্মহত্যা করেছিল একসাথে। এরা হলো- মা হেনা আনোয়ার (৬০), পুত্র আরিফ আনোয়ার (৩০) ও রাহাত আনোয়ার (২২), কন্যা আতারী আনোয়ার (৩৫), মুর্শেদা আনোয়ার (২৭), মুন আনোয়ার ওরফে মনি (৩০) ও শবনম আনোয়ার (১৮), নাতি মৌলা আনোয়ার (৮) এবং নাতনী মৌ আনোয়ার (১০)। রেললাইনের পাশেই তাদের বাড়ি।

ওই বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে কেউ নেই। একটি পাকা ঘর। পাঁচ-ছয়টি কক্ষ। উঠানে কবরের মতো বড় একটি গর্ত খোঁড়া। বারান্দায় লাশ নেওয়ার খাট। রান্নাঘরে কাটা ছোট মাছ পড়ে আছে। তরিতরকারিও কেটেকুটে রাখা হয়েছে।



খুঁড়ে রাখা কবর

একজন সাংবাদিকের বর্ণনায়–মা, ২ নাতি, ৫ মেয়ে এবং এক ছেলের কথা বলা হয়েছে। আসলে ডেডবডিগুলো এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, কে ছেলে আর কে মেয়ে সেটা বের করা বেশ কঠিন।

বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু ডায়েরি ও হাতে লেখা কাগজপত্র উদ্ধার করে। এগুলোর কিছু বাংলায় আবার কিছু ইংরেজিতে লেখা। এগুলোয় বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য ছিল। ইংরেজিতে একটি ডায়েরিতে লেখা ছিল–"আমরা পৃথিবীর একমাত্র পরিবার যারা স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল। মোহাম্মদের আইনের বাইরে এবং সব ধর্মের সব কার্যকলাপের বাইরে। তাহলে আমরা কে? আমরা হলাম আদম।"

এ ছাড়া "সবার উপরে আদম সত্য, জুলুমের বিচারের ব্যবস্থা করিব"–ইত্যাদি ধরনের বেশ কিছু মন্তব্য ছিল।

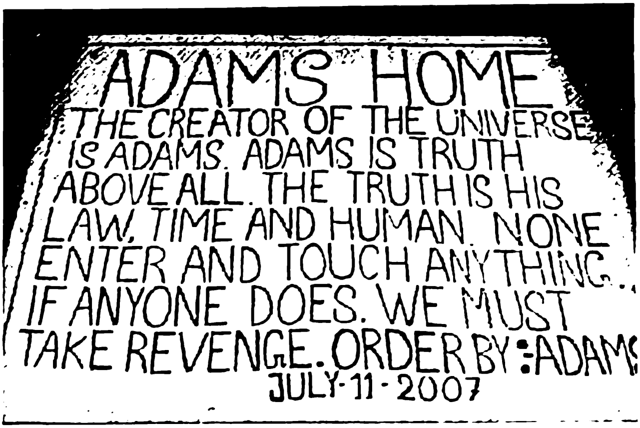
ময়মনসিংহ পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার মোজাম্মেল হক ইউসুফ বলেন, এ পরিবারটির সঙ্গে এলাকার কারো সম্পর্ক ছিল না। কেউ তাদের বাসায় যেত না। তারাও এলাকায় অন্য কারো বাসায় যেত না। আশপাশের কোনো পরিবারের সঙ্গে তাদের খারাপ সম্পর্ক বা রেষারেষিও ছিল না।

ঘটনার নেপথ্যে আনোয়ার দরবেশ-প্রতিষ্ঠিত 'আদম ধর্ম'

আনোয়ার দরবেশের ছোট ভাই, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আব্দুল হান্নান থাকেন ময়মনসিংহের গোলাইলপাড়ে। সাংবাদিকদের তিনি জানান, "আমার ভাই (আনোয়ার দরবেশ) হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল। মৃত্যুর পরে ওর পরিবারের বাকি সবাই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তারপর থেকে তারা

আমাদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে দূরত্ব তৈরি করে। কেউ ওদের খোঁজখবর নিতে গেলে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিত।"

তবে ওই বাসায় যেসব ডায়েরি এবং অন্যান্য বই পুস্তক পাওয়া গেছে সেখানে খ্রিষ্টধর্মের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ময়মনসিংহ এলাকার চার্চে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এই পরিবারটি কখনো কোনো খ্রিষ্টধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।



আদম বাড়ির নামফলকে লেখা সতর্কবার্তা

এরই মাঝে ঘটনায় যোগ হয় নতুন টুইস্ট। ১৪ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মেন্দা এলাকায় এক নারী নিজেকে আনোয়ার দরবেশের মেয়ে মবি বলে দাবি করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমার নাম মবি। পেপারে দেখছি আমি মৃত বলে খবর ছাপা হয়েছে। আমি বেঁচে আছি। ওই বাড়িতে আমি ছিলাম না, কিন্তু আমার ছেলে মওলা আর মুন ওই বাসায় ছিল। ওরা খুন হয়েছে।"

মবি এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ। তিনি দাবি করেন, এটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তিনি বলেন, "আমার ভাই, আনোয়ার শাহিন, অক্সফোর্ড ইনিভার্সিটিতে পড়ত। ২০০৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাত কিছু লোক ওকে খুন করে। সেই একই লোকজন আমাদের বাড়ি দখল করতে চায়। তারাই আমার পরিবারের ৯ জনকে ট্রেনের তলায় ফেলে দিয়েছে। তবে মবি তার ছেলে এবং মেয়ের ডেডবডি আনার জন্য ময়মনসিংহে যাননি।

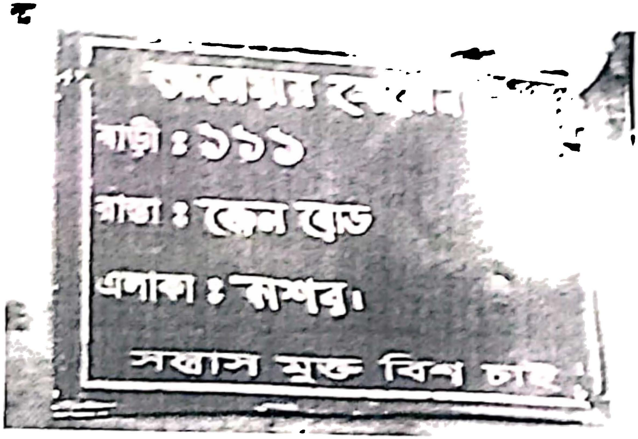
পুলিশ তখন নতুন করে ডেডবডির স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে। এতদিন ধরে যাকে মবির ডেডবডি বলে ধারণা করা হচ্ছিল, এটা তাহলে মবি নয়, মবি বেঁচে আছে। তাহলে এই অজানা মেয়েটি কে?

উদ্ধারকৃত ডায়েরিগুলোর মধ্যে লিনা নামে একজনের ডায়েরিও পাওয়া যায়। ডায়েরি থেকে জানা যায়, লিনা এই পরিবারের সদস্য নয়। লিনার মা আর বাবা আনোয়ার নরবেশের মুরিদ ছিলেন। তারা মাঝে মাঝে এই বাড়িতে এসে থাকতেন। লিনাও আসতো নিয়মিত। একসময় লিনা আনোয়ার নরবেশের প্রতিষ্ঠা করা আদম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজের পরিবার ছেড়ে এই পরিবারে এসে থাকতে শুরু করেন। এর আগে বাড়ির কাজের মেয়ে হিসেবে তাকে কোনো কোনো সাংবাদিক উল্লেখ করেছিলেন। তবে পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের ডায়েরিতে লিনার কথা উল্লেখ নেই।

আনোয়ার নরবেশ সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি বেশ ধর্মকর্ম শুরু করেন। এলাকার মানুষ তাকে দরবেশ/ ফকির ও পীর বলে ডাকত। তবে ধীরে ধীরে তার চিন্তাভাবনা প্রচলিত ইসলামিক চিন্তা চেতনার চেয়ে একটু ভিন্ন হয়ে গেল। অন্যান্য ধর্মীয় অনুসারীদের সাথে তিনি আলোচনা করতে বসলে প্রায়ই তর্ক শুরু হয়ে যেত। ১৯৯৫ সালে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে তর্কের একপর্যায়ে হাতাহাতি হয়। চায়ের দোকানের লোকজন তখন তাকে মারধোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

এ ঘটনার পর থেকে তিনি বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারে কমিয়ে দেন। পরিবারের অন্যরাও তাই করে। সম্ভবত এরপর থেকে তিনি তার ভক্ত কিংবা মুরিদদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদেরই নিজধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করেন। তার সবচেয়ে বড় শিষ্য হয়ে ওঠে তার বড় ছেলে আরিফ আদম। ২ জন মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতেন।

আনোয়ার নরবেশ মারা যান ২০০০ সালের ১১ জুলাই ঢাকার একটি হাসপাতালে। মৃত্যুর পরে তার ডেডবডি কিভাবে সৎকার করা হবে সে বিষয়ে তিনি একটি লিখিত নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বলেছিলেন–"মৃত্যুর পরে আমার কোনো জানাজা দিবা না, গোসল করাবা না, কাফনের কাপড় পরাবা না। যে কাপড় পরে মারা যাব, সেই কাপড়ে সেই অবস্থাতেই আমাকে কবর দিবা। কোনো কবরখানায় আমাকে নিবে না, বাড়ির ভিতরে গর্ত খুঁড়ে আমাকে কবর দিবে। আমার মাথা থাকবে পূর্বে, পা থাকবে পশ্চিমে আর মুখ দক্ষিণ দিকে ঘুরানো থাকবে। যদি অন্য রকমভাবে কবর দাও, তাহলে আমি কঠিন প্রতিশোধ নিব।"



আনোয়ার আদমের বাড়ির হোল্ডিং প্লেট

আদম পরিবার ঠিক এইভাবেই বাবার ভেতরবতি কবর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্থানীয় জনগণ তা হতে দেয়নি। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্থানীয় হুজুরদের উপস্থিতিতে তার গোসল, জানাজা এবং কবর দেওয়া হয় ইসলামী পদ্ধতিতে। আদম পরিবারের কেউ সেই জানাজায় উপস্থিত হয়নি।

এই ঘটনার পর আদম পরিবার ঢাকায় চলে যায়। সেখানে বড় ছেলে আরিফ কোনো এক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং পরিবারের খরচ চালাতেন (একজনের ডায়েরি থেকে দেখা যায়, আরিফ ঢাকার ৫২টা ইউনিভার্সিটির ভিন ছিল!)।

২০০৫ সালে ঢাকায় আরিফ মারা যায় কিংবা খুন হয়। পুরো পরিবার তখন আবার গ্রামে ফিরে আসে। পরিবারের একমাত্র পুরুষ সদস্য তখন রাহাত। তার ওপর দায়িত্ব পরিবারের ভরণপোষণের। তিনি কী ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন কিংবা তার পরিবারের সদস্যরা অর্থাভাবে না খেয়ে থাকত কিনা, তা জানা যায়নি। তবে তার ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন–We are the only family in the world that is independent and selfdepanded. We are the only one family in the world that is totally independed and selfdepended and out of mohamod's rules.,law and relisious activities and relisions. (ডায়েরির মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে)

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পরে বড় বোন আক্তারী আনোয়ার সংসারের হাল ধরেন। তিনি অন্যান্য ভাইবোনের মধ্যে আদম ধর্মের উপাচারগুলো চালু রাখেন। বাবা এবং বড় ভাইয়ের আত্মার সাথে কথা বলার জন্য পরিবারটি তখন নিয়মিত ধ্যান শুরু করে। একসময় তারা সফল হয়। বাবার আত্মা প্রথমে আক্তারীর দেহে ভর করে। আক্তারীর মুখ দিয়ে আনোয়ার দরবেশ তখন আদেশ-নিষেধ দেওয়া শুরু করলেন। (আক্তারী আনোয়ারের ডায়েরির কিছু অংশ তিনি লিখেছেন তার

নিজের জবানীতে। কিছু অংশ লেখা আছে তার বাবা আনোয়ার আদমের জবানীতে) ধীরে ধীরে সবার শরীরেই তার বাবা এবং ভাইয়ের আত্মা ভর করে। ডায়েরিতে লিনার ভাষ্যানুযায়ী, এই পরিবার সারাদিন ঘুমাত আর সারারাত জেগে জেগে ধ্যান করত।

প্রত্যেক সদস্যই মৃত্যুর আগে তাদের নিজেদের কথা গুছিয়ে ডায়েরিতে লিখেছিল। অধিকাংশ লেখাই ইংরেজিতে, কিছু আছে বাংলায়। মা হেনা আনোয়ার সম্ভবত লেখাপড়া জানতেন না, তার পক্ষ থেকে এক মেয়ে তার কথাগুলো লিখে দিয়েছেন। এমনকি ২টা বাচ্চাও তাদের কথা ডায়েরিতে লিখেছে। তারা স্বেচ্ছায় লিখেছে নাকি অন্য কেউ তাদেরকে ডিক্টেশন দিয়ে লিখিয়েছে তা পরিষ্কার নয়।

ডায়েরি থেকে জানা যায়, তারা অনেক আগে থেকেই এই আত্মহত্যার প্ল্যান করছিল। এটা তাদের কাছে আত্মহত্যা নয়, এটা তাদের কাছে ছিল বাবা এবং বড় ভাইয়ের সাথে মিলিত হওয়ার উপলক্ষ। জুলাই মাসের ৭ তারিখে তারা একবার আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেও পরে বাতিল করে। বাবা আনোয়ার আদমের মৃত্যু দিবস ১১ জুলাই পর্যন্ত তারিখ পেছানো হয় এবং ওইদিনই তারা একসাথে আত্মহত্যা করে। তাদের ভাষায়–'বাবা এবং বড় ভাইয়ের সাথে মিলিত হতে যায়।'

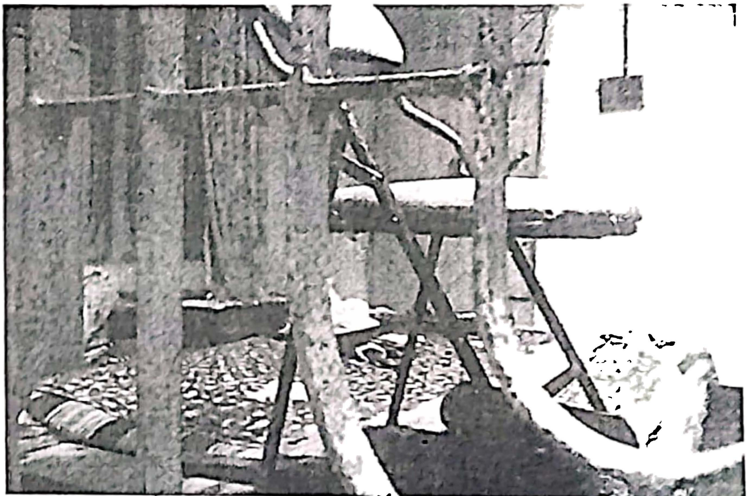


প্ল্যানচেট : মৃত বাবা ও ভাইয়ের আত্মার সাথে যোগাযোগের সরঞ্জাম

ডায়েরি থেকে উদ্ধারকৃত লেখাপত্র অনুযায়ী–আদম হচ্ছেন বিশ্বের প্রথম মানুষ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য সব মানুষ আদমেরই অংশ (বনি আদম)। আদম বিভিন্ন সময়ে মারা যান, আবার পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আদম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আনোয়ার আদম।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় বাসিন্দা আবু বকর সিদ্দিকী ওই সময় বাড়িটিতে ঢুকতে পেরেছিলেন এবং কিছু ছবি তুলতে পেরেছিলেন। প্রথম ছবি বাদে এই লেখায় ব্যবহৃত সব ছবিই তার তোলা। উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে–বাড়ির জানালায় সাইনবোর্ডের মতো করে একটি হোয়াইট বোর্ড টানানো। সেখানে মার্কার পেন দিয়ে ভুল গ্রামারের ইংলিশে কিছু কথা লেখা আছে। ভাবানুবাদ করলে সম্ভবত এইরকম দাঁড়ায়, "এটা আদমের বাড়ি। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে আদম। সবার উপরে আদম সত্য। এই বাড়িতে কেউ ঢুকবে না এবং কেউ কিছু টাচ করবে না। যদি কেউ আমাদের আদেশ অমান্য করে বাসায় ঢোকো, তাহলে আমরা প্রতিশোধ নিব। আদেশক্রমে-আদমেরা।"

বোর্ডের উপরে হেডলাইন লেখা 'এডামস হোম' এবং নিচে তারিখ লেখা–১১ জুলাই ২০০৭। আবু বকর সিদ্দিকীর ভাষ্যে জানা যায়, বাসার ভেতরে একটি রুমের ছাদে বেশ কয়েকটা দড়ি ঝোলানো ছিল। সম্ভবত ওরা প্রথমে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার প্ল্যান করেছিল। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, খাটের ওপরে চেয়ার রাখা। সম্ভবত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল।



ট্রেনে কাটা পড়ার আগে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যার প্রস্তুতি

অন্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি রুমের ভিতরে মোমবাতি, কাগজ এবং কিছু থালাবাসন রাখা। দৃশ্যটা দেখে মনে হতে পারে কেউ রান্নাবান্না করছিল। আবার রান্নাবান্না বাদে অন্য কোনো স্পিরিচিয়াল কাজেও কেউ এগুলো ব্যবহার করে থাকতে পারে। মৃত ব্যক্তির আত্মার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্লানচেট এবং কাগজ ব্যবহৃত হয়।

বেশ কিছুদিন পুলিশের হেফাজতে লাশগুলো (ডেডবডির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশগুলো) থাকলেও সেগুলো কেউ নিতে আসেনি। অবশেষে আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের কাছে সেগুলো হস্তান্তর করা হয়। আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম মুসলিম রীতি মেনে দাফন সম্পন্ন করে।

এই ঘটনার আগে বা পরে আর কেউ কখনো আদম ধর্ম সম্পর্কে কথা বলেনি কিংবা আদম ধর্মের অনুসারী হওয়ার দাবি করেনি।

আদম ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও অনুসারীদের আত্মহত্যার বৈজ্ঞানিক কারণ

কলকাতার সাইকোলজিস্ট প্রফেসর নাসিমা সেলিম এই ঘটনা নিয়ে একটি থিসিস পেপার লেখেন। তিনি সকল তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে দাবি করেন, আদম ফ্যামিলি Shared Delusion অথবা Shared Psychotic Disorder (SPD) নামক মানসিক রোগে ভুগছিল। পরিবারের খারাপ আর্থিক অবস্থা, এলাকাবাসীর অপমান ইত্যাদি কারণে আনোয়ার দরবেশ সম্ভবত সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং নিজেকে তিনি আদম দাবি করা শুরু করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেহেতু তার প্রতি খুব নির্ভরশীল ছিল, তাই তার সব কথা বিশ্বাস করল। নিজেরাও হয়ে উঠল আদম ধর্মের অনুসারী। এক মেয়ে যখন দাবি করলেন, আমার শরীরে আদমের আত্মা ভর করেছে, তখন সবাই তাকে বিশ্বাস করল, বাকিদের শরীরেও আদমের আত্মা আসতে শুরু করল। শুধুমাত্র মেজো মেয়ে মবি-শক্ত মানসিকতার ছিলেন বলে তিনি শেয়ারড ডিলুশনের শিকার হননি। অন্য সবাই দুর্বল মানসিকতার বলে সবার শেয়ার্ড ডিলুশন হয়েছে।

নাসিমা সেলিম তার থিসিসে দেখান-বড় মেয়ে আক্তারীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। মুর্শেদা এবং শবনমের বয়স হয়ে গেলেও বিয়ে হচ্ছে না। প্রচলিত অর্থে তাদের সামনে সুনিশ্চিত কোনো ভবিষ্যত ছিল না। তাই তারা মানসিকভাবে ছিলেন দুর্বল ও ভেঙে পড়া। অন্যদিকে মবির বিয়ে হয়েছিল, ২ বাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার তার। এ নিশ্চয়তায় তিনি মানসিকভাবে অন্যদের চেয়ে সবল ছিলেন।

বড় ছেলে আরিফ মানসিকভাবে খুব একটা সুখী ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদের ডায়েরি থেকে তার এক প্রেমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার নাম ফাতেমা। সেই ফাতেমাকেও আদম ধর্ম সম্পর্কে জানানো হয়েছিল, কিন্তু ফাতেমা আদম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে নিজের প্রেমিকা এবং পরিবারের মধ্যে সম্ভাব্য টানাপোড়েনের আশঙ্কায় আরিফ সম্ভবত মানসিকভাবে অশান্তিতেই ছিলেন। শেয়ার্ড ডিলুশন, সিজোফ্রেনিয়া কিংবা অন্য যে কোনো মানসিক রোগের জন্য যা সুবিধাজনক অবস্থা।



প্রফেসর নাসিমা সেলিম

এছাড়া প্রফেসর নাসিমা সেলিম এই রোগকে সম্ভাব্য Folie a' famille বলে চিহ্নিত করেছেন। 'ফলি এ ফ্যামিলি' রোগে সাধারণত পরিবারের সদস্যরা অদ্ভুত আচরণ শুরু করে। বিশেষত একজন সদস্যের কোনো অস্বাভাবিক প্রবণতা অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৮ সালে সুইডেনের উরুসুলা এরিকসন রাস্তায় বের হয়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। একটুপরেই তার যমজ বোন সাবিনা এরিকসনও একইভাবে হাইওয়েতে বের হয়ে গড়ির সাথে ধাক্কা খাওয়ার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে তিনিও বেঁচে যান। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাইকোলজিষ্টরা তাদের ফলি এ ফ্যামিলি রোগের শিকার বলে চিহ্নিত করে।

২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ৫ সদস্যের একটি পরিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে চলে যান উদ্দেশ্যহীনভাবে। তাদের কারো একজনের মনে হচ্ছিল, বাড়ি থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। বাকিরাও প্রভাবিত হন। তারাও ফলি এ ফ্যামিলি রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

https://barta24.com/

অনলাইন পরিবেশক

https://www.puthi-puran.com/

কিতাবগঞ্জ

রকমারি.কম

কুহক কমিক্স & পাবলিকেশন এর অন্যান্য বই

ফ্যান্টাসি কমিক্স সংকলন - তাওসীফ আহমেদ
আই রিমেমবার বৈরুত - কাজী ম্যাক

মৌলিক বই

আঁধার নগরীর ধুম্রকুহেলী - মোফাচ্ছের হোসেইন নির্জন
ছায়া মানবী - মালিহা নামলাহ

মৌলিক কমিক্স

নারক (বিভ্রম ১) - তাওহীদ আহমেদ

"আমার মৃত্যুর পরে কেউ আমার জানাজা পড়বে না। আমাকে গোসল দেবে না এবং আমাকে যেনো কাফনের কাপড় না পরানো হয়। আমি যে পোশাক পরে মারা যাবো সে পোশাক সহ-ই ঘরের ভেতর আমাকে মাটি চাপা দিতে হবে। যখন তোমরা আমাকে কবরে শোয়াবে, তখন আমার মাথাটি পূর্ব দিকে, পা পশ্চিম দিকে, এবং আমার মুখ দক্ষিণের দিকে করে দেবে। যদি এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়, তবে আমি প্রতিশোধ নেব।"

~ আনোয়ার দরবেশ।

১১ জুলাই, ২০০৭ সাল। জামালপুরের জগন্নাথগঞ্জ স্টেশন থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করে জিএম এক্সপ্রেস নামক লোকাল ট্রেনটা। আজও তার গন্তব্য ভিন্ন কিছু ছিলো না। সবকিছু প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিক। বিপত্তি বাঁধলো যখন ট্রেনটি ময়মনসিংহ পৌরসভার কাশর এলাকার ইটখোলায় এসে পৌঁছাল। তখন ঘড়িতে সময় বেলা ৩টা ১০ মিনিট। হঠাৎ ট্রেন ড্রাইভার লোকো মাস্টার লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ একে অন্যকে ধরাধরি করে রেল লাইনের উপরে এসে থামলো। লোকো মাস্টার প্রথমে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন এদের উদ্দেশ্যে স্রেফ রেললাইন পার করা না, তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আতঙ্কিত হয়ে সাথে সাথে ট্রেনের ইমারজেন্সি চেইন টানলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে...

আমরা এখন প্রচুর স্যাটানিক কাল্টের নাম জানি। শুধু নাম-ই নয়, এসব কাল্টের ইতিহাস সম্পর্কেও আমরা কম-বেশি জানি। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা এক স্যাটানিক কাল্ট যা "আদম ধর্ম" নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, সে সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ার দরবেশ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের বিরোধীতা শুরু করেছিলেন। তিনি ইসলামের সর্বশেষ নবীকে শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যা দেন, এবং ধীরে ধীরে নিজের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দেয়ার জন্য কাজ করতে থাকেন।

ভাগ্যক্রমে এই ধর্মের এক অনুসারীর কাছ থেকে কিছু পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। সেই সাথে পাই কিছু ভয়ানক তথ্য। এই বইটিতে চেষ্টা করা হয়েছে সেসব

